মাসুদ রানা
আমিই রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন
দুই খণ্ড একত্রে
সেবা
প্রকাশনী
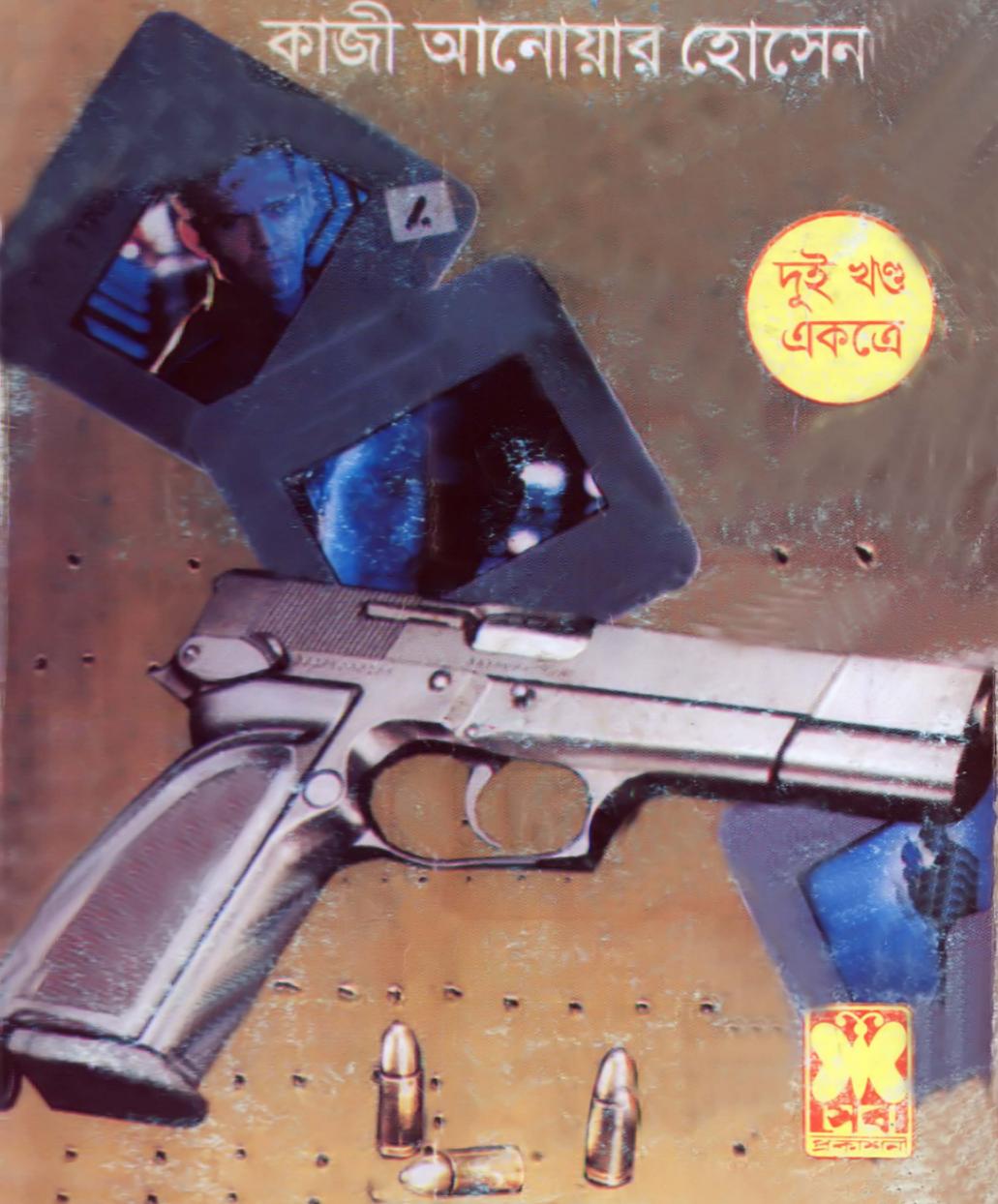
মাসুদ রানা

আমিই রানা

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

তেল আবিবের অভিজাত এলাকা জাফার
একটি ফ্ল্যাটে নিজ বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল রানা।
ঘুম ভাঙল নরওয়ের অসলো শহরে
এক হোটেল কক্ষে।
হাতের ঘড়িটা বদলে গেল কি করে? পরনে
পাজামা এল কোত্থেকে? রাস্তার
দু'পাশে দোকানগুলোর সাইনবোর্ডে দুর্বোধ্য, অচেনা
ভাষা কেন? স্বপ্ন দেখছে?
বাথরুমে ঢুকল রানা। থমকে দাঁড়াল আয়নার
সামনে। কে ও? চিনতে পারছে না নিজেকে!
আশ্চর্য! স্মরণশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে
ফেলেছে ও। শুধু মনে আছে, ওর নাম
মাসুদ রানা। মনে আছে, ও একজন
দেশপ্রেমিক ইসরায়েলী!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ৭০, ৭১

আমিই রানা ১,২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

মাসুদ রানা

আমিই রানা

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সাঁইত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-7070-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৯
চতুর্থ প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
AMIYEE RANA
(Part I & II)
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র *রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক *শয়তানের দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিন শত্রু অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা *হংকং সম্রাট *কুউউ! বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা *প্রতিশোধ *মেজর রাহাত লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর *নকল রানা রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় *মরণ খেলা অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন *বুমেরাং কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয়সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট।

আমিই রানা-১

প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৭৯

এক

মাসুদ রানা।

একা শুয়ে বিছানায়। চিৎ হয়ে। ঘুমোচ্ছে।

অদ্ভুত এক আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে মুঠো পাকানো ডান হাতটা প'ড়ে আছে কপালের উপর। কার উপর যেন খেপে আছে ও, নিজের অজ্ঞাতেই। ঘুমের মধ্যেই দুম করে একটা ঘুসি মেরে বসবে যেন। বুকটা উঠছে, নামছে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক, গভীর এবং নিয়মিত।

দৈনন্দিন সাময়িক মৃত্যুর গভীর তলদেশ থেকে উঠে আসছে রানা, ঘুম ভাঙছে ওর। আরও দীর্ঘশ্বাস নিচ্ছে। পাতা দিয়ে মোড়া চোখের ভিতর মণি দুটো একটু একটু নড়ছে। লম্বা একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। হাতটা নেমে গেল কপাল থেকে। পাশ ফিরে শুলো। কয়েক ইঞ্চি নেমে এল মাথাটা বালিশ থেকে। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে শুয়ে থাকল ও। আবার নড়ছে মণি দুটো। একটু কুঁচকে উঠল পাতা দুটো, একটু কাঁপল, তারপর টান টান হয়ে উঠল। ভাঁজ হয়ে উঠে গেল উপর দিকে।

চোখ মেলল রানা। বিছানার সামনে শূন্য সাদা দেয়াল দেখতে পাচ্ছে। দীর্ঘ একটা শ্বাস টেনে বাতাসে ভরে নিল ফুসফুস। হাত দুটো উপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙল। হাই উঠছে বুঝতে পেরে ডান হাতটা নামিয়ে এনে মুখের সামনে রাখল। টান টান করল পা দুটো। বালিশের উপর নেড়েচেড়ে ঠিক জায়গামত বসাল মাথাটাকে। বাঁ-হাত মুখের সামনে এনে হাই তুলল আরেকটা। তারপর অলস ভঙ্গিতে চোখের সামনে নিয়ে এল হাতটাকে। রিস্টওয়াচ দেখছে।

ঘড়ির তিনটে কাঁটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। ঠিক বারোটা বাজে।

কুঁচকে উঠল ভুরু দুটো। হাত ঝাঁকিয়ে নাড়া দিল ঘড়িটাকে, কানের সাথে ঠেকিয়ে ধরল।

টিক্ টিক্ চলছে ঘড়ি। চোখের সামনে নিয়ে এল সেটাকে, দেখতে পাচ্ছে সেকেন্ডের কাঁটাটা তার বৃত্ত ধরে ঘুরতে শুরু করেছে আবার।

হঠাৎ কি যে হলো, ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসল রানা। ঘড়িটার দিকে চোখ। মাঝরাত, নাকি দিন দুপুর—এসব নিয়ে কিছু ভাবছে না এখন। হঠাৎ ধরতে পেরেছে ব্যাপারটা, ঘড়িটা ওর নয়। সাধারণত একটা অটোমেটিক ওমেগা পরে ও। এটা ওমেগা নয়, সোনালী রঙের পাটেক ফিলিপ। ওমেগার সাথে ছিল ফ্লেক্সিবল ধাতব ব্যান্ড, এটার রয়েছে সাদাসিধে চামড়ার বেল্ট।

কপালে চিন্তার একটা রেখা ফুটে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি সতর্ক। ধীরে ধীরে তুলছে মুখ। কামরাটার চারদিকে তাকাচ্ছে। আরেকটা ধাক্কা খেলো সাথে সাথে।

অচেনা কামরা। এর আগে কখনও এখানে আসেনি রানা।

বুকের ভিতর দিকের দেয়ালে দ্রুত তালে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, অনুভব করছে রানা। আঙুলে শীতল সিল্কের স্পর্শ পেয়ে চোখ নামাল। পাজামা পরে আছে ও। অথচ এই পোশাক পরে শোয়া অভ্যাস নয় ওর। কার এটা, কোত্থেকে এল, কখন পরেছে—কিছুই মনে পড়ছে না।

চোখ থেকে ঘুম এখনও কাটেনি পুরোপুরি। আবার শুয়ে পড়ে চোখ বুজতে ইচ্ছে করছে ওর। বুঝতে পারছে, স্বপ্নটা দেখা শেষ করে ঠিকমত ওর নিজের বিছানায় জেগে উঠলেই সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু তলপেটে একটা চাপ অনুভব করছে, এখনই একবার বাথরুমে না গেলেই নয়। কোলের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে পা দুটো ঝুলিয়ে দিল বিছানার নিচে। পাজামাটা দেখল আবার। আমি হাসপাতালে রয়েছি, হঠাৎ ভাবল ও, নিশ্চয়ই কোন অ্যাক্সিডেন্ট করেছি। কিন্তু স্মৃতি বলছে উল্টো কথা। পরিষ্কার মনে আছে মেয়েটার নাম। তাতিনা। তেল আবিবের অভিজাত এলাকায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছে রানা, ডিনার খেয়ে সেখানেই তাতিনাকে নিয়ে উঠেছে ও। একটু রাত করে শুয়েছে ওরা। সন্ধ্যার দিকে সচরাচর যতটুকু ড্রিঙ্ক করে তার চেয়ে একটু বেশি ঢেলেছে গলায়। কিন্তু তাতে কি! মদ খেয়ে মাতাল হলেও, নিরাপদে ফ্ল্যাটে পৌঁছেচে ও, কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটায়নি। আবছা ভাবে হলেও মনে আছে সব।

আঙুলে সিল্কের পিচ্ছিল কোমলতা অনুভব করছে রানা। ভাবছে…তাছাড়া তেল আবিব মেডিকেল কলেজের পোশাক নয় এই পাজামা। ওখানে এর আগে থেকেছে ও। পকেটের কাছে কোন মনোগ্রাম থাকে না। এটার রয়েছে।

এমব্রয়ডারি করা মনোগ্রামের লেখাটা পড়তে চেষ্টা করল ও। অক্ষরগুলো উল্টোভাবে সাজানো বলে মনে হচ্ছে, পড়া যাচ্ছে না।

মেঝেতে দাঁড়াল রানা। আরেকবার কামরাটার দিকে ভাল করে তাকাতেই বুঝল, একটা হোটেলে রয়েছে ও। শুধু একটা হোটেলরুমেই স্যুটকেস রাখার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি র‍্যাক দেখা যায়। র‍্যাকে একটা দামী স্যুটকেসও দেখতে পাচ্ছে ও। তিন পা এগিয়ে র‍্যাকটার সামনে থামল। আনকোরা নতুন স্যুটকেস, কোথাও এক চুল দাগ পড়েনি এখনও। চামড়ার গা মসৃণ, চকচক করছে। একপাশে স্পষ্টভাবে তিনটে অক্ষর সাদা রঙ দিয়ে এঁকে রাখা হয়েছে। এ. পি. এফ.।

দপ্ দপ্ করছে কপালের দু'পাশ। অতিরিক্ত মদ খাবার কুফল, ভাবল ও। মুখের ভিতর শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। আবার কামরাটার চারদিকে চোখ বুলাল ও। একটা চেয়ারের পেছনে ঝুলছে জ্যাকেটটা, ড্রেসিং টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, মানিব্যাগ, চাবির গোছা ইত্যাদি ব্যক্তিগত জিনিসগুলো পড়ে রয়েছে। ওদিকে যাবে, এমন সময় তলপেটের চাপটা অসহ্য মনে হলো। একটা বাথরুম না পেলেই নয় আর।

বেডরুমটা ইংরেজি এল অক্ষরের মত, বাঁক নিয়ে চলে গেছে আরেকদিকে। সেদিকে এগোল রানা। বাঁক নিতেই কাঠের পার্টিশন দেয়া দুটো ছোট ঘর দেখল দু'পাশে। ধাক্কা দিয়ে একটার দরজা খুলল। এটা একটা ওয়ারড্রোব, কাপড়-চোপড়ে ভর্তি, ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ঘরটার মুখোমুখি হলো। দরজা ঠেলে ভিতরে অন্ধকার

দেখল। চৌকাঠ পেরিয়ে সুইচবোর্ডের সন্ধানে দেয়াল হাতড়াচ্ছে। সুইচে চাপ দিয়ে আলো জ্বালতেই সাদা মার্বেল পাথরের বাথরুম দেখতে পেল।

নিজেকে হালকা করার ফাঁকে দুটো ব্যাপার নিয়ে ভাবছে রানা। কেন যেন খুঁত খুঁত করছিল মনটা। এখন কারণটা টের পেল হঠাৎ। বিদঘুটে কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ করছে ও, অথচ, ঘুম ঘুম ভাবটা এখনও লেগে রয়েছে চোখে, যেন পুরোপুরি জেগে নেই ও। এমন হবার কথা নয়।

'উফ্!' ব্যথায় মুখ বিকৃত করল রানা। চিমটিটা জোরে হয়ে গেছে।

আরেকটা ব্যাপার। কি যেন গোলমাল আছে ইলেকট্রিক সুইচটায়। ভাবতে গিয়ে ধরা পড়ল গোলমালটা। সুইচ নিচের দিকে নামিয়ে আনলে আলো জ্বলে, কিন্তু খানিক আগে বাথরুমের আলো জ্বালতে গিয়ে অন্ধকারে আঙুল দিয়ে অনুভব করেছে ও, সুইচগুলো সব নিচের দিকে নামানো রয়েছে। উপর দিকে উঠিয়ে দিতে জ্বলেছে আলো।

বেসিনের সামনে দাঁড়াল রানা। শেলফে দুটো পানি-ভর্তি গ্লাস কাগজ দিয়ে চাপা দেয়া। কাগজ সরিয়ে একটা গ্লাস তুলে নিল ও। ঢক ঢক করে পানিটুকু খেলো। এ পর্যন্ত মাত্র আড়াই মিনিট হয়েছে ঘুম ভেঙেছে ওর।

গ্লাসটা রেখে দিয়ে বাঁ চোখটা হাতের উল্টো দিক দিয়ে ঘষল, কেমন যেন টাটিয়ে আছে জায়গাটা। তারপর বেসিনের উপর দেয়ালের গায়ে লাগানো আয়নাটার দিকে তাকাল।

কে লোকটা!

বন্ করে ঘুরে উঠল মাথাটা।

দুই

অসম্ভব ব্যাপারটা এক সেকেন্ড দেখল রানা, তারপর ঝট করে ঘুরল পেছন দিকে। কেউ নেই। বাথরুমে ও একা। তাহলে? কে ওই আয়নায় দেখা লোকটা?

তীব্র এক আতঙ্ক গ্রাস করল রানাকে। তিক্ত খানিকটা পিত্ত রস উঠে এল গলা দিয়ে। দম আটকে আসতে চাইছে। রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে।

সাহস সঞ্চয় করার জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। ধীরে ধীরে ঘুরল আবার। কিন্তু চট্ করে আয়নায় তাকাল না। চোখ দুটো বুজে আছে। খুলল। পরনের পাজামাটা দেখতে পাচ্ছে আয়নায়। হাত দুটো দেখতে পাচ্ছে। ধীরে ধীরে উপরে উঠছে দৃষ্টি।

ঝট্ করে মুখের দিকে তাকাল আবার রানা। সাথে সাথে বুদ্ধি লোপ পেল ওর। এমন ভয়ঙ্কর অবস্থায় জীবনে পড়েনি কখনও সে।

আবার যখন সংবিৎ ফিরে পেল, দেখল বিছানায় আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে আছে ও। শরীরটা ঝুঁকে পড়েছে বালিশের দিকে। দু'হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে আছে বিছানার চাদরটা। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। সারা মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম।

দুই জুলফি বেয়ে সড় সড় করে নেমে আসছে দুটো ধারা। চামড়ার নিচে রক্ত যেন টগবগ করে ছুটছে। নিচু গলায় অবোধ শিশুর মত বিরতিহীন আউড়ে চলেছে, 'আমি মাসুদ রানা! আমি মাসুদ রানা। আমি মাসুদ রানা!'

ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস। চেহারা চিনতে না পারার প্রচণ্ড ধাক্কাটা সামলে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। ধীরে ধীরে মাথাটা নামাল বালিশে, সাদা ডিসটেম্পার করা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করে চলেছে সে একই কথা: আমি মাসুদ রানা।

নিজের পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেয়ে একটু যেন স্বস্তি ফিরে আসছে ওর মধ্যে। গলাটা কাঁপা কাঁপা, কিন্তু চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। ওরই।

ধীরে ধীরে গলার স্বর আরও স্পষ্ট, আরও দৃঢ় হলো ওর, 'আমি মাসুদ রানা। তেল আবিবের অভিজাত এলাকা জাফার একটা ফ্ল্যাটে ছিলাম আমি। গত রাতে, দশটার দিকে, তাতিনাকে নিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকি। আমরা বিছানায় উঠি সাড়ে দশটায়। সন্ধ্যার দিকে একটু মাতাল হয়েছিলাম। ভাঙা কাঁচ দিয়ে সামান্য একটু কেটে গিয়েছিল। কিন্তু বিছানায় ওঠার কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার।'

ভুরু কুঁচকে কি যেন স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা, তারপর বলল, 'একটা নাইট ক্লাবে বসে মদ খেয়েছি আমি। তখন সন্ধ্যা সাতটা হবে। বোতলটা টেবিলের ওপর খুব জোরে নামাতে সেটা ভেঙে গিয়েছিল। মাতলামো বলতে এইটুকু। আর কিছু নয়। সুতরাং, মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম, এবং তারপর থেকে যা ঘটছে সবই স্বপ্নের মধ্যে, তা সত্যি নয়। তাহলে ব্যাপারটা কি?' বাঁ হাতটা তুলল রানা। নিজের গালে মৃদু চাপড় মারছে। 'কি এটা?'

ধীরে ধীরে উঠে বসল রানা। বাথরূমে আরেকবার ওকে যেতেই হবে, জানে ও, গিঁট দিয়ে শক্ত করে বাঁধার চেষ্টা করছে স্নায়ুকে। বিছানা থেকে নামল, দাঁড়াল মেঝেতে। আবার সেই কাঁপুনিটা আরম্ভ হলো সারা শরীরে।

কাঁপুনিটা যতক্ষণ না থামল, অপেক্ষা করল রানা। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকল বাথরূমে। মুখোমুখি হলো অচেনা লোকটার সাথে আয়নার সামনে।

যে লোকটা পাল্টা তাকিয়ে আছে ওর দিকে তার বয়স ওর চেয়ে অনেক বেশি। পঞ্চাশ হওয়াও বিচিত্র নয়, অনুমান করল রানা। রানার গোঁফ ছিল, এর নেই। মাথা ভর্তি চুল ছিল রানার, ওর কপালের উপর ইঞ্চি দেড়েক প্রশস্ত একটা টাক চক্‌চক্ করছে। স্পষ্ট কোন দাগ ছিল না রানার মুখে, কিন্তু এ লোকটার মুখের বাঁ দিকে একটা পুরানো দাগ রয়েছে। কপালের প্রায় মাঝখান থেকে শুরু হয়ে চোখের পাশ ঘেঁষে নেমে এসেছে দাগটা প্রায় ঠোঁটের প্রান্ত পর্যন্ত। বাঁ চোখের পাতা ঝুলে আছে, শুকনো পুরানো ক্ষতটার জন্যে কিনা বলা মুশকিল। এছাড়া, ডান দিকের চোয়ালের কাছে ছোট্ট একটা লাল জরুলও রয়েছে।

এগুলোই সব নয়। তা যদি হত, এতটা ভয় পেত না রানা। আসল ব্যাপার হলো, মুখটা আলাদা। সম্পূর্ণ অন্য রকম।

রানা সুদর্শন। চেহারাটা গর্ব করার মত। কিন্তু এই অপরিচিত মুখটা মাংসল এবং থ্যাবড়া। নাকটা গোল। থুতনিটা দু'ভাগে ভাগ করা।

লোকটার দাঁত দেখার জন্যে হাঁ করল রানা। বৈদ্যুতিক আলোয় ঝিলিক দিয়ে

উঠল নিচের সারির সামনের একটা সোনার দাঁত। মুখ এবং চোখ দুটোই বন্ধ করে ফেলল রানা। আবার শুরু হয়েছে কাঁপুনিটা।

আবার যখন চোখ মেলল ও, চোখ দুটোকে কঠিন শাসনে বেঁধে রাখল যাতে আয়নার চোখ দুটোর দিকে না তাকায়। দৃষ্টি নামিয়ে তাকাল শক্ত করে বেসিনের কিনারা ধরে থাকা হাত দুটোর দিকে। এ দুটোও আলাদা। বয়স হয়েছে চামড়ার। নখগুলো ছেঁটে ছোট করা হয়েছে, যেন দাঁত দিয়ে কেটেছে কেউ। বুড়ো আঙুলের উল্টোদিকে কালো একটা তিল রয়েছে। তর্জনী আর মধ্যমায় নিকোটিনের দাগ দেখল ও।

অথচ বেশ কিছুদিন থেকে পাইপ খাচ্ছে রানা।

অন্ধের মত আয়নার দিক থেকে ঘুরে বেডরুমে ফিরে এল ও। বিছানার কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসল। 'আমি মাসুদ রানা!' বিড় বিড় করে বলল ও আবার। কাঁপুনিটা ফিরে আসছে ফের। ইচ্ছাশক্তির জোরে দ্রুত থামাল সেটাকে। মনে মনে বলল, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রানা। জানালার দিকে এগোচ্ছে। রাস্তা থেকে যে শব্দগুলো আসছে সেগুলো কেমন যেন অপরিচিত ঠেকছে ওর কানে।

জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল ও।

জানালার নিচে দিয়েই একটা ট্রাম কার ছুটে যাচ্ছে।

ট্রাম! তেল আবিবে ট্রাম নেই।

চোখ ধাঁধানো রোদ বাইরে। রাস্তার এপারে হোটেলের বাগান। বড় বড় ছাতার নিচে টেবিল চেয়ার। লোকজন বসে লাঞ্চ খাচ্ছে।

আরেকটা ট্রামের শব্দ পেয়ে আবার রাস্তার দিকে তাকাল রানা। এটা আগের মতই ঝরুর মার্কা একটা ট্রাম। কপালে গন্তব্যস্থানের নাম লেখা রয়েছে। লেখাটা পড়তে গিয়ে হোঁচট খেলো রানা। অচেনা ভাষা। পড়তে পারছে না। কোন্ ভাষা, তাও জানা নেই ওর।

রাস্তার দু'পাশের দোকানগুলোর সাইন-বার্ডে চোখ বুলাল ও। দুর্বোধ্য, পড়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল। মারা যায়নি তো সে? কোন কারণে চট্ করে মরে গিয়ে অন্য জগতে চলে এসেছে বলেই চিনতে পারছে না কিছু? মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিল রানা চিন্তাটা।

মাথার ব্যথাটা বাড়ছে। পর্দা টেনে দিয়ে প্রখর রোদ থেকে চোখ দুটোকে রক্ষা করল ও। ঘুরে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে এগোল ড্রেসিং টেবিলের দিকে।

ড্রেসিং টেবিলের উপর সোনার একটা সিগারেট কেস, গ্যাস লাইটার, মানি ব্যাগ এবং কিছু খুচরো পয়সা পড়ে রয়েছে। সিগারেট কেসটা আগে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ল না রানার। লাইটারটাও ওর নয়। মোটাসোটা একটা নোটবুক রয়েছে। ওর নয়। ওর জিনিস, পাইপ ও পাউচ, দুটোর একটাও দেখতে পাচ্ছে না। ধীরে ধীরে বসল রানা। মাথাটা খসে পড়ে যেতে চাইছে কাঁধ থেকে। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালল। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল একটা খুচরো পয়সা। এক দিকে মাংসল এক লোকের ছবি খোদাই করা চেহারার সাথে রোম সম্রাটের মিল রয়েছে। স্পষ্ট

কয়েকটা অক্ষর পড়তে পারছে রানা: OLAV V R.

মুদ্রাটার উল্টো পিঠ দেখছে রানা। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘোড়া। লেখা রয়েছে: Krone Norge.

তার মানে, নরওয়ে!

হঠাৎ আবার বন্ করে ঘুরে গেল মাথাটা। মুদ্রাটা রেখে দিয়ে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল দু'দিক থেকে মাথাটা। কয়েক মুহূর্ত পর সুস্থ বোধ করল একটু। কিন্তু মাথার ব্যথাটা বরং বাড়ল আরও।

মানিব্যাগটা তুলে নিল রানা। দ্রুত দেখল পকেটগুলো, তারপর ভিতরে যা ছিল বের করল সব। একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স, আনাতোলি পি, ফিলাতভের নামে। ঠিকানা: হ্যাপি ভিলা, ম্যাডোনা এভিনিউ, কারকাস, তেল আবিব। মাথার পেছনের চুল খাড়া হয়ে গেল রানার সইটার উপর চোখ পড়তেই। ওর নিজের হাতের লেখা ওটা। নামটা? না, যতদূর মনে পড়ছে, আনাতোলি পি, ফিলাতভ ওর নাম নয়। ওর নাম মাসুদ রানা। কিন্তু হাতের লেখাটা ওর, কোন সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে।

হাত বাড়িয়ে একটা কলম তুলে নিল রানা। একই সাথে এটা একটা কলম এবং বলপয়েন্ট। লেখার জন্যে কিছু একটা খুঁজছে ও এদিক ওদিক তাকিয়ে। তেমন কিছু চোখে পড়ছে না। টেনে ড্রেসিং টেবিলের সামনের দেরাজটা খুলল। একটা ফোল্ডারের ভিতর রাইটিং পেপার এবং অনেকগুলো এনভেলাপ দেখল। রাইটিং পেপারের মাথায় হেডিং দেখে থমকে গেল বাড়ানো হাতটা। ঝরঝরে ছাপার অক্ষরে লেটার প্যাডের মাথায় লেখা রয়েছে: হোটেল কন্টিনেন্টাল, স্ট্রোর্টিংস গাটা, অসলো।

কাগজের গায়ে ঠেকার জন্যে কলমের ডগা এগোচ্ছে, রানা লক্ষ করল, কলম ধরা হাতটা কাঁপছে ওর। কিন্তু সইটা কলম চেপে করতে পারল—মাসুদ রানা। পরিচিত আঁচড়, টান ইত্যাদি লক্ষ করে আত্মবিশ্বাস একটু বাড়ল ওর। এরপর আরেকটা সই করল: আনাতোলি পি, ফিলাতভ। ড্রাইভিং লাইসেন্সটা তুলে নিয়ে সেটার সই আর সদ্য করা সইটা মিলিয়ে দেখল। এখন আর কোন সন্দেহ নেই। দুটো সই হুবহু এক, ওর নিজের হাতের স্বাক্ষর।

মোটাসোটা নোট বুকের মত দেখতে কুক'স ট্রাভেলার্স চেকের সইটাও ওরই করা। চেকগুলো গুনল রানা। প্রতিটি দু'শো পাউন্ডের, মোট বত্রিশটা। ছয় হাজার চারশো পাউন্ড সর্বমোট। ও যদি সত্যি ফিলাতভ হয়, ধনী লোক বলতে হয় ওকে। মাথা ব্যথাটা বেড়ে গেল আরও।

ফিলাতভের নাম ঠিকানা লেখা ডজনখানেক ভিজিটিং কার্ড আর প্রচুর নরওয়েজিয়ান কারেন্সি রয়েছে। টাকাগুলো গুনে দেখার আগ্রহ হলো না ওর। বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছাটা জাগছে আবার। ভাবছে রানা, ঘুম থেকে নতুন করে জেগে উঠে ও হয়তো দেখবে, কয়েক হাজার মাইল দূরে তেল আবিবে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে ও।

ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলল রানা। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় তাকাতে গিয়েও তাকাল না। ডান হাতের তর্জনীটা বুলাল নিচের ঠোঁটে। তারপর আঙুলটা চোখের সামনে আনল। তাজা লাল রক্ত দেখতে পাচ্ছে ও।

স্বপ্ন দেখছে না ও। এ ব্যাপারে নিশ্চিত। তাহলে কি? তেল আবিবে মাসুদ রানা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, ঘুম ভাঙল তার নরওয়েতে, অন্য আরেক মানুষ হয়ে। এক মিনিট! ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ঘুম থেকে জেগে নিজেকে মাসুদ রানা হিসেবে জানতে ভুল করেনি ও। চিনতে? হ্যাঁ, চিনতে পারেনি। কারণ, চেহারাটা ওর নয়। অন্য লোকের। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? ভিতরে ও মাসুদ রানাই আছে। কিন্তু বাইরে আনাতোলি পি, ফিলাতভ।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করতে পারছে। কিন্তু থেকে থেকে মোচড় খাচ্ছে পেটটা। কারণটা হঠাৎ বুঝতে পারল ও। সাংঘাতিক খিদে লেগেছে ওর। কাহিল এবং দুর্বল বোধ করার কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু সেই সাথে নতুন একটা প্রশ্ন উদয় হলো মনে। এমন প্রচণ্ড খিদে লাগার কারণ কি? গত রাতে সাড়ে সাতটার দিকে নাইট ক্লাবে ঠেসে ডিনার খেয়েছে ও। তাহলে?

এর মধ্যেও কোথাও একটা গোলমাল আছে।

বেডরূমে ফিরে এল রানা। টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। হঠাৎ মনস্থির করে ক্রাডল থেকে তুলে নিল রিসিভারটা। কানে ঠেকাল। 'রূম সার্ভিসকে চাই,' ইংরেজিতে বলল রানা। নিজের কণ্ঠস্বর কেমন যেন কর্কশ আর অপরিচিত শোনাল কানে।

অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল। বিদেশী টান রয়েছে উচ্চারণে। 'রূম সার্ভিস।'

'কিছু খেতে চাই আমি,' বলল রানা। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল রিস্টওয়াচে। প্রায় দুটো বাজে, 'হালকা কিছু লাঞ্চ।'

'ওপেন স্যান্ডউইচ?' অনুমতি চাইল রূম সার্ভিস।

'চলবে,' বলল রানা। 'সাথে কফি।'

'ইয়েস, স্যার। স্যার, রূম নাম্বারটা...?'

জানে না রানা। দ্রুত চারদিকে তাকাল। জানালার কাছে নিচু কফি টেবিলে একটা চাবির গোছা পড়ে রয়েছে। হাত বাড়িয়ে গোছাটা নিল। প্রত্যেকটি চাবিতে নাম্বার রয়েছে। 'থারটি সিক্স, থার্ড ফ্লোর,' বলল রানা। ঢোক গিলল।

'ভেরি গুড, স্যার।'

'খবরের কাগজ পাঠাতে পারো?' জানতে চাইল।

'ইংলিশ নাকি নরওয়েজিয়ান, স্যার?'

'দুটোই।'

'দ্য টাইমস্?'

'চলবে। এবং একই মানের স্থানীয় একটা দৈনিক। শোনো, বেয়ারা যখন আসবে আমি হয়তো তখন বাথরূমে থাকব। টেবিলে রেখে যেতে বোলো সব।'

'ভেরি গুড, স্যার।'

একটু স্বস্তির সাথে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা। লোকজনের সামনাসামনি এক সময় ওকে হতেই হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে তেমন ইচ্ছা নেই। হাজার হাজার প্রশ্ন জমে আছে মনের ভিতর। এক এক করে সবগুলোর উত্তর পাবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তার আগে আরেকটু ধাতস্থ হবার সময় দিতে চায় নিজেকে। লোকজন

ওকে দেখেই অনেক প্রশ্ন করতে পারে, ফিলাতভ হিসেবে উত্তর দিতে হবে ওকে। ভিতরে রানা হয়ে বাইরে ফিলাতভের মুখোশ পরে অভিনয় করা খুব সহজ কাজ হবে না, বুঝতে পারছে ও।

চেয়ার থেকে ড্রেসিং গাউন তুলে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল ও। প্রথমেই তোয়ালে দিয়ে ঢেকে নিল আয়নাটা।

গরম পানি দিয়ে শাওয়ারটা সেরে নিয়ে পাজামাটা ছাড়ল। বাঁ-হাতে সেঁটে থাকা স্টিকিং প্লাস্টারটা আগেই লক্ষ করেছে, সেটা খুলে ফেলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। কী না কি দেখবে প্লাস্টারের নিচে, এখন বরং থাক।

কাপড় বদলাচ্ছে, এমন সময় চামচ আর প্লেটের টুংটাং আওয়াজ ভেসে এল বেডরুম থেকে। একটু পর দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেল রানা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল কেউ নেই কামরায়। টেবিলের উপর খাবার সাজিয়ে রেখে চলে গেছে বেয়ারা।

ইতোমধ্যে হাঁপিয়ে গেছে ও। উঁচু একটা টুলে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বাঁ পায়ের হাঁটুর ইঞ্চি তিনেক নিচে পুরানো একটা শুকনো ক্ষতচিহ্ন পরীক্ষা করতে শুরু করল। কালচে বাদামী রঙের লম্বাটে একটা দাগ। কি থেকে ক্ষতটা হয়েছিল মনে আছে রানার। তখন আট বছর বয়স ওর। একটা বাইসাইকেল কিনে দিয়েছিল ওর বাবা। সেই সাইকেল থেকে প্রথমবার পড়ে গিয়ে হাঁটুর নিচে এই ক্ষতটা সৃষ্টি হয়েছিল।

মাথা তুলে হাসল রানা। আগের চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ বোধ করছে এখন। নিজের ছোট বেলার একটা ঘটনা মনে করতে পেরে নিজের সম্পর্কে প্রচুর আস্থা অনুভব করছে ও। অন্তত এই ক্ষতচিহ্নটা ফিলাতভের নয়।

হঠাৎ দপ করে নিভে গেল মুখের হাসি। শূন্য সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। হতভম্ব, উদ্‌ভ্রান্ত দেখাল ওকে। আর সব কথা? আর সব ঘটনা? ভাবছে ও। ওর বাবার চেহারা? মায়ের মুখ? স্কুলের মাস্টার, বন্ধু-বান্ধবদের স্মৃতি? কোথায় সব? মনে পড়ছে না কেন?

শূন্য সাদা দেয়ালের মত ফাঁকা সব। কিছুই মনে করতে পারছে না রানা। হাত তুলে মাথায় মৃদু ঘুসি মারছে। কয়েকবার নাড়া দিল দু'হাত দিয়ে ধরে মাথাটাকে।

কিছুই মনে পড়ছে না! কিচ্ছু না!

কে বা কারা, জানে না রানা, ওর চেহারাটা বদলে দিয়েছে। সেই সাথে ওর মনের পর্দা থেকে চেঁছে তুলে নিয়েছে সমস্ত স্মৃতি। অতীত ভুলে গেছে রানা।

তিন

হাঁটুর নিচের দাগটার বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে, অনুভব করছে রানা। ফিলাতভ হয়ে নিজেকে মাসুদ রানা হিসাবে কল্পনা করছে না, এটা তার প্রমাণ। অতীত মনে না পড়লেও, এটুকু অন্তত সঠিক। নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছে, ও মাসুদ রানা।

ফিলাতভ নয়।

ফিলাতভের মুখ থেকে খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো কামিয়ে ফেলল রানা। ফিলাতভ একটু পিছিয়ে পড়া লোক, দাড়ি কামাবার সরঞ্জামগুলো দেখে অন্তত তাই মনে হলো রানার। ইলেকট্রিক শেভার নয়, সে ব্যবহার করে সেফটি রেজার। একে মুখটা নিজের নয়, সম্পূর্ণ অপরিচিত, তার উপর ব্লেড চালানোয় অভ্যস্ত নয়, তাই দাড়ি কামাতে গিয়ে ফিলাতভের মুখের দু'জায়গায় একটু একটু কেটে ফেলল রানা। কাজটা শেষ করে খবরের কাগজ নিয়ে টেবিলে যখন বসল, মুখের দু'জায়গায় রক্তাক্ত দুটো খুদে টয়লেট পেপারের ভগ্নাংশ লেগে রয়েছে।

কাগজ পড়ার ফাঁকে ওপেন স্যান্ডউইচ খাচ্ছে রানা। লন্ডন টাইমস আর নরওয়েজিয়ান অ্যাকটেনপোস্টের দুটো পত্রিকাই জুলাই মাসের নয় তারিখের দেখে থমকে গেল ও। স্যান্ডউইচে কামড় দিতে গিয়েও হাতটা নামিয়ে আনল প্লেটে। মাসুদ রানা হিসেবে শেষ যে কথাটা মনে আছে ওর সেটা হলো: জুলাইয়ের এক তারিখে তাতিনাকে নিয়ে বিছানায় উঠেছিল ও, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছিল মাঝরাতের ঠিক পরপরই—মাঝরাতের পর হলে তারিখটা হবে দোসরা জুলাই।

মাঝখান থেকে পুরো একটা হপ্তা গায়েব হয়ে গেল কি করে? স্মৃতিভ্রংশ? উঁহু! নিজেকে তো চিনতেই পারত না তাহলে।

হাতের স্টিকিং প্লাস্টারটা অপর হাত দিয়ে স্পর্শ করল রানা। ওর শরীরটাকে নিয়ে কে যেন কি করেছে! কে এবং কেন জানে না ও, কিন্তু তাকে খুঁজে বের করতে যাচ্ছে ও। যেই হোক সে, এর জন্যে তাকে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে। দাড়ি কামাবার সময় মুখের বাঁ পাশের দাগটা কাছ থেকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে ও। অনেক পুরানো ক্ষত, কিন্তু আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলে ঠিক শুকনো ঘা বলে অনুভব করা যায় না। অথচ, খুব জোরে ঘষা দিয়েও দেখেছে, চামড়া থেকে সেটা উঠেও আসে না। তার মানে, মেক-আপের কোন বাহাদুরি নয় ব্যাপারটা। ডান চোয়ালের জন্মদাগটাও তাই।

ওর নাক, দু'দিকের গাল এবং দু'ভাগে ভাগ করা থুতনির মধ্যেও কিরকম যেন একটা গোলমাল আছে। ছুঁলে রাবারের মত লাগে। শরীরে কখনও অতিরিক্ত মেদ জমেনি ওর, তাই ঠিক বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা স্বাভাবিক কিনা।

আরেকটা ব্যাপার আবিষ্কার করল রানা। ফিলাতভের মুখে কিছু চুল গজিয়েছিল, সেগুলো কামিয়ে ফেলেছে সে। কিন্তু কপালের উপরের টাকটা দারুণ মসৃণ। তার মানে চুলের রেখা যেই উপর দিকে সরিয়ে নিয়ে যাক, কাজ সে ব্লেডের সাহায্যে করেনি। করেছে অন্য কোন কৌশলে।

ফিলাতভের মুখে শুধু একটা জিনিসই দেখতে পাচ্ছে রানা যা ফিলাতভের নয়, ওর নিজের। চোখ দুটো। একটুও বদলায়নি। প্রতিদিন সকালে ঠিক যেমন সাদা জমির উপর কালো দুটো মণিকে দেখে রানা, এখনও তেমনি দেখতে পাচ্ছে। তবে, চোখের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে, তার কারণ বাঁ দিকের চোখের পাতাটা নিচের দিকে একটু যেন ঝুলে আছে। ওই চোখটার বাইরের কোণে একটা জ্বালা জ্বালা ভাব অনুভব করছে ও। কি একটা সন্দেহ জেগে উঠল মনে, কিন্তু পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল এক কণা চামড়া উঠে গেছে; এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা তেমন কিছু নেই।

কফির কাপে চুমুক দেবার ফাঁকে দ্য টাইমসে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে রানা। পৃথিবীটা এখনও সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে, ওদিকে কোন ঘাপলা দেখা দেয়নি। রাজনৈতিক কলহ ধুমসে চলছে। নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষর সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে রাশিয়া আমেরিকাকে, আমেরিকা রাশিয়াকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে আগের মতই। কাগজটা একপাশে সরিয়ে রাখল রানা। মানব সভ্যতার প্রতি কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা অনুভব করল হঠাৎ। কেন যেন মনে হলো এত কষ্টের, এত সাধের এই সভ্যতা বড় বেশি ঠুনকো, যে কোন মুহূর্তে গুঁড়ো হয়ে ধসে পড়তে পারে।

দীর্ঘ একটা চুমুক দিল রানা ধূমায়িত কফির কাপে। একটা সিগারেট ধরাল। ধুঁয়োটা বিষাদ লাগল মুখে। আবার মনে পড়ল পাইপ খায় ও। কিন্তু কোন্ ব্র্যান্ডের টোবাকো খায়, অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না। তবে, সেটার গন্ধ এবং স্বাদ কেমন তা কল্পনা করতে পারছে।

ভাবছে রানা। তেল আবিবের একজন ঘুমন্ত লোককে বিছানা থেকে তুলে, তার চেহারা বদলে দিয়ে, স্মৃতি কেড়ে নিয়ে, তাকে নরওয়ের একটা বিলাসবহুল হোটেলে নিয়ে এসে ফেলে রেখে কার কি লাভ?

উত্তর জানা নেই।

লাঞ্চ খেয়ে শরীরের ক্লান্তি আর দুর্বলতা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে ও। চুপচাপ শুয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল মনে। সে কি খুব ব্যস্ত মানুষ ছিল? সারাক্ষণ দৌড়াদৌড়ির মধ্যে থাকত? তা নাহলে কিছু একটা করার, কোথাও যাবার একটা তাগাদা অনুভব করছে কেন ভেতর থেকে? ইহুদি ও, ইসরায়েলী, তাতে কোন সন্দেহ নেই—এটুকু পরিষ্কার। কিন্তু, পেশাটা কি ওর?

বাইরে বেরোবার কথা ভাবতে গিয়েই মনটা কুঁকড়ে গেল। এখুনি লোকজনের সামনে যেতে চায় না ও। আরও কিছু সময় দরকার। কিছু ঘটে কিনা দেখা যাক। হয়তো কিছু কিছু স্মৃতি ফিরে আসতে পারে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপস করল রানা। বাইরে এখন যাবে না। তার চেয়ে ফিলাতভের জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে দেখা যাক কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা।

ওয়ারড্রোবটা খুলল রানা। ভেতরের একটা দেরাজ টেনে বের করল। এক গাদা আন্ডারওয়্যার, তার নিচে বড়সড় একটা ট্রাভেলিং ওয়ালেট দেখল। ড্রেসিং টেবিলের কাছে নিয়ে এসে সেটার চেন খুলল।

প্রথমেই চোখে পড়ল একটা ইসরায়েলী পাসপোর্ট। খুলল সেটা। ওর নিজের হাতের লেখা চিনতে পারল রানা। পাসপোর্ট হোল্ডারের যাবতীয় ব্যক্তিগত তথ্য লেখা রয়েছে। অপর পৃষ্ঠায় ছবির নিচে ওর হাতেই ফিলাতভের নাম সই করা। সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে ফিলাতভকে। গোটা কীর্তিটা যারই হোক, নিখুঁতভাবে কাজটা করেছে সে, কোথাও কোন ফাঁক ফোকর রাখেনি।

পাসপোর্টের পাতা ওল্টাতে শুরু করল রানা। মাত্র এক জায়গায় এন্ট্রির স্ট্যাম্প লাগানো রয়েছে। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর জায়গাটার নাম পড়তে গিয়ে। Sverige? সুইডেনে নাকি? তা যদি হয়, তাহলে সুইডেনের আরলানডা নামে এক জায়গায় গিয়েছিল ও—কিন্তু কবে, কোন্ মাসের কত তারিখে, বোঝা যাচ্ছে না। তারিখ

লেখা জায়গাটায় সীল পড়ে সব ঢেকে দিয়েছে। পাসপোর্টের পেছন দিকে লেখা রয়েছে, মাসখানেক আগে সাড়ে চার হাজার পাউন্ড ইস্যু করা হয়েছে ওর নামে। কিন্তু ট্র্যাভেল অ্যালাউন্স হিসেবে কাউকে নয়শো পাউন্ডের বেশি দেয়া হয় না। তার মানে, ফিলাতভ বিজনেসম্যানস অ্যালাউন্সের অতিরিক্ত সুবিধেটুকু পুরোমাত্রায় ভোগ করছে।

ওয়ালেটের সবচেয়ে নিচের পকেটে একটা আমেরিকান এক্সপ্রেস ক্রেডিট কার্ড পেল রানা। আঙুল দিয়ে নাড়ছে পাতাগুলো। এটা দিয়ে যে-কোন জায়গা থেকে টাকা তুলতে পারে ও, ইচ্ছা করলে ইসরায়েলে যাবার একটা বিমানের টিকেট কিনতে পারে। ওর বিরুদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ যদি না করে থাকে, এটার সাহায্যে পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় যেতে পারবে সে, ভোগ রকতে পারবে ভ্রমণের অবাধ স্বাধীনতা।

মানিব্যাগ আর ড্রাইভিং লাইসেন্সের সাথে ওয়ালেটটা রেখে দিল রানা। প্রয়োজনে সবচেয়ে বেশি কাজ দেবে এটা।

ফিলাতভের ওয়ারড্রোবে একগাদা পোশাক দেখল রানা। লাউঞ্জ স্যুট, ডিনার জ্যাকেট দু'জোড়া করে। ছোট্ট একটা বাক্স পেল। তাতে ব্যক্তিগত কিছু মূল্যবান জিনিস। সোনার বোতাম, টাই-পিন, একজোড়া আঙটি। ওজন অনুভব করে বুঝল, হাজার তিনেক পাউন্ডের সোনা রয়েছে ওর হাতে। হাতের ঘড়ি পাটেক ফিলিপের দামও হাজার পাউন্ডের কম হবে না। ফিলাতভ ধনী লোক, কোন্ শ্রেণীর সিভিল সার্ভেন্ট সে তাহলে?

পোশাক পরার সিদ্ধান্ত নিল রানা। রোদ ঝলমলে দিন, তাই স্যুট পরবে না। সাধারণ একটা ট্রাউজার আর একটা স্পোর্টস কোট পরল ও। শরীরের কাঠামোর সাথে খাপে খাপে মিলে গেল দুটোই, যেন ওর জন্যেই তৈরি করে রাখা হয়েছে। ওয়ারড্রোবের দরজায় লাগানো প্রমাণ সাইজের আয়নায় নিজেকে দেখল রানা। কাঁধের উপর বসানো মুখটাকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল ও। মুখটা যেন আলাদা একটা ব্যক্তিত্ব, ওর সাথে সদ্ভাব নেই, বলতে গেলে একরকম শত্রুই। কিন্তু না তাকালেও কল্পনা করতে গিয়ে বুঝতে পারল মুখটা ওকে ব্যঙ্গ করছে, নিঃশব্দে ভেঙচাচ্ছে। 'শালা!' দাঁতে দাঁত পিষে গালি দিল রানা।

মাথাটা আবার ঘুরতে শুরু করল। তবে হাঁটুর নিচের পুরানো ক্ষত চিহ্নটার কথা মনে পড়ে গেল সাথে সাথে, দ্রুত নিজেকে সামলে নিতে পারল রানা।

ব্যক্তিগত জিনিসগুলো পকেটে ভরে নিল রানা। দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ভাবছে। দরজার ওপারে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা জগৎ। বেরোবে?

সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দৃঢ় পায়ে এগোল রানা। হাতে চাবির গোছা।

দরজার কবাট দুটো উন্মুক্ত হতেই বাইরের দরজার হাতলের সাথে আটকে থাকা একটা কার্ড পড়ে গেল মেঝেতে। ঝুঁকে পড়ে সেটা তুলে লেখাটা পড়ল রানা।

VENNLIST IKKE FORSTYRR—PLEASE DO NOT DISTURB.

দরজাটা বন্ধ করার আগে ভিতর দিকের হুকে কার্ডটা ঝুলিয়ে রাখল রানা। কার কাজ এটা জানার জন্যে পকেটের সব টাকা খরচ করতেও আপত্তি নেই ওর।

এলিভেটরে ওর সাথে চড়ল দু'জন আমেরিকান প্রৌঢ়া। কান ঝালাপালা করে ছাড়ল। এত বেশি কথা বলছে যে রীতিমত হাঁপাচ্ছে কথা বলতে গিয়ে। 'ভিজিল্যান্ড পার্কে গেছ? কত্তো স্ট্যাচু, কোন্টা যে দেখব ভেবে পাই না!' এলিভেটর গ্রাউন্ড ফ্লোরে থামতে মৃদু হিস্স্ শব্দে খুলে গেল দরজা, রানাকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল দুই প্রৌঢ়া। শহরের দর্শনীয় কিছু দেখতে পাচ্ছে ওরা। ঈর্ষা হলো রানার। নিজেদের সম্পর্কে ওদের কোন সংশয় নেই, সন্দেহ নেই। অতীতের সব কথা মনে আছে ওদের। নিজেদের সম্পর্কে কিছু অজানা নেই। ভিতরে-বাইরে ওরা কেউ ওর মত আলাদা নয়।

ধীর পায়ে এগোচ্ছে রানা। লবিতে পৌঁছে থামল। কোন্ দিকে যাবে, কি করবে, ভাবছে। স্বাভাবিকভাবে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

'মি. ফিলাতভ! মি. ফিলাতভ, স্যার!'

স্বাভাবিক ভাবে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল রানা। ডেস্কের পেছনে ইউনিফর্ম পরা পোর্টার দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে।

শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটো একটু ভাঁজ করে মুখের ভিতর নিয়ে জিভ ঠেকিয়ে ভিজিয়ে নিল রানা। এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল। 'বলো।'

'দয়া করে এখানে একটা সই দেবেন, স্যার? আপনার রুমে খাবার পাঠানোর চেক। কিছু না, স্রেফ ফরমালিটি।'

পোর্টারের হাতে কলম। চাবির গোছাটা ডেস্কে নামিয়ে রেখে সেটা নিল রানা। ছোট্ট কাগজের স্লিপে কলমের চাপ দিয়ে লিখল, 'এ. পি. ফিলাতভ।'

ওর দিকে পেছন ফিরে চাবির গোছাটা তুলে র‍্যাকে রাখছে পোর্টার। রানা কেটে পড়তে যাবে, লোকটা ওকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'নাইট পোর্টার তুলে রেখেছে আপনার গাড়ি, স্যার। এই যে চাবিটা।'

ঘুরে দাঁড়াল পোর্টার। রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল গাড়ির চাবি। হাত বাড়াল রানা। চাবির সাথে ঝুলন্ত একটা প্লাস্টিকের চাকতি, তাতে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে Hertz সেই সাথে গাড়ির নাম্বার। গলাটা পরিষ্কার করে নিল রানা, বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

সাথে সাথে ভদ্রতাসূচক একটু উদ্বেগ ফুটে উঠতে দেখল রানা পোর্টারের মুখে। 'আপনার বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে, স্যার।'

প্রশ্ন করার সুযোগটা হাতছাড়া করল না রানা। 'কেন মনে হচ্ছে কথাটা তোমার?'

'গলাটা কেমন অচেনা লাগছে কানে, স্যার।'

'ঠিক বলেছ। জাম হয়ে আছে বুকটা। গলা বসে গেছে।'

হাসল পোর্টার। 'খুব বেশি রাতের বাতাস লেগে এমন হয়েছে।'

আরেকটা সুযোগ নিল রানা। 'গত রাতে ক'টায় ফিরেছিলাম বলো তো?'

'ভোরের দিকে, স্যার। নাইট পোর্টার বলল আপনি তিনটের দিকে ফিরেছেন।' সবজান্তার ভঙ্গিতে হাসল পোর্টার। 'এত বেলা করে ঘুমাচ্ছেন দেখে তাই আমি অবাক হইনি।'

না! ভাবল রানা। কিন্তু নাইট পোর্টার যা দেখেছে তাও সত্যি হতে বাধ্য। ভুল

দেখবে কেন সে? মিথ্যেই বা বলবে কেন? যাই হোক এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য। আত্মবিশ্বাস বাড়ছে ওর। 'আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারো আমাকে? এক বন্ধু জানতে চাইছিল অসলোয় কদ্দিন ধরে আছি—কিন্তু, এমন ভুলো মন আমার, কোনমতেই মনে করতে পারলাম না ঠিক কোন্ দিন এই হোটেলে উঠেছি। খাতা দেখে তারিখটা জানাতে পারো আমাকে?'

'অবশ্যই, স্যার,' রানার দিকে পেছন ফিরল পোর্টার। একটা ফাইল টেনে নিয়ে কার্ডগুলোয় চোখ বুলাতে শুরু করল।

এই ফাঁকে গাড়ির চাবিটা দেখছে রানা। Hertz কোম্পানিকে ধন্যবাদ, ভাবছে ও, চাবির সাথে গাড়ির নাম্বারটা রেখেছে তারা। গাড়িটাকে খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে পোহাতে হবে না ওকে। নাইট পোর্টারেরও একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য, গাড়িটা তুলে রেখেছে সে। কিন্তু তুলে রেখেছে কোন্ চুলোয়?

ওর দিকে ফিরল পোর্টার। 'জুনের আঠারো তারিখে, স্যার। ঠিক তিন হপ্তা আগে।'

তলপেটের ভিতরে একটা আলোড়ন অনুভব করল রানা।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' নিজের কানেই বেসুরো শোনাল শব্দটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটছে। একটা তীরচিহ্ন আঁকা সাইনবোর্ড দেখল, বার-এর দিক নির্দেশ করছে। বাঁ পাশে তাকিয়ে ছায়ায় ঢাকা ঠাণ্ডা একটা নিচু চাতাল দেখল রানা। মাথাটা নক্সা করা কাঠের তক্তা দিয়ে ছাওয়া। কয়েকজন লোক বসে পান করছে, বেশির ভাগই একা, এক জোড়া জুটিও রয়েছে। বেশ শান্ত পরিবেশ। ওখানে বসে চিন্তা করা যেতে পারে।

একটা টেবিল দখল করে বসল রানা। একটু পরই এল একজন বেয়ারা। 'একটা বিয়ার, প্লীজ,' অর্ডার দিল ও।

'এক্সপোর্ট কোয়ালিটি, স্যার?'

অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল রানা। জুনের আঠারো তারিখ। এর আগে আবিষ্কার করেছে ও, তেল আবিবে ঘুমিয়ে পড়ার পর থেকে এই অসলোয় ঘুম ভাঙার মাঝখানে একটা হপ্তা হারিয়েছে ও, তাহলে অসলোর এই হোটেলে তিন হপ্তা আগে কিভাবে উঠল? একই সময় দু'জায়গায় কিভাবে ছিল ও?

বেয়ারা ফিরে এসে বোতল থেকে গ্লাসে বিয়ার ঢেলে দিয়ে চলে গেল। জুনের আঠারো তারিখে কোথায় ছিল, শত চেষ্টা করেও মনে করতে পারছে না। দীর্ঘ একটা সময়। জুন মাসের আঠারো তারিখে সন্ধ্যা ছ'টা সতেরো মিনিটে কোথায় তুমি ছিলে? তিন হপ্তা কেটে যাবার পর এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়া সহজ নয়। সেজন্যে অ্যালিবাই দাঁড় করাতে হিমশিম খেতে হয় লোককে। ওর ব্যাপারটা অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। দুর্বল স্মরণশক্তির শিকার নয় ও। ওর ব্যাধিটা আরও সাংঘাতিক: স্মৃতির পাতায় আঁচড়টি পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই, ধবধবে সাদা, শূন্য হয়ে গেছে।

আবছাভাবে কি যেন একটা মনে পড়তে চাইছে। সতেরো…১৭, ১৮…একটা বন্দর…গলফ কোর্স…বিকেল বেলায়—হঠাৎ উজ্জ্বল আলোর ঝলকের মত মনে পড়ে গেল ব্যাপারটা। হ্যাঁ, সতেরো এবং আঠারো তারিখে হাইফায় ছিল ও। আঠারো তারিখে বিকেল বেলা গলফ খেলেছে…কার সাথে? কি আশ্চর্য, তা মনে

নেই। সন্ধ্যায় সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, রাত করে হোটেল আকুরায় ডিনার খেয়েছে।

তার মানে? মাসুদ রানা হিসেবে ইসরায়েলের বন্দর শহর হাইফার হোটেল আকুরায় যে-সময় ডিনার খেয়েছে ও, ঠিক সেই সময় আনাতোলি পি. ফিলাতভ হিসেবে ডিনার খেয়েছে নরওয়ের অসলোর হোটেল কন্টিনেন্টালে। কি করে হয় তা?

হলুদ বুদ্বুদ উঠছে গ্লাসে, একদৃষ্টিতে তাই দেখছে রানা হঠাৎ খেয়াল হতে গ্লাসটা তুলে নিয়ে এই প্রথম চুমুক দিল। ঠাণ্ডা একটা অনুভূতিতে ছেয়ে গেল শরীরটা।

ওকে সমর্থন করছে দুটো মাত্র ব্যাপার, এ দুটোর সমর্থন না পেলে এতক্ষণ উন্মাদ হয়ে যেত ও। এক, আনাতোলি পি. ফিলাতভের হাঁটুর নিচে মাসুদ রানার ক্ষতচিহ্ন। দুই, কণ্ঠস্বরটা ফিলাতভের নয়—এ ব্যাপারে পোর্টারও নিজের অজ্ঞাতে সাক্ষ্য দিয়েছে। এসব থেকে আসল ব্যাপার কি বেরিয়ে আসছে?

কোন সন্দেহ নেই, এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ফিলাতভ একজন নয়, দু'জন। একজন জুনের ১৮ তারিখে এই হোটেলে উঠেছে, আরেকজন—ও নিজে—যাকে স্রেফ এখানে নিয়ে এসে রেখে যাওয়া হয়েছে। কিভাবে বা কেন, এসব প্রশ্ন এখন থাক, মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই আপাতত। ঘটনাটা ঘটেছে, সোজাসুজি এটা মেনে নেয়া যাক।

দু'ঢোক বিয়ার খেয়ে গালে হাত রেখে গম্ভীর তন্ময়তার সাথে ভাবছে রানা। ওর জীবন থেকে একটা হপ্তা খসে গেছে। এতটা প্লাস্টিক সার্জারি কি এই এক হপ্তায় করা সম্ভব? খোঁজ খবর নিতে হবে যে-সব ব্যাপারে, তার মধ্যে এটাও একটা—নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল ও।

এখন করণীয় কি? নিজের দেশের দূতাবাসে যেতে পারে ও, গিয়ে ওদেরকে সব কথা খুলে বলতে পারে। কিন্তু ইসরায়েলী দূতাবাস কোথায় তা জানা নেই ওর।

তবু, দূতাবাসে গেলে কি ঘটতে পারে, মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করল রানা।

'আপনার জন্যে আমরা কি করতে পারি, মি. ফিলাতভ?'

'দেখুন, আমি ঠিক ফিলাতভ নই—কে সে, আমি তা জানিও না। আমার নাম মাসুদ রানা, আমাকে তেল আবিব থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আমার চেহারা বদলে আমাকে অসলোর হোটেল কন্টিনেন্টালে ফেলে রাখা হয়েছে, সাথে প্রচুর টাকা, এবং আনলিমিটেড ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট। আমাকে আপনারা সাহায্য করতে পারেন?'

'খুব পারি, মি. ফিলাতভ। ওহে, এক্ষুণি ডাক্তারকে খবর পাঠাও। বলো, একটা বদ্ধ পাগলের চিকিৎসা করতে হবে...'

এরপর কি ঘটবে সহজেই অনুমান করতে পারল রানা। ধরেবেঁধে ওকে ভরা হবে পাগলাগারদে। 'মাই গড!' আঁতকে উঠল ও।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বেয়ারা। এগিয়ে এল রানার দিকে। 'কিছু চাইছিলেন, স্যার?'

'বিল দাও।' শেষ চুমুক দিয়ে বিয়ারের গ্লাসটা ঠক্ করে নামিয়ে রাখল রানা টেবিলে। পকেট থেকে এক গাদা খুচরো পয়সা বের করে টেবিলে রেখে বেয়ারার দিকে তাকাল, 'তুলে নাও।'

একটু ইতস্তত করে কয়েকটা চাঁদির মুদ্রা তুলে নিল বেয়ারা। নিঃশব্দে একটা হাঁফ ছাড়ল রানা। টেবিলে এখনও অনেক পয়সা। 'তোমার বকশিশ,' মুচকি হেসে বলল ও, 'যা ইচ্ছা মুঠোয় ভরো।'

সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে বড়লোকি কৌতুক মনে করে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে হাসছে বেয়ারা। মাঝারি আকারের একটা মুদ্রা তুলে নিল সে। মাথা নিচু করে বাউ করল রানাকে।

বাকি খুচরোগুলো পকেটে ভরে বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। লবিতে গ্যারেজ লেখা একটা সাইন দেখে বাঁক নিল, দরজা টপকে বেরিয়ে এসে একটা সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামল। সেখান থেকে বেসমেন্টের কার পার্কে। প্রথম সারির গাড়িগুলোর সামনে দিয়ে নাম্বার দেখতে দেখতে এগোচ্ছে। পোর্টারের দেয়া হার্জ কী-এর নাম্বারের সাথে সারির সব শেষ গাড়িটার নাম্বার মিলে গেল। ওরেব্বাস! এ যে মস্ত এক কালো মার্সিডিজ।

দরজার তালা খুলল রানা। প্রথমেই চোখে পড়ল, ড্রাইভারের সীটে একটা পুতুল। আনাড়ি হাতে কাঠ আর দড়ি দিয়ে তৈরি করা অদ্ভুত এক বস্তু। এক খণ্ড দড়িকে যতবার দরকার পাক খাইয়ে গড়া হয়েছে পুতুলের শরীরটা, শেষ প্রান্তটা বেরিয়ে এসেছে লেজের চেহারা নিয়ে। পা দুটো না থাকলেই নয় তাই আছে, আর মাথাটা ঠিক যেন একটা গোল পেয়ারা, তাতে বড়শির মত একটা নাক। চোখ দুটো আর মুখটা মোচড় খেয়ে সরে আছে একদিকে, কাঠের উপর কালি ঢেলে রঙ করা হয়েছে। দুটো বেণী তৈরি করা হয়েছে দড়ির অপর প্রান্তটাকে দু'ভাগে ভাগ করে। ছোট্ট পুতুলটার মধ্যে কেমন একটা বিদঘুটে, কদর্য ভাব আছে, লক্ষ করল রানা।

হাত বাড়িয়ে পুতুলটা তুলতেই নিচের চিরকুটটা দেখতে পেল ও। কাগজের ছোট্ট একটা টুকরো। ভাঁজ করা। টুকরোটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলল ও। দ্রুত হাতে, আঁকা-বাঁকা ইংরেজি অক্ষরে দুটো বাক্য লেখা: তোমার ড্রামেন ডলি তোমার জন্যে স্পাইরালটোপেনে অপেক্ষা করছে। ১০ জুলাইয়ের ভোর বেলা।

ভুরু কুঁচকে উঠল। আগামীকালই দশ তারিখ। কিন্তু এই চিরকুটের মানে কি? স্পাইরালটোপেন, কোথায় জায়গাটা? ড্রামেন ডলিই বা কি—বা কে? কুৎসিত পুতুলটার দিকে তাকাল রানা। ড্রাইভিং সীটে পড়ে ছিল এটা, এর মানে ও যাতে দেখতে পায় তার জন্যে ইচ্ছে করেই রেখে গেছে কেউ। কয়েকবার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লোফালুফি করল পুতুলটাকে, তারপর পকেটে ভরে রাখল। উঁচু হয়ে থাকল পকেটটা। চোখে পড়ার মত। কিছু এসে যায় না। চিরকুটটাকে তুলে রাখল ওয়ালেটে।

একেবারে নতুনই বলা চলে গাড়িটাকে, মাত্র পাঁচশো কিলোমিটার গড়িয়েছে। গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে কিছু কাগজপত্র পেল ও, হার্জ কোম্পানির কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া করার চুক্তিপত্র। পাঁচদিন আগে ভাড়া করা হয়েছে মার্সিডিজ।

বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়ির দরজায় তালা লাগাল রানা। গাড়ি বের করার পথ

দিয়ে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এল হোটেলের পেছন দিকের রাস্তায়।

একটু বিস্ময়কর ঠেকল. রাস্তার উল্টো পাশ ধরে যানবাহন চলাচল করছে। রাস্তার পাশে এবং দোকানগুলোর মাথায় সব সাইনবোর্ড নরওয়েজিয়ান ভাষায় লেখা। মাতৃভাষা বাংলা, বা উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজির নাম-নিশানা কোথাও দেখতে পাচ্ছে না রানা।

ফুটপাথ ধরে হাঁটছে ও। একটা বুকস্টলের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তথ্য দরকার। হঠাৎ থামল ও। রাস্তা পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। পাওয়া গেছে বুকস্টল।

দোকানটা থেকে একটা সেন্ট্রাল অসলোর, একটা গ্রেটার অসলোর আর একটা মটরিং রুট অভ সাউদার্ন নরওয়ের ম্যাপ, এবং একটা সিটি গাইড বুক কিনল ও। ফিলাতভের ওয়ালেট থেকে নরওয়েজিয়ান একটা কাগজের নোট বের করে দিল দোকানদারকে। লোকটা তার প্রাপ্য রেখে ভাঙতি টাকা ফেরত দিল। সুযোগ পেলেই কত টাকা আছে ওয়ালেটে গুনে দেখতে হবে, ভাবল রানা। বুকস্টল থেকে বেরিয়ে পাশের টোবাকোর দোকানে ঢুকল ও। কড়কড়ে নতুন আরেকটা নোট ভাঙিয়ে একটা ব্রায়ার টোবাকো পাইপ এবং এক কৌটা ক্যাপস্টান পাইপ টোবাকো কিনল।

হোটেলে ফিরতে চাইছে এখন। ম্যাপ দেখে নিজের অবস্থান, চারপাশের জগৎ ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ একটা ধারণা পেতে হবে ওকে বাঁকের কাছে পৌঁছে থামল। রাস্তার নাম লেখা একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়েছে—সম্ভবত বিদেশীদের স্বার্থেই ইংরেজি অক্ষরে লেখা হয়েছে নামটা, রোয়াল্ড অ্যামুন্ডসনস্ গাটা।

'আন্তন!'

বাঁক ঘুরে এগোচ্ছে রানা, কিন্তু কাঁধে হাত পড়তে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ওকে। ঝট্ করে তাকাল পেছনে।

'আন্তন ফিলাতভ!' দুঃখ, রাগ আর ক্ষোভ একসাথে প্রকাশ পাচ্ছে মেয়েটার গলার সুরে।

ঢোক গিলল রানা। রূপ নয়, যেন আগুন। মাথায় লালচে ঝুঁটি। চোখ দুটো গভীর সবুজ। রানার চেয়ে একটু কম হবে লম্বায়। কোমরটা চিকন, কিন্তু গুরু নিতম্ব। ট্রাউজারে গোঁজা সাদা ফুলহাতা শার্টের ভিতর থেকে সুগঠিত বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। লালচে পাকা আপেলের মত ফোলা দু'গালের মাঝখানে সুন্দর একটা নাক। সব মিলিয়ে অপরূপ সুন্দর। আরেকবার ঢোক গিলল রানা। কিন্তু মুখ খুলতে গিয়ে অনুভব করল, ভাঁড়ারে কোন শব্দ নেই।

'সারাটা সকাল তোমার জন্যে ঠায় আমি একপায়ে দাঁড়িয়ে!' রানার হাত ধরে ঝাঁকি দিল মেয়েটা। 'কি হয়েছে তোমার? কোথায় ছিলে তুমি?'

'হোটেলেই তো ছিলাম,' মৃদু গলায় বলল রানা। খক্ খক্ করে দু'বার কাশল। 'শরীরটা ভাল ছিল না। বিছানায় শুয়ে ছিলাম।'

'টেলিফোন নামে একটা যন্ত্র আছে,' লাল চুল ভর্তি মাথা আর রাগে লাল মুখটা রানার চোখের একেবারে সামনে সরিয়ে আনল মেয়েটা। 'আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল আবিষ্কার করেছেন সেটা—মনে পড়ে?'

যা করা উচিত বলে মনে হবে তাই করে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা। মেয়েটার কথায় একটু হাসল ও। কিন্তু পরমুহূর্তে একটা ক্লান্ত ভাব ফুটিয়ে তুলল মুখের চেহারায়। 'ঘুমের জন্যে স্লিপিং পিল খেতে হয়েছিল,' প্রতিবাদের সুরে বলল ও। 'সম্ভবত ওভারডোজ…'

মুহূর্তে বদলে গেল মেয়েটা। উদ্বেগের ছায়া ফুটল মুখে। ভাল করে দেখল রানাকে। 'শরীর খারাপ, সত্যি?'

ক্লান্তভাবে হাসল রানা। 'সত্যি।'

'তাহলে হয়তো ক্ষমা করা যেতে পারে তোমাকে,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে বলল মেয়েটা। 'কিন্তু ক্ষতিপূরণ না দিয়ে পার পাবে তা ভেব না! ড্রিঙ্কের বিলটা তোমাকেই দিতে হবে।' রানার হাতটা বগলদাবা করে একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে চলল সে।

হোটেলের দিকে নয়, অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা ওকে, বুঝতে পেরে একটু অস্বস্তি বোধ করল রানা। অপরিচিত একটা মেয়ের সাথে অপরিচিত কোন জায়গায় যেতে মন চাইছে না। বলল, 'হোটেলে গেলে হয় না?'

শুনেই দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটা। রানার দিকে অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে তাকাল। চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্রয়, মুখে কৃত্রিম তিরস্কারের ভাব। 'রোজ রোজ কি পেয়েছ তুমি, শুনি? আমাকে দেখলেই বুঝি ইচ্ছা হয় তোমার?'

'কি ইচ্ছা হয়?' প্রশ্নটা করেই অনুভব করল রানা, বোধহয় বোকামি করে ফেলেছে ও।

'ন্যাকামি হচ্ছে, না? কি ইচ্ছা হয় জানো না? ভিজে বিড়াল? বাই গড, এভাবে যদি রোজ একবার করে রেপ করো…'

আগেই একটু বুঝেছিল। এবার পুরোপুরি চোখ খুলে গেল রানার। যাই হোক, ফিলাতভের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে একটু একটু করে জ্ঞান বাড়ছে ওর। বলল, 'ঠিক আছে, তোমার যেখানে খুশি, চলো।'

'যেখানে খুশি মানে?' ভুরু কুঁচকে তাকাল মেয়েটা। সবনাশ, কি ভুল করে ফেললাম কে জানে—ভাবল রানা। 'তোমার সাথে স্টুডেন্টারলান্ডেনে ছাড়া কবে কোথায় গেছি আর? ওহ্, বুঝেছি, সাহেব ঝাল দেখাচ্ছেন, ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে, গলাটা ভিজিয়ে আগে গা গরম করে নিই এসো, তারপর তোমার মনের খিদে মেটানো যায় কিনা ভেবে দেখা যাবে'খন।' একটা চোখ টিপল মেয়েটা। 'এই না বললে তোমার শরীর খারাপ। পুরুষ জাতটা না…!' অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করল সে। ফুটপাথ থেকে টেনে নামাল রানাকে। হাত দেখিয়ে একটা বাসকে দাঁড় করাল। রাস্তা পেরোচ্ছে ওরা।

ফাঁদে আটকে পড়েছে, সেজন্যে অস্বস্তি বোধ করছে রানা। কিন্তু সেই সাথে এটাও বুঝতে পারছে, ফিলাতভ সম্পর্কে কিছু যদি জানতে চায়, এমন সুযোগ হাতছাড়া করা চলে না।

রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথে উঠল ওরা।

'জ্যাক জাস্টিসের সাথে আজ সকালে দেখা হয়েছে,' বলল মেয়েটা। 'তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

'কেমন আছে সে?'

হাসল মেয়েটা। 'সদা প্রফুল্ল। কেমন লোক জানোই তো!'

'জানি বৈকি,' ফ্যাকাসে মুখে বলল রানা। 'গুড ওল্ড জ্যাক!'

একটা আউটডোর কাফেতে ঢুকল ওরা। খানিক অপেক্ষা করার পর একটা খালি টেবিল জুটল কপালে। চারদিকে ছাত্রছাত্রীদের ভিড়, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা মেয়েকেও পাশের মেয়েটার মত সুন্দরী মনে হচ্ছে না রানার। ছাত্ররা ঈর্ষাকাতর চোখে তাকাচ্ছে ওর দিকে, দেখেও কোন অনুভূতি হলো না রানার। অন্য সময় হলে করুণা বোধ করত হয়তো ওদের জন্যে। চেয়ারে বসল ওরা। হাতের ভাঁজ করা ম্যাপগুলো টেবিলে রাখল রানা। নখ পালিশ লাগানো তর্জনী তুলল মেয়েটা সেগুলোর দিকে। 'কি ওগুলো?'

একটু ইতস্তত করল রানা। 'ম্যাপ।'

'কোথাকার ম্যাপ?'

'শহরের।'

'অসলোর!' কৌতুকে নেচে উঠল মেয়েটার চোখ। 'অসলোর ম্যাপ দিয়ে কি দরকার তোমার? তুমিই না গর্ব করে বলো, তেল আবিবের চেয়ে অসলোকে বেশি ভাল করে চেনো?'

'এগুলো একজন বন্ধুর জন্যে।'

ফিলাতভের অত্যন্ত পরিচিত শহর অসলো, ভাবছে রানা, সম্ভবত প্রায়ই এখানে আসা-যাওয়া করে সে। স্থানীয় পরিস্থিতি এবং হালচাল সম্পর্কে কথা না বলাই ভাল, নিজের অজ্ঞাতে বেফাঁস কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

'তাই বলো!' সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলল মেয়েটা।

প্রতিমুহূর্তে অদ্ভুত একটা অসুবিধের মুখোমুখি হচ্ছে রানা। মেয়েটার নাম জানে না ও। আলাপের সময় নিজের নাম হঠাৎ কেউ উচ্চারণও করে না, সুতরাং নামটা জানার কোন উপায় নেই। আছে, হঠাৎ আবিষ্কার করল ও। ওর চোখ পড়েছে মেয়েটার হাতব্যাগে। ওটা হাতড়াবার একটা সুযোগ পেলে শুধু নাম নয়, আরও কিছু হয়তো জানা যেতে পারে।

সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য পথ এত দ্রুত আবিষ্কার করতে পেরে খুশি হয়ে উঠল রানা, কিন্তু সেই সাথে একটা হাস্যকর সম্ভাবনাও উঁকি দিল মনে। এত থাকতে হঠাৎ হাতব্যাগ হাতড়াবার ইচ্ছাটা জাগল কেন? পকেটমারদের স্বভাব এটা। তবে কি···নাহ্! সম্ভাবনাটা সাথে সাথে দূর করে দিল রানা। এতটা আজেবাজে লোক হতে পারে না ও, অন্তত মন স্বীকার করছে না কথাটা। তাছাড়া, সাধারণ একজন পকেটমারের চেহারা বদলে কোন উদ্দেশ্য পূরণ করার চেষ্টা কোন পাগলও করবে না। চেহারা বদল করা থেকেই প্রমাণ হয়, কোন না কোন লাইনে প্রথম সারির সেরা লোক ছিল ও। তা নাহলে ওকে বেছে নেয়া হত না।

'একটা সিগারেট দাও তো, ডারলিং।'

ঠিক এই প্রশ্নের অপেক্ষাতেই ছিল রানা। 'দুঃখিত। সিগারেট সাথে নেই।'

'কি!' বিষম খেলো মেয়েটা। 'তোমার সাথে সিগারেট নেই? তোমার হাতের পাঁচটা আঙুলই নেই, একথা শুনেও এতটা আশ্চর্য হবে না কেউ। মানেটা কি?

প্রফেসর ফিলাতভ কি তাহলে ধূমপান ছেড়ে দিল্? এখন আর ক্যান্সারে বিশ্বাস না করে উপায় নেই আমার।'

প্রফেসর!

আবার অসুস্থতার অজুহাত তুলল রানা। 'ধূমপান ছেড়ে দিয়েছি তা ঠিক নয়। শরীরটা খারাপ, তাই সিগারেট বিস্বাদ লাগছিল। আমি...'

'সিগারেট ছাড়া ফিলাতভ, ইফেল টাওয়ার ছাড়া প্যারিস—কল্পনায় আসে না।'

একটা মেয়ে ওয়েটার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। সঙ্গিনীর দিকে চোখ তুলল রানা। 'তোমার জন্যে কি?'

'যা সব সময় দেয়,' হাতব্যাগ হাতড়াচ্ছে মেয়েটা।

রুমাল বের করে মুখের কাছে তুলল রানা। কাশছে। ওর সঙ্গিনীর কাছ থেকে অর্ডার পেয়ে মেয়ে ওয়েটার সরে না যাওয়া পর্যন্ত কাশিটা চালিয়ে গেল সে।

'কাশিটা ভাল মনে হচ্ছে না, আন্তন। ক্যান্সার কাঠি ত্যাগ করে ভালই করেছ।'

'কাঠির বদলে বাঁশ ধরেছি,' বলল রানা। পকেট থেকে পাইপ আর টোবাকো বের করে রাখল টেবিলে। 'সিগারেটে স্বাদ পাচ্ছি না বলে এগুলো কিনলাম। দেখা যাক।'

'ওরে বজ্জাত!' হাসছে মেয়েটা। 'তোমার সবকিছুতে প্রফেসরি ফলানো চাই, না?'

পাইপে টোবাকো ভরছে রানা। মুখ না তুলেই বলল, 'আমি প্রফেসর এ কথা বারবার উল্লেখ কোরো না তো।'

ফিলাতভ প্রফেসর, নাকি মেয়েটা ব্যঙ্গ করে তাকে প্রফেসর বলছে, ব্যাপারটা যাই হোক না কেন, কথাটা বলে তেমন কোন ঝুঁকি নিয়েছে বলে মনে করছে না রানা। ইসরায়েলীরা প্রফেশন্যাল টাইটেলের ব্যবহার মাত্রা ছাড়িয়ে করে না। উত্তরে মেয়েটা এমন কিছু বলতে পারে যা রানার মূল্যবান তথ্য বলে মনে হবে।

'ভুলে যাচ্ছ কেন, কন্টিনেন্টে রয়েছ তুমি। কন্টিনেন্টে থাকার সময় কন্টিনেন্টালদের রেওয়াজ মেনে চলতে চেষ্টা করো।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয়।' পাইপে আগুন ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা।

'তুমি আপাদমস্তক ইসরায়েলী!'

'প্রত্যেক ইসরায়েলীর তাই কি হওয়া উচিত নয়?'

'দেশপ্রেম তোমার মধ্যে আজ যে একটু বেশি উথলে উঠছে, ব্যাপার কি?' হাসছে মেয়েটা। কিন্তু রানাকে হাসতে না দেখে গম্ভীর হলো সে। 'আজ কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছ তুমি, আন্তন।'

'পিলের কারসাজি। বারবিচুরেট আমার কখনোই সহ্য নয় না। মাথাটা ধরেছে।'

হাতব্যাগ খুলল মেয়েটা। 'আমার কাছে অ্যাসপিরিন আছে।'

ট্রে নিয়ে ফিরে এল ওয়েট্রেস। বোতলের দিকে চোখ রেখে বলল রানা, 'বিয়ারের সাথে অ্যাসপিরিন চলে বলে মনে হয় না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্যাগটা বন্ধ করল মেয়েটা। 'প্লীজ ইয়োরসেলফ।'

বিয়ারের দুটো বোতল, দুটো গ্লাস, এক প্যাকেট সিগারেট, ট্রে থেকে নামিয়ে টেবিলে রাখল ওয়েট্রেস। দ্রুত দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু একটা বলে অপেক্ষা করে থাকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল সে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল রানা। বেছে নিয়ে বের করল একটা একশো ক্রোনারের নোট। দুটো বিয়ার আর এক প্যাকেট সিগারেটের দাম এর বেশি হবে বলে আশঙ্কা করছে না রানা। মাই গড, ভাবছে ও, এদেশী মুদ্রার মান সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই ওর। চোখ বাঁধা অবস্থায় হেঁটে মাইন বিছানো মাঠ পেরোবার মত ঝুঁকি নিতে হচ্ছে ওকে।

ওয়েট্রেস কোন মন্তব্য না করে তার অ্যাপ্রনের ভিতর লুকানো লেদার ব্যাগ থেকে ভাঙতি টাকা আর খুচরো পয়সা বের করে টেবিলে রাখছে দেখে একটা হাঁফ ছাড়ল রানা। নোট আর মুদ্রাগুলো টেবিলে ছড়িয়ে দিল ও, যেন জিনিসের দাম ধরে বাকি টাকার হিসাব ঠিক আছে কিনা পরখ করছে।

'আমার সিগারেটের দাম তোমাকে দিতে হবে না,' বলল মেয়েটা।

মুখ তুলে হাসল রানা। 'বি মাই গেস্ট।'

'নিজে তো খাচ্ছই, পয়সা খরচ করে আমাকেও বিষ খাওয়াচ্ছ,' লাল চুল নেড়ে হাসল। 'এ কেমন মর‍্যালিটি?'

'আমি তো আর মর‍্যাল ফিলোসফার নই,' আশা করল, মিথ্যে বলছে না।

'তা নও,' স্বীকার করল। 'দর্শনের প্রসঙ্গ যখন উঠলই, বলো তো, সাধারণ ভাবে তোমার জীবন দর্শনটা কি? তুমি নাস্তিক? নাকি অজ্ঞেয়বাদী? নাকি মানবতাবাদী? জানতে কৌতূহল হয়।'

ধীরে ধীরে ফিলাতভের চরিত্র ফুটতে শুরু করেছে। প্রশ্নগুলো সাধারণ, তাই দর্শন নিয়ে মেয়েটার সাথে আলোচনা করতে কোন বাধা দেখল না রানা। 'নাস্তিক আমি কখনোই নই, হতেও পারব না,' বলল ও। 'কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই একথা কল্পনা করার চেয়ে জিনিসটার অস্তিত্ব আছে একথা কল্পনা করা আমার কাছে অনেক সহজ বলে মনে হয়। আমি বরং অজ্ঞেয়বাদীদের দলে যোগ দেব, "জানি না" বললেই ল্যাঠা চুকে গেল, এরা দলেও সবচেয়ে ভারী। আরেকটা সুবিধে হলো, অজ্ঞেয়বাদের সাথে মানবতাবাদের কোন বিরোধ নেই।'

নোট আর খুচরো পয়সাগুলো নাড়াচাড়া করছে রানা। এর আগে হোটেলের বারে একটা বিয়ারের দাম দিয়েছে ও। সেই হিসেবে দুটো বিয়ারের জন্যে যা দাম হয় ধরে সিগারেটের দাম বের করার চেষ্টা করছে। মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া গেল। হিসেবটা কতটুকু নিখুঁত, সন্দেহ আছে তবু রানার। হোটেলের বার আর খোলা কাফে, একই বিয়ারের দাম দু'জায়গায় দু'রকম হওয়ারই কথা।

সিগারেট ধরাচ্ছে মেয়েটা। চট্ করে চারদিকটা দেখে নিল রানা একবার। হঠাৎ একটা সন্দেহ জেগেছে। তেল আবিব থেকে নরওয়েতে নিয়ে এসেছে ওকে, রেখেছে দামী হোটেলে, প্রচুর টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করেছে—এসব কাজ যাদেরই হোক, তারা ওকে চোখের আড়ালে রেখেছে এ হতেই পারে না। নিশ্চয়ই ওর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছে। হঠাৎ আরেকটা সন্দেহ জাগল মনে। সামনে বসা এই রক্তকেশী সঙ্গিনীটিই নয় তো? কাছ থেকে নজর রাখার জন্যে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা

আর কি হতে পারে?

পকেট থেকে রুমাল বের করে আবার কাশতে শুরু করল রানা। সঙ্গিনীর কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে না ওঠা পর্যন্ত খক খক্ করে কাশতেই থাকল। তারপর রুমাল নামিয়ে বলল, 'দুঃখিত। অসুস্থ শরীর নিয়ে বাইরে বেরুনো আসলে উচিত হয়নি। বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেয়া দরকার আমার। এ ভাবে হঠাৎ চলে গেলে তুমি আবার কিছু মনে করবে না তো?'

'না-না,' উদ্বিগ্ন মুখে বলল মেয়েটা, 'আন্তন, একজন ডাক্তার…'

'তার কোন দরকার নেই,' বলল রানা। 'রাতে ভাল ঘুম হলে সকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। সর্দি-কাশি এক দিনের বেশি থাকে না আমার, সাধারণত।' চেয়ার ছেড়ে উঠল ও। পাইপ, টোবাকো, ভাঙতি টাকা-পয়সা পকেটে ভরছে। আড়চোখে দেখল মেয়েটাও উঠে দাঁড়াচ্ছে। 'কাছেই তো হোটেল, আমি একাই যেতে পারব, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না।'

একটু অবাক হয়ে তাকাল মেয়েটা রানার দিকে। 'আন্তন, আন্তন, তুমি আমার ওপর রাগ করোনি তো?'

'রাগ করব কেন?'

'তাহলে এড়িয়ে যাচ্ছ কেন আমাকে? দেখা হবার একটু পরই হোটেলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে, আর এখন…'

'ও, এই কথা?' ক্লান্তভাবে হাসল রানা। 'আসলে শরীর এতটা খারাপ ঠিক বুঝতে পারিনি তখন। বিশ্বাস করো, রাগ করিনি।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

চেয়ার সরিয়ে বেরিয়ে আসতে যাবে রানা, বাধা পেল।

'কি যেন ফেলে যাচ্ছ তুমি, আন্তন,' বলল মেয়েটা, ঝুঁকে পড়ে তুলল জিনিসটা। 'আরে, এ যে দেখছি একটা স্পাইরালেন পুতুল!'

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে রানা। নিশ্চয়ই রুমাল বের করার সময় পড়ে গেছে পকেট থেকে ওটা। 'কি বললে?'

ভুরু কুঁচকে উঠেছে মেয়েটার। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে। 'গত হপ্তায় আমরা যখন স্পাইরালেনে যাই, এই পুতুলগুলো দেখে তুমি বিরক্ত হয়েছিলে। মনে নেই তোমার?'

'অবশ্যই মনে আছে,' বলল রানা। 'মাথাটা এমন সাংঘাতিক ধরেছে যে…'

রানার কথায় কান না দিয়ে হাসতে শুরু করল মেয়েটা। 'এই জিনিস তোমার কাছে থাকবে এ আমি আশাই করিনি। কিনতে বলায় তুমি রেগে উঠেছিলে, ভুলিনি কথাটা। কোত্থেকে যোগাড় করেছ?'

সত্যি কথাটাই বলল রানা, 'ভাড়া করা গাড়িতে পড়ে ছিল।'

'আজকাল সবাই ফাঁকি দেয় কাজে,' হাসছে মেয়েটা। 'ভাল ভাবে সাফ-সুতরো করার পর গাড়িগুলো ডেলিভারি দেয়ার নিয়ম।' পুতুলটার দিকে তাকাল সে। 'এটার কোন দরকার আছে তোমার?'

'এমন কুৎসিত জিনিস তোমার কাছে মানায় না,' হাসতে হাসতে হাত বাড়াল

রানা, পুতুলটা মেয়েটার হাত থেকে তুলে নিল। 'যাই এবার, কেমন?'

'গরম পানি দিয়ে স্পঞ্জ করে নিয়ো শরীরটা। কেমন থাকো, সকালে ফোন করে জানিয়ো আমাকে।'

কত নাম্বারে ফোন করব? ফোন করে কাকে চাইব?

'অসুস্থ লোক কখনও খবর দেয় না। তার খবর নিতে হয়।' হাসছে রানা। 'আশা করি এর মধ্যে ডিনার খাবার মত সুস্থতা ফিরে পাব। প্রতিজ্ঞা করছি, এবার আর তোমাকে অপেক্ষায় দাঁড় করিয়ে রাখব না।'

'ঠিক আছে। বিকেলের দিকে ফোন করব আমি।'

'প্রমিজ?' মেয়েটাকে হারাতে চায় না রানা।

'প্রমিজ।'

দড়ির পুতুলটা পকেটে ভরে নিয়ে হাত নাড়ল রানা মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে, ধীর পায়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। পেছন ফিরে না তাকিয়েও অনুভব করতে পারছে, এক জোড়া চোখের দৃষ্টি বিঁধে আছে ওর পিঠে।

সামনের গেট দিয়ে ঢুকল রানা হোটেলে। লবিতে পৌঁছে এতটুকু ইতস্তত করল না, সোজা এগোল পোর্টারের ডেস্কের দিকে। মুখ তুলে রানাকে দেখেই একটু হাসল লোকটা, 'আপনার চাবি, স্যার।' আধ পাক ঘুরে হুক থেকে নামাল গোছাটা।

এক হাত দিয়ে চাবিটা নিচ্ছে রানা। অপর হাত দিয়ে পকেট থেকে পুতুলটা বের করে পোর্টারের মুখের সামনে ধরল, 'বলো তো, কি এটা?'

পোর্টারের মুখে আরও উজ্জ্বল হলো হাসিটা। 'এটা একটা স্পাইরালেন ডল, স্যার।'

'কোত্থেকে এসেছে?'

'স্পাইরালেন থেকে, স্যার—ড্রামেনের ওই জায়গাতেই শুধু এই পুতুল তৈরি করা হয়। এর সম্পর্কে জানতে চান? আমার কাছে একটা প্যাম্পলেট আছে।'

'হ্যাঁ, জানতে চাই।'

শেলফের কাগজপত্র ঘেঁটে একটা প্যাম্পলেট বের করল পোর্টার, রানার দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'আপনি, স্যার নিশ্চয়ই একজন ইঞ্জিনিয়ার।'

ইঞ্জিনিয়ার? আমি, মাসুদ রানা? অসম্ভব নয়, হতেও পারি। ফিলাতভের ব্যাপারটাও তাই, সে-ও ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে। আবার নাও পারে। 'ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর সত্যিই আগ্রহ আছে আমার,' কিছু একটা বলতে হয়, তাই বলা। লিফলেটটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে।

দু'জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ অনুসরণ করছে ওকে পেছন থেকে। এলিভেটরের দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত লবির দুই প্রান্ত থেকে একচুল নড়ল না দু'জন। তারপর পরস্পরের দিকে তাকাল তারা। দু'জনের মুখেই চিন্তার ছায়া। এদের উপস্থিতি কিছুই টের পেল না রানা।

ফিলাতভের কামরায় ঢুকে পুতুল, ম্যাপ আর লিফলেটটা ড্রেসিং টেবিলে রাখল রানা। ক্রাডল থেকে তুলে নিল ফোনের রিসিভার।

'বহু দূরে আমি একটা ফোন করতে চাই—ইসরায়েলে।' পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করল ও।

'নাম্বারটা বলুন, প্লীজ, স্যার।'

'ওখানেই একটু অসুবিধে। আমার কাছে ঠিকানা আছে, কিন্তু ফোন নাম্বার নেই।' এক হাত দিয়ে ওয়ালেট খুলে ফিলাতভের একটা কার্ড বের করল ও।

শুকনো গলায় টেলিফোনিস্ট বলল, 'সেক্ষেত্রে বেশ একটু সময় লাগতে পারে, স্যার।'

'লাগুক। রুমেই আছি আমি।'

'ঠিকানাটা দিন, স্যার।'

স্পষ্টভাবে বলল রানা, হ্যাপি ভিলা, ম্যাডোনা এভিনিউ, কারাকাস, তেল আবিব। তিনবার পুনরাবৃত্তি করল ও, লোকটা যাতে লিখে নিতে ভুল না করে।

'নামটা, স্যার? যাকে ফোন করতে চাইছেন?'

মুখ খুলল রানা, সাথে সাথে বুজেও ফেলল। অকস্মাৎ চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা লাগছে। ফিলাতভের নাম বললে গর্দভ ভাববে লোকটা ওকে—সুস্থ মস্তিষ্কের কোন লোক নিজেকে কখনও ফোন করে না, বিশেষ করে নিজের টেলিফোন নাম্বার নিজেই জানে না স্বীকার করার পর। ঢোক গিলল ও। মৃদু গলায় বলল, 'নামটা জানা নেই।'

রানার কানে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আছাড় খেলো। 'যথাসাধ্য চেষ্টা করব, স্যার।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে একটা চেয়ারে বসল রানা। স্পাইরালেন পুতুলটা সম্পর্কে কি জানার আছে, দেখা যাক। লিফলেটের সামনে একটা হেডিং: ড্রামেন। স্পাইরালেন ডলের একটা আঁকা ছবি ছাপা হয়েছে। নীল কালিতে। চারটে ভাষায় ছাপা হয়েছে লিফলেটটা।

বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'স্পাইরালেন পর্যটকদের জন্যে একটা উৎকৃষ্ট মানের আকর্ষণ, এবং সেই সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় একটুকরো অপরূপ সুন্দর নিদর্শন।' আসল ব্যাপারটা এই রকম: ড্রামেনের কাছে একটা পাহাড়, নাম তার ব্রাগারনেসাসেন। এর পাদদেশে খণ্ড পাথরের একটা বেঢপ স্তূপ এলাকার সৌন্দর্য হানি ঘটাচ্ছিল, তাই সিটি ফাদাররা এর একটা বিহিত করার সিদ্ধান্ত নেন। পাহাড়ের মুখ থেকে পাথরগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে গিয়ে, তার বদলে, পাহাড়ের অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলা হয়। ত্রিশ ফিট চওড়া, পনেরো ফিট উঁচু এবং দীর্ঘ এক মাইল লম্বা একটা সুড়ঙ্গ। কিন্তু সরলরেখার মত সোজা নয়। খানিক দূর এগিয়ে আবার খানিকটা পিছিয়ে এসেছে—এভাবে মোট ছয়বার। ছয়বার আগু-পিছু করতে করতে সুড়ঙ্গটা উঠে গেছে পাঁচশো ফিট উপরে; ব্রাগারনেসাসেনের ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়েছে, ঠিক যেখানটায় এখন স্পাইরাল টোপেন রেস্তোরাঁটাকে দেখা যায়। ওখান থেকে চারদিকের দৃশ্য নাকি স্বর্গীয় মহিমা ছড়ায়।

পুতুলটা তুলে নিল রানা। একখণ্ড দড়িকে ছয়বার বাঁক খাইয়ে তৈরি করা হয়েছে এর শরীরটাও। মুখটা হাসি হাসি করল রানা।

ম্যাপ নাড়াচাড়া করে জানল রানা, অসলো থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে ড্রামেন ছোট্ট একটা শহর। সকাল বেলা ড্রাইভ করতে ভালই লাগবে, রক্তকেশীর ফোন ধরার জন্যে বিকেলের মধ্যে ফিরে আসতেও পারবে। আর কোন সূত্র নেই

যখন, এটা ধরেই এগোনো যাক, ভাবল ও।

অবশিষ্ট বিকেলটা ফিলাতভের এটা সেটা সার্চ করে কাটাল রানা, কিন্তু সূত্র বলা যায় এমন কিছু পেল না। নিচের হোটেল ডাইনিং হলে গিয়ে ডিনার খাওয়ার ইচ্ছাটা বাতিল করে দিল ও। ওর সন্দেহ, রক্ত-মাংসের জ্যান্ত অবিস্ফোরিত বোমায় জায়গাটা গিজগিজ করছে। এক রক্তকেশীকে সামলাতেই হিমশিম খেতে হয়েছে ওকে, আর দরকার নেই। রুম সার্ভিসকে ডেকে ডিনারের অর্ডার দিল ও।

খাওয়া শেষ হয়েছে, এমন সময় টেলিফোনটা এল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রানা। যান্ত্রিক ঘড়ঘড়ানি শুনল কিছুক্ষণ, তারপর বহুদূর থেকে অস্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'ডক্টর ফিলাতভের বাড়ি।'

ডক্টর!

'আমি ডক্টর ফিলাতভের সাথে কথা বলতে চাই।'

'দুঃখিত, স্যার। ডক্টর ফিলাতভ বাড়িতে নেই।'

'কোন ধারণা দিতে পারো, কোথায় তাঁকে পাব?'

'এই মুহূর্তে তিনি দেশের বাইরে আছেন, স্যার।'

'ও। বলতে পারো দেশের বাইরে কোথায়?'

কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। তারপর, 'আমার বিশ্বাস, তিনি স্কানডিনেভিয়া সফর করছেন, স্যার।'

কোন লাভ হচ্ছে না, বুঝতে পারছে রানা। 'কার সাথে কথা বলছি আমি?'

'আমি হেনরি, ডক্টর ফিলাতভের পার্সোন্যাল সার্ভেন্ট। আপনি কোন মেসেজ দিতে চান, স্যার?'

'আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পারছ তুমি, হেনরি?' বুদ্ধি করে জানতে চাইল রানা।

বিরতি। 'লাইনটা গোলমাল করছে।' আবার বিরতি। 'টেলিফোনে কথা বলার সময় কিছু অনুমান করতে আমি অভ্যস্ত নই, স্যার।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'ডক্টর ফিলাতভের সাথে দেখা হলে বলবে মাসুদ রানা ফোন করেছিল, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার সাথে যোগাযোগ করব আমি। বুঝেছ?'

'মাসুদ রানা। হ্যাঁ, মি. রানা।'

'ডক্টর ফিলাতভ কবে নাগাদ ফিরবেন বলে আশা করছ তুমি?'

'আমার জানা নেই, মি. রানা।'

'ঠিক আছে, হেনরি,' থমথম করছে রানার মুখের চেহারা। ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও।

চার

ভাল ঘুম হলো না রাতে। নিটোল ঘুমের গায়ে এখানে সেখানে অনেকগুলো কুৎসিত ফুটো তৈরি করল অনেকগুলো দুঃস্বপ্ন। জেগে উঠে প্রতিবার চেষ্টা করল স্মরণ

করতে, কিন্তু কয়েকটা ভয়াল দৈত্যাকার চেহারার ছায়ামূর্তি ছাড়া স্বপ্নের আর কিছুই মনে করতে পারল না ও। ভোরের দিকে ঘুমটা হলো নিটোল। ঘুম থেকে ওঠার পর শরীরটা ভারী ঠেকছে। মনটা অস্থির, চঞ্চল।

বিছানা থেকে নেমে জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল রানা। বদলে গেছে আবহাওয়া। সীসার মত রঙ হয়েছে আকাশের। ফুটপাথ ভিজে রয়েছে এখনও। বাতাসে গা-জুড়ানো ঠাণ্ডা একটা ভাব। আবার বৃষ্টি আসবে বলে মনে হলো ওর।

বাগানে ছাতার নিচে চেয়ার টেবিলগুলো খালি পড়ে আছে। রাস্তার ওপারে দোকান পাটগুলো খোলা, খোলা আউটডোর কাফেটাও, কিন্তু জনশূন্য।

টেলিফোনে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে বাথরুমে ঢুকল রানা। শাওয়ার থেকে ছুটে বেরিয়ে আসা ঝাঁক ঝাঁক হিম শীতল বর্শা শরীরের সব জড়তা দূর করছে, শক্তি পাচ্ছে রানা, আরাম বোধ করছে।

ফ্লোর ওয়েট্রেস ব্রেকফাস্ট নিয়ে কামরায় যখন ঢুকল, পোশাক পরা শেষ করেছে তখন রানা। হালকা বাদামী ট্রাউজারের উপর সাদা পোলো-নেকড সোয়েটার পরেছে। মাথায় চিরুনি চালাচ্ছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগছে ওর, নিজের ঘাড়ের উপর বসানো ফিলাতভের মুখে চোখ রেখে ঠোঁট গোল করে শিস দিচ্ছে ও।

ব্যাপক ব্রেকফাস্টের আয়োজন। হেরিং মাছ ছুঁলোই না রানা। সেদ্ধ একটা ডিম, রুটি, মার্মালেড আর কফি খেলো। ব্রেকফাস্ট শেষ করে আরেকবার উঁকি মেরে দেখে নিল আবহাওয়াটা, তারপর ওয়ারড্রোব থেকে বেছে নিল একটা জ্যাকেট আর একটা শর্ট টপ কোট। চেন লাগানো একটা ব্যাগে ভরল ম্যাপগুলো। লিফলেটটাও নিল, ওটার পেছনে ড্রামেনের রাস্তা-ঘাট আঁকা আছে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিচে নামল রানা। কোথাও থামল না, সোজা পার্কিং লটে পৌঁছল। ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে হোটেলের বাইরে। ঠিক ন'টা বাজে এখন।

শহর থেকে সহজে বেরোতে পারা গেল না। অপরিচিত পথ, রাস্তার উল্টো দিক দিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে, গাড়িটাও অস্বাভাবিক বড় আর শক্তিশালী। তার উপর অফিস আওয়ারের নিদারুণ ভিড়। তিনবার তীর চিহ্ন আঁকা সাইনবোর্ড দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ায় বাঁক নিয়ে অনেক দূর চলে গিয়ে পরবর্তী বাঁকের কাছে পৌঁছে ভুলটা বুঝতে পারল। প্রথম ভুলটা সবচেয়ে বেশি ভোগাল ওকে। ভুলটা ধরা পড়লেও সাথে সাথে সংশোধনের কোন উপায় দেখল না। সামনে পেছনে একশো মাইল স্পীডে ছুটছে অসংখ্য গাড়ি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া মানে দুর্ঘটনা। রাশ আওয়ারে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করালে পুলিসের খপ্পরে পড়তে হবে। আশপাশেই তাদেরকে মোটরসাইকেলের উপর দেখতে পাচ্ছে রানা। জলপ্রপাতে ছোট্ট একটা কুটোর মত নিজেকে ভেসে যেতে দিল রানা। ইতোমধ্যে পথও হারিয়ে ফেলেছে। পেছন থেকে গাড়ির বিকট তাগাদায় কতবার ডানে-বাঁয়ে মোড় নিয়েছে, খেয়ালই নেই।

বিশ মিনিট পর সঠিক পথটা অনেক কষ্টে খুঁজে বের করল ও। এরপর যখনই ধরতে পেরেছে বাঁক নিতে ভুল হয়েছে, গাড়ির নাক ঘোরাবার সুযোগের অপেক্ষায় না থেকে পিছু হটিয়ে নিয়ে এসেছে গাড়িকে।

ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি রানা, একটা সুইডিশ ভোলভো গাড়ি অনুসরণ করছে

ওকে। ঘেমে অস্থির হয়ে গেছে লুইস পাঞ্জার। ভুল করে আর কাউকে অনুসরণ করছে কিনা সে ব্যাপারে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে ওর মনে, যদিও তার কোন সঙ্গত কারণ নেই। স্পষ্ট দেখেছে সে ডক্টর ফিলাতভকে হোটেল থেকে মার্সিডিজ নিয়ে বেরিয়ে আসতে। ব্যাপারটা কি? নিরীহ গোবেচারা ফিলাতভ আজ এমন তুখোড় ড্রাইভার হয়ে উঠল কিভাবে? অত্যন্ত ভীতু আর সাবধানী লোক, ত্রিশের বেশি স্পীড কখনোই তোলে না। অথচ আজ কিনা কাঁটা একশোর উপর···শুধু কি তাই? এমন সব কৌশল খাটাচ্ছে, চোখ কপালে উঠে গেছে তার।

শেষ পর্যন্ত শহরের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারল রানা। ইতোমধ্যে তুমুল বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। ছয়টা শাখা নিয়ে একটা হাইওয়ে। দু'দিকে তিনটে তিনটে করে উইন্ডস্ক্রীন থেকে পানি সরাবার কাজে ওয়াইপার দুটো সাংঘাতিক ব্যস্ত, কিন্তু ঝম ঝম বৃষ্টির সাথে পেরে উঠছে না বেচারারা। সামনেটা ঝাপসা দেখতে পাচ্ছে রানা। তবে মাথার উপর, খিলানের কপালে ড্রামেন লেখা সাইনবোর্ড দেখে স্বস্তি বোধ করছে এখন।

ওর বাঁ দিকে সাগর, বহুদূর পর্যন্ত ঢুকে পড়া অসলোফর্ডের গভীর বাহু। রাস্তাটা ধনুকের মত বেঁকে গেছে, খানিক পর সাগরকে হারিয়ে ফেলল রানা। বৃষ্টি থেমে গেল, কিন্তু সূর্য এখনও মেঘের আড়ালে। পার্বত্য এলাকার সবটাই সবুজ গাছপালায় ঢাকা। সদ্য বৃষ্টি ধোয়া, নরম ছায়ায় মোড়া পরিবেশটা উপভোগ করছে রানা। হুট্ করে পৌঁছে গেল ড্রামেনে। গাড়ি থামিয়ে লিফলেটের পেছনে ছাপা প্ল্যানটা দেখে নিল ও।

তবু ডানদিকের অপ্রশস্ত বাঁকটা দৃষ্টি এড়িয়ে গেল ওর। বেশ খানিকদূর এগিয়ে যেতে হলো, তারপর প্রথম সুযোগেই পিছু হটিয়ে আনতে শুরু করল গাড়িটাকে। গভীর, গম্ভীর টানেলের মুখটা দূর থেকে দেখতে পেল ও। গাড়ি থামাতে হলো। ঢোকার জন্যে টোল দিতে হলো দুই ক্রোনার।

গিয়ার দিয়ে ধীর গতিতে সামনে এগোল রানা। প্রথম দিকে টানেলটা সমতল এবং সোজা, তারপর উপর দিকে উঠতে শুরু করেছে, বাঁক নিচ্ছে বাঁ দিকে। স্বল্প আবছা আলোর ব্যবস্থা থাকলেও বোতাম টিপে হেডলাইট দুটো জেলে দিল রানা। কর্কশ ভিজে পাথরের গায়ে ঝিলিক দিয়ে উঠল আলোর প্রতিবিম্ব।

উঁচু হয়ে উঠে গেছে ক্রমশ টানেলটা, কিন্তু কোথাও খানাখন্দ নেই, ওঠারও নির্দিষ্ট একটা সাবলীল হার বজায় আছে প্রতি গজে। বাঁকগুলোও বিপজ্জনক কোণ সৃষ্টি করেনি, মস্ত এলাকা নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে টানেলটা। ওয়ান লেখা একটা চিহ্ন পেরিয়ে এল রানা। ধরনটা ধরতে পেরে ঢিলে হয়ে গেছে কাঁধের পেশী। এখন শুধু হুইল ধরে চুপচাপ বসে থাকা, লো গিয়ারে উপর দিকে আপনাআপনি উঠে যাচ্ছে মার্সিডিজ।

তবু মজার একটা অভিজ্ঞতা বটে, একটা পাহাড়ের মাঝখানে রয়েছে ও, উপর দিকে উঠছে। থ্রী লেখা চিহ্নটা পেরোবার সাথে সাথে দুটো হেডলাইট চোখ ধাঁধিয়ে দিল ওর, পাশ কাটিয়ে স্যাঁত করে নেমে গেল নিচের দিকে। এই একটু যা অসুবিধেতে পড়ল, সারা পথে আর কোন ঘটনা নেই।

সিক্স লেখা চিহ্নটা পেরোবার একট পরই টানেল থেকে বেরিয়ে এল রানা।

বেরোবার মুখেই প্রচণ্ড আদর, সূর্য যেন ওত্ পেতে ছিল ওর জন্যে, ঝট করে মেঘের কিনারায় চলে এসে একগাল হেসে অভ্যর্থনা জানাল ওকে। আদরের ঠ্যালায় চোখ বুজে ফেলল রানা।

দু'সেকেন্ড পর চোখ মেলে সামনে রোদ ঝলমলে সমতল মাঠ দেখছে রানা। ওর বাঁ দিকে বিরাট একটা গাড়ি পার্ক করার জায়গা, কিন্তু একটাও গাড়ি নেই সেখানে, ওটার পেছনে কাঠের একটা বাড়ির মস্ত ছাদ, কাঠামোটা ফ্রেঞ্চ ভিলা শ্যালের মত। যথাসম্ভব বাড়িটার কাছে গাড়ি থামাল রানা, নিচে নেমে দরজায় তালা লাগাল।

আর কোন বিল্ডিং নেই, তার মানে এই শ্যালেই স্পাইরালটোপেন রেস্টুরেন্ট। চন্দ্রপৃষ্ঠের মত নির্জন লাগছে জায়গাটাকে। দরজার কাঁচ ভেদ করে দৃষ্টি চলে গেল ভিতরে। আর একটু হলে হেসেই ফেলেছিল। মস্ত দুই ব্যাঙের মত মেঝেতে মুখোমুখি বসে আছে দুটো মেয়ে, দু'জনেই এদিক ওদিক দুলছে। আজব ধরনের কোন নাচ? ভাবছে রানা। হঠাৎ বুঝল, না। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মেঝে মুছছে ওরা। সময়টা এখনও খুব সকাল। কয়েক পা পিছিয়ে এসে প্রবেশপথের বাইরে বিকট একটা স্পাইরালেন পুতুলকে দেখতে পেল ও তাগড়া যোয়ান মানুষের মত বড়, চোখে-মুখে নির্দয় একটা হাসি ফুটে আছে।

নিজের চারদিকে তাকাল ও। একটা সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে পাহাড়ের কিনারার দিকে, শেষ মাথায় নিচু পাথরের একটা পাঁচিল, পাঁচিলের মাথায় মুদ্রা গলিয়ে দেবার ফুটো গায়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা টেলিস্কোপ। সরু একটা পায়ে চলা পথ ধরে খানিকদূর এগোল রানা। উঁকি মেরে তাকাল পাঁচিলের ওপারে। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে ড্রামেন উপত্যকা। ভাঁজ খেয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে মেঘগুলো, দিগন্তরেখার ওপারে হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। অনেক নিচে রোদ লেগে পারদের মত টলমল করছে স্বচ্ছ স্ফটিকের মত নদীর পানি।

খুবই সুন্দর, বিরক্ত হয়ে ভাবছে রানা, কিন্তু এখানে আমি করছিটা কি? কি পাব বলে আশা করছি? ড্রামেন ডলি, কোথায় তুমি?

উত্তরটা হয়তো রেস্তোরাঁয় পাওয়া যাবে। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে পাঁচ মিনিট পার করে দিল ও, তারপর রেস্তোরাঁর দরজার কাছে ফিরে এল। মেয়ে ব্যাঙ দুটোকে কোথাও দেখছে না এখন। ভিতরে ঢুকে টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসল। অস্বাভাবিক লম্বা একটা হলরূম। শেষ মাথা থেকে এগিয়ে আসছে একটা মেয়ে। ছ্যাঁত করে উঠল রানার বুক। অল্প বয়স। উনিশ কি বিশ, চমকে দেবার মত রূপ। শরীরে আগুন জ্বালানিয়া নয়, অদ্ভুত একটা ঠাণ্ডা, কোমল, বিষণ্ন সৌন্দর্য ঘিরে রেখেছে মেয়েটাকে। দরজার কাঁচ ভেদ করে বাইরে চলে গেছে উদাস দৃষ্টি। কার কথা যেন ভাবছে! এমন একটা বৃষ্টি হয়ে গেল, মনের মানুষ কাছে নেই। কাছে এসে তাকাল একবার রানার দিকে। মুখ ফিরিয়ে নিল, আবার চোখ চলে গেছে দরজার বাইরে, বহু দূরে।

ছটফট করে উঠল বুকটা রানার। বুড়ো এই মুখটার বদলে ওর নিজের মুখটা যদি থাকত, নিশ্চয়ই এভাবে চোখ ফেরাতে পারত না মেয়েটা। অন্যদিকে তাকিয়ে অর্ডার নিল সে, চলে গেল। রানা জানে, শত চেষ্টা করেও মেয়েটিকে বোঝাতে

পারবে না ও যে আসলে চেহারাটা ওর একবার দেখেই চোখ ফিরিয়ে নেবার মত ছিল না।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই শিউরে উঠল রানা। ওর এই বুড়ো-হাবড়া নতুন চেহারা—এটা কি স্থায়ী হতে যাচ্ছে? কোন মেয়ের কাছে আর কখনও ঘেঁষতে পারবে না ও?

একটা আক্রোশ অনুভব করছে রানা। টেবিলে পড়ে থাকা হাত দুটো নিজের অজান্তেই শক্ত মুঠো হয়ে গেল। অসহায় একটা রাগে ঝাপসা হয়ে গেল চোখের সামনেটা। নিঃশব্দ পায়ে কখন আবার কাছে চলে এসেছে সেই ঠাণ্ডা কোমল অবয়বধারিণী, ঠক্ করে একটা শব্দ হতে হুঁশ ফিরল রানার, দেখল কফির কাপটা নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছে।

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, সেইসাথে চোখ বুলাচ্ছে লিফলেটে। ও এখন Bragernesasen-এর মাথায় রয়েছে, ড্রামেন্স্মার্কার দরজা বলা হয় জায়গাটাকে। শীতের সময় এটা স্কিয়ারদের স্বর্গ, তাদের চলার পথে ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা আছে। আর গ্রীষ্মের সময় এটা শিকারীদের স্বর্গ, তখন বিশাল এলাকা জোড়া জঙ্গলে প্রাণীবধের মহোৎসব চলে। হয়তো ওখানেই কিছু আছে, ভাবল ও। কফির দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল তখুনি।

আরেকটা গাড়ি পৌঁছেচে, কার পার্কের অপর দিকে দাঁড়িয়ে আছে সেটা। হুইলের পেছনে বসা লোকটা খবরের কাগজ পড়ছে। রেস্তোরাঁর দরজা বন্ধ হবার শব্দে মুখ তুলে তাকাল, রানাকে বেরিয়ে আসতে দেখে আবার পড়ায় মন দিল সে।

গায়ে ভাল করে বসিয়ে নিল রানা টপকোটটা। হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। পাহাড়ের কিনারার দিকে পেছন ফিরে দৃঢ় পায়ে এগোচ্ছে ও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুন্দর একটা বনভূমিতে প্রবেশ করল রানা। চারদিকে তাল গাছের মত লম্বা দেবদারু গাছ। পাতা ঝরা, নিঃস্ব আরেক জাতের গাছ দেখতে পাচ্ছে রানা, দেবদারুগুলোর মতই আকাশ ছোঁয়া, কিন্তু পাতা নেই বলেই বুঝি ঠিক চেনা যাচ্ছে না। কাণ্ডগুলো সাদাটে, বার্চও হতে পারে।

কার পার্ক থেকে খানিকদূর সোজা, তারপর এঁকেবেঁকে চলে এসেছে পায়ে চলা পথটা। ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাল ও। রেস্তোরাঁর উঁচু ছাদটাও এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

পথটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, নিজেকে জিজ্ঞেস করে ডান দিকে এগোবার অনুমতি নিল ও। আরও মিনিট দশেক হাঁটার পর হঠাৎ দাঁড়াল। এখানে ও করছেটা কি? একটা গাড়িতে কদাকার চেহারার একটা পুতুল দেখেই নরওয়ের পাহাড়ী এলাকার জঙ্গলে চলে এল সে?

রক্তকেশী মেয়েটার কথা মনে পড়ছে। তার ধারণা, গাড়িটা এর আগে যে ভাড়া করেছিল পুতুলটা সেই ফেলে রেখে গেছে। উঁহু, তা ঠিক বলে মনে করা যায় না। গাড়িটা একেবারে নতুন। এর আগে কাউকে ভাড়া দেয়া হয়নি। তাছাড়া, পুতুলটা এমন ভঙ্গিতে সীটের উপর রাখা ছিল, যেন ওর দৃষ্টিতে পড়ে।

চিরকুটে ভোরে আসার কথা বলা হয়েছে। ভোরে বলতে কি বোঝাচ্ছে? কত ভোরে? বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো, মনে মনে ডাকছে রানা, বেরিয়ে এসো

আমার ছোট্ট ভ্রামেন পুতুল। তোমার যাদু দণ্ড নেড়ে আমাকে তেল আবিবে পৌঁছে দাও।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথে এগোচ্ছে রানা। তেমাথায় পৌঁছে এবার বাঁ দিকের পথটা ধরল। বৃষ্টির পর তাজা আর পরিষ্কার হয়ে গেছে বাতাস। পাতার কিনারায় ঝুলন্ত পানির ফোঁটাগুলো পড়ো পড়ো, রোদ লেগে স্বচ্ছ মুক্তোর মত দেখাচ্ছে, বাতাসের নাড়া খেয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে রানার মাথায়।

ভিজে ঘাস, ঝোপ-ঝাড়, মাথা উঁচু গাছ ছাড়া কোথাও কিছু দেখছে না রানা। সামনে আরেকটা তেমাথা। থামল। কি করবে ভাবছে। শব্দটা হঠাৎই এল. একটা ডাল ভাঙার আওয়াজ, কিন্তু অস্পষ্ট। দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। কপালে হাত তুলে রোদ ঠেকাল। কোথায়! কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। ঘাড় ফিরিয়ে নেবে, এমন সময় আবার একটা শব্দ। এবার ওর ডান দিক থেকে এল।

চোখের কোণ দিয়ে কিছু একটা দেখল রানা। গাঢ় রঙের কি যেন, দ্রুত সরে গেল গাছের আড়ালে।

তৃতীয় শব্দটা এল পেছন দিক থেকে। চরকির মত আধপাক ঘুরল রানা। প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে আসছে আক্রমণ। এত কাছে চলে এসেছে লোকটা, হকচকিয়ে গেল রানা।

লোকটা বিশাল, মস্ত কাঁধ, ডান হাতটা উপরে তোলা, তাতে লোহার রড কিংবা আর কিছু ধরা, সবেগে নেমে আসছে রানার মাথায়।

হকচকিয়ে গেলেও, গতকাল ও আজকের অভিজ্ঞতায় বেপরোয়া একটা মনোভাব তৈরি হয়েছে রানার মধ্যে। তার উপর, লোকটার চেহারা দেখেই বুঝল দেশ এবং জাতির পরম শত্রু ব্যাটা, আরব। পাল্টা আঘাত করার এই সুযোগের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল ও। পিছিয়ে আসার কথা, কিন্তু, লোকটাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ-বেগে সামনে বাড়ল এক পা। বাঁ হাত তুলে শত্রুর ডান হাতের কব্জি ধরে ফেলল, সেইসাথে প্রচণ্ড একটা ঘুসি চালাল তলপেট লক্ষ্য করে।

হুস্ করে বাতাস বেরিয়ে এল লোকটার নাক মুখ থেকে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, প্রথমে কোমরটা পড়ল মাটিতে, তারপর ঠুকে গেল মাথাটা। ঘুসিটা কিরকম জোরে লেগেছে অনুমান করে একটু অবাক হলো রানা। বমি করছে লোকটা।

সময় নষ্ট করল না রানা। দৌড়তে শুরু করেছে ফিরতি পথ ধরে। কিন্তু আরেক জোড়া পায়ের আওয়াজ। ঠিক পেছনেই। তাকিয়ে দেখে সময় নষ্ট করছে না ও, মাথা নিচু করে ছুটছে। বাঁ চোখের কোণে আরেকটা লোক ধরা পড়ল। লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে ওর আগে আগে, কোনাকুনিভাবে ছুটছে লোকটা। গাছের ফাঁকে মাঝেমধ্যে দেখা যাচ্ছে তাকে। সামনের পথের উপর রানার আগে পৌঁছতে চেষ্টা করছে সে। তার চেষ্টা সফল হতে যাচ্ছে, সহজ হিসাবেই বুঝে নিল রানা।

রুখে যখন দাঁড়াতেই হবে, খামোকা দৌড়ে ক্লান্ত হবার কোন মানে হয় না। দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ঠিক পনেরো গজ সামনে পৌঁছল লোকটা। এও দশাসই চেহারার একজন আরব দুশমন। হাঁপাচ্ছে। পেছনের পায়ের আওয়াজটাও দ্রুত কাছে চলে আসছে।

পরিস্থিতিটা বুঝতে এক সেকেন্ড সময় নিল রানা। দাঁড়িয়ে থাকা মানে ফাঁদে

ধরা দেয়া। কথাটা মনে হতেই ছুটল আবার। সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা তার দিকে রানাকে আবার ছুটে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল। পরমুহূর্তে বাধা দেবার জন্যে তৈরি হলো সে। একটানে বের করল কোমরে গোঁজা ধারাল ছোরাটা, কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে গেল শরীর, মাথা নিচু করে আক্রমণের ভঙ্গিতে ছোরাসহ ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সামনে। রোদ লেগে ঝিকিয়ে উঠল ইস্পাতের ফলা।

তবু সোজা ওর দিকে রানাকে ছুটে আসতে দেখে থতমত খেলো লোকটা, লোকটার একগজের মধ্যে পৌঁছেও দিক বদলাল না রানা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সামনের দিকে ছোরা চালাতে যাচ্ছে লোকটা এইসময় বাঁ-দিক দিয়ে পাশ কেটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল রানা। শেষ মুহূর্তে আক্রমণের ধারাটা সংশোধন করতে যাচ্ছে শত্রু, দেখেই আগে থেকে যা ভেবে রেখেছিল তাই করল ও। শরীরটাকে অদ্ভুতভাবে একটা মোচড় খাইয়ে চোখের পলকে লোকটার ডানদিকে চলে এল রানা, পাশ কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় ছোরাটা বাঁক নিয়ে, অর্ধবৃত্ত রচনা করে ঝিলিক দিয়ে ছুটে এল। গরম একটা ছ্যাঁকা অনুভব করল রানা পাঁজরে। কিন্তু লোকটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে ও, ঝেড়ে দৌড়চ্ছে। মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা শিকড়গুলোকে সাবধানে টপকে যাচ্ছে, এখন পা বেধে না গেলেই শেষ রক্ষা হয়। এক নম্বর শত্রুকে গোনার মধ্যে ধরছে না ও, উঠে দাঁড়াতে তার কম করেও দু'মিনিট লাগবে। বাকি থাকল ছোরাধারী আর পিছু ধাওয়াকারী।

পেছন থেকে চেঁচামেচি ভেসে আসছে, কিন্তু তাকাল না রানা। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সমতল জায়গাটায় পৌঁছল, তীরবেগে সোজা গাড়ির দিকে ছুটছে। দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার ঝুঁকিটা নিল ও, দেখল পার্ক করা গাড়ি থেকে নেমে ওর দিকে ছুটে আসছে সেই লোকটা। খবরের কাগজ পড়াটা তাহলে ভান।

ফুটোয় চাবি ঢোকাচ্ছে রানা। চুল পরিমাণ এদিক ওদিক ঠোকর খেয়ে ফিরে আসছে চাবি, ভিতরে ঢুকছে না। অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এমন হচ্ছে বুঝতে পেরে নিজেকে চোখ রাঙাল রানা। ঢুকল চাবিটা, মোচড় দিতেই ক্লিক করে শব্দ হলো একটা, হেঁচকা টান মেরে দরজাটা খুলেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ড্রাইভিং সীটে। ইগনিশন লকে চাবি ঢোকাচ্ছে এক হাতে, অপর হাত দিয়ে দরজাটা বন্ধ করছে।

দরজা বন্ধ করে চোখ ফেরাতে যাবে, লোকটাকে দেখতে পেল বাইরে। মুঠো পাকানো ঘুসি মারল জানালার কাঁচে, তারপর হাত বাড়াল দরজার হাতলের দিকে। আঁতকে উঠল রানা। দরজাটা ধরতে গিয়ে চাবিটা পড়ে গেল আঙুলের ফাঁক গলে। বাইরে থেকে লোকটা সর্বশক্তি দিয়ে হাতলটা টানছে, কিন্তু টেনে-আটকে রেখেছে রানা, হাতের পেশী ফুলে উঠেছে ওর। একটা হাত সরিয়ে নিয়ে ঝটকা মেরে নামিয়ে দিল ডোর ক্যাচ। নিচু হয়ে মেঝেতে ঠেকাল ডান হাতটা, হাতড়াচ্ছে।

ফুসফুসে কষ্ট হচ্ছে ওর। হাঁপাচ্ছে। পাঁজরের ব্যথাটা হঠাৎ তীব্র হয়ে উঠল। কোথায় পড়েছে চাবিটা? পাঁচটা আঙুল কিলবিল করছে মেঝেতে। নিদারুণ ব্যস্ততার মধ্যেও ঠাণ্ডা একটা যুক্তি ঢুকল ওর মাথায়, এখন ও মোটামুটি নিরাপদ, তালা দেয়া

গাড়ির ভিতর কেউ ঢুকতে পারবে না। আর চাবিটাও পাওয়া যাবে।

শীতল ধাতব স্পর্শ পেল রানার আঙুল। খপ্ করে ধরল, তুলে এনে ইগ্নিশন লকের ফুটোয় ঢোকাল। ঠাণ্ডা যুক্তিটা কর্পূরের মত উবে গেল হঠাৎ: লোকটা এক পা পিছিয়ে গিয়েই পকেট থেকে রিভলভার বের করল দেখে উন্মত্তের মত ক্লাচে পা ঠুকল রানা, ঝটকা মেরে ফার্স্ট গিয়ার দিল, রাস্তার কংক্রিটের সাথে ঘষা খেয়ে পুড়ে গেল টায়ারের রাবার—হুইল ধরার আগেই তীরবেগে ছুটতে শুরু করেছে মার্সিডিজ, মাতালের মত এদিক ওদিক করছে, তারপর সিধে হয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল টানেলের মুখে, ভীতসন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত স্যাঁত্ করে ঢুকে গেল গর্তের ভিতর।

পলকের জন্যে এক ঝলক দিনের আলো দেখতে পেল রানা ভিউমিররে দুটো দরজাই খোলা অপর গাড়িটার, চালকের হাতে বন বন করে ঘুরছে স্টিয়ারিং হুইল, টানেলের দিকে ছুটে আসছে গাড়িটা। ইঁদুরের পিছু ধাওয়া করছে যেন বিড়াল।

প্রথম বাঁকটায় পৌঁছতে দশ সেকেন্ড লাগল রানার। বুঝল, বিপজ্জনক স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে ও। ক্রমশ ঢালু হয়ে প্রতি দশ ফিটে এক ফুট নেমে গেছে টানেলের মেঝে, মোচড়টার ব্যাসার্ধ মাত্র একশো বাইশ ফুট, বাঁক নিয়ে চলে গেছে ডানদিকে, যার ফলে মাঝের রেখার ভিতর দিকে থাকতে হচ্ছে রানাকে। অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে গাড়ি ছুটছে, কেন্দ্রাতিগ শক্তি (centrifugal force) মাঝের রেখার ওপারে টেনে আনতে চাইছে গাড়িটাকে, বিপরীত দিক থেকে কিছু যদি এই মুহূর্তে আসে, মুখোমুখি সংঘর্ষ ঠেকাবার কোন উপায় নেই।

একটু একটু করে পায়ের চাপ কমিয়ে আনল রানা অ্যাকসিলারেটর থেকে। দৃষ্টি সরানো বিপজ্জনক, তবু পলকের জন্য ঝুঁকিটা নিয়ে ভিউমিররে তাকাল। পিছনের গাড়ির চালক নিঃসন্দেহে দুঃসাহসী। নিজের বা বিপরীত দিক থেকে আসতে পারে যে সব গাড়ি সেগুলোর প্রতি তার কোন দরদ নেই। মাঝের রেখা পেরিয়ে ওপারে চলে গেছে সে, ক্রমশ মার্সিডিজের কাছে চলে আসছে।

ইঞ্জিনে আরও ফুয়েল ঢালল রানা, মোচড় দিয়ে ঘোরাল হুইল, ভাবল—সামনের মুখ দিয়ে যদি কোন গাড়ি টানেলে ঢুকে থাকে, সংঘর্ষের পর রক্ত, গুঁড়ো হাড় আর আগুন ছাড়া কিছু চেনা যাবে না।

টানেলের ভিজে দেয়ালগুলো আলোর দীর্ঘস্থায়ী ঝলক যেন, এক জায়গায় সেই আলোর ঝলক একটু বেশি উজ্জ্বল, পলকের জন্যে একটা সংখ্যা দেখতে পেল রানা, 5, তার মানে নিচে পৌঁছতে আরও চারটে সার্কিট পেরোতে হবে। অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল গাড়ির চাকা, থরথর করে কেঁপে উঠল মার্সিডিজ, ধাক্কা খেয়ে বেঁকে গেল নাক। হুইলটাকে ধরে রাখতে পারছে না রানা, সেকেন্ডে কয়েকবার তীব্র ঝটকা মেরে মুঠো থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এক সেকেন্ড পরই পুনরাবৃত্তি হলো ঘটনাটার, ধাতব কান্নাটা পেছন থেকে ভেসে এল, ধাক্কাটা লাগল আবার জোরে। মার্সিডিজকে গুঁতো মারছে পেছন থেকে। আরেকটা তীক্ষ্ণ কান ফাটানো আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা টানেল, ইস্পাতের নখরের আঁচড় লেগে ছিঁড়ে যাচ্ছে ইস্পাতের পাত। হুইল ঘুরিয়ে লাভ হচ্ছে না, ঘুরে যাচ্ছে গাড়ি। টানেলের উপর আড়াআড়ি অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

শুনল এবং অনুভব করল রানা, বিপরীত দিকের দেয়ালে গাড়ির রিয়্যার অফ-

সাইড ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেল। ঠিক এই সময় বুঝতে পারল ও, পিচকারি দিয়ে রক্ত ছুটতে আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাকি। নিচে থেকে ওর দিকে উঠে আসছে একটা গাড়ি, হেডলাইটের চোখ রাঙানি দেখে ভয়ে হিম হয়ে গেল বুকের রক্ত।

হাত আর পা বিদ্যুৎ গতি লাভ করল রানার। হুইল, ক্লাচ আর অ্যাকসিলারেটর নিয়ে পাগলের মত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। চোখের পলকে ঘুরে গেল গাড়ি, ট্যুর বাসটার সামনে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা শিয়াল যেন রাস্তা পেরোচ্ছে। বাসের ড্রাইভারকে এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্যে দেখল রানা, হাঁ হয়ে আছে মুখ, চোখ দুটো বিস্ফারিত। পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

গাড়ির সামনের ফেন্ডারটা টানেলের দেয়ালে ঘষা খেলো, মুষলধারে বৃষ্টির মত একরাশ ফুলকি ছুটল আগুনের, আগেই উল্টো দিকে ঘোরাতে শুরু করেছে হুইলটাকে রানা। আর একটু হলে পাশ ঘেঁষে ধাবমান বাসের পেছনের অংশে সেঁধিয়ে যেত মার্সিডিজের সামনের একটা কোণ। আতঙ্কিত ইঁদুরের মত টানেলের এদিক ওদিক ছুটছে গাড়ি, প্রায় দেড়শো গজ এভাবে এগিয়ে যাবার পর সেটাকে আয়ত্তে আনতে পারল রানা। ভাগ্যিস বাসের পেছনে আর কোন গাড়ি ছিল না, ঢোক গিলে ভাবল রানা।

উজ্জ্বল একটা টানা বিদ্যুতের ঝলকের মত পিছিয়ে গেল লেভেল 2, এক সেকেন্ড পর ভিউমিরর হয়ে আলোর একটা ছোট্ট কণা চোখে পড়ল রানার। ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর। বাসটাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে পেছনের গাড়িটাও, দ্রুত কাছে চলে আসছে আবার।

স্পীড বাড়াল আবার রানা। তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল টায়ারগুলো। গোটা টানেল পোড়া রাবারের উৎকট দুর্গন্ধে ভরাট হয়ে গেছে।

লেভেল ওয়ান।

সামনে একটা উজ্জ্বলতা। আরেকটা গাড়ি আসছে বুঝতে পেরে শক্ত হয়ে গেল পেশীগুলো। কিন্তু টানেল সোজা হতেই ও দেখল সামনে টানেলের মুখ, ভিতরে ঢুকছে দিনের আলো, গাড়ি নয়। অ্যাকসিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াল, টানেল থেকে কামানের গোলার মত বেরিয়ে এল মার্সিডিজ। টোল আদায়কারী দু'হাত শূন্যে তুলে লাফ দিয়ে সরে গেল একপাশে, বাতাসের ঝাপটা খেয়ে দম বন্ধ হয়ে এল তার, গাড়িটা আধ হাত দূর দিয়ে চলে গেছে।

প্রখর রোদ লেগে কুঁচকে উঠেছে চোখ দুটো রানার! পাহাড় থেকে ড্রামেনের মেইন রোডের দিকে টপ স্পীডে নেমে যাচ্ছে গাড়ি।

পাহাড়ের নিচে পৌঁছে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে ব্রেক নামিয়ে রেখে বন বন করে হুইল ঘোরাচ্ছে রানা। বাঁক নিচ্ছে গাড়ি, উল্টে পড়ার অবস্থা এখন, আর্তনাদ করছে টায়ারগুলো, কালো রাবার রেখে যাচ্ছে রাস্তার গায়ে। পরমুহূর্তে ব্রেক প্যাডেলের উপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, সীট ছেড়ে উঠে পড়েছে। অল ক্লিয়ার নীল সিগন্যাল দেখে একদল নিরীহ লোক রাস্তা পেরোচ্ছে। ওদেরকে বাঁচাবার জন্যে শেষ চেষ্টা করে দেখছে ও। গাড়ির পেছনটা উঁচু হয়ে উপর দিকে উঠে গেল খানিকটা, হুইলের সাথে সেঁটে আছে রানার বুক। গাড়ির নাক নিচু হয়ে গেল। কাজ হয়েছে ব্রেক প্যাডেলে দাঁড়িয়ে পড়ায়। ভিড়ের কয়েক ইঞ্চি তফাতে থেমেছে গাড়ি। মৃদু ধাক্কা

লাগল একজন লোকের উরুতে। রাস্তার মাঝখানে রানার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল সে। পুলিস।

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। মুখের চেহারা নির্বিকার। সীটে হেলান দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে পেছন দিকে রাস্তা বরাবর তাকাল রানা। অনুসরণরত গাড়িটাকে ব্রেক কষে আরেক দিকে বাঁক নিতে দেখছে, অন্য রাস্তা ধরে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে ড্রামেন থেকে।

জানালায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ করছে আঙুল ঠুকে পুলিসটা, কাঁচ নামাতেই কানে তপ্ত নরওয়েজিয়ান ভাষায় বিস্ফোরণ শুনতে পেল রানা। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ও, চেঁচিয়ে বলল, 'তোমাদের ভাষা আমি বুঝি না। ইংরেজি বোঝো তুমি?'

মাঝপথে থেমে গেল লোকটা, মুখটা এখনও খোলা। তারপর শক্তভাবে সেটা বন্ধ করে গভীর একটা শ্বাস নিল, ইংরেজিতে বলল, 'এসবের মানে কি? কিভাবে গাড়ি চালাতে হয় জানো না?'

'আর একটু হলে জন্মের মত ভুলিয়ে দিচ্ছিল,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আমার কোন দোষ নেই। পেছনের ওই বখাটে ছোকরাগুলোই দায়ী।'

পিছিয়ে গিয়ে খুব ধীর ভঙ্গিতে গাড়িটাকে পরখ করল পুলিস। ঠোঁট টিপে উপর নিচে সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। ঘুরে গিয়ে পাশের জানালায় টোকা মারল এবার। হাত বাড়িয়ে রানা দরজাটা খুলে দিতেই ভিতরে ঢুকল সে। বলল, 'চালাও!'

POLISI লেখা বিল্ডিংটার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। ইঞ্জিন বন্ধ করতেই ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে নিল লোকটা, সামনের গেট দেখিয়ে হুকুমের সুরে বলল, 'ভিতরে!'

দীর্ঘ অপেক্ষা। একজন জুনিয়র গ্রেড পুলিসম্যানের সকৌতুক দৃষ্টির সামনে নিঃস্ব একটা কামরায় বসে আছে। মনে মনে একটা গল্প তৈরি করছে ও। সত্য প্রকাশ করলে প্রশ্ন উঠবে: ফিলাতভ নামে একজন ইসরায়েলীকে কে এবং কেন ছিনতাই বা খুন করার চেষ্টা করবে? এর পরের প্রশ্নটাই হবে: কে এই ফিলাতভ? এভাবে একের পর এক প্রশ্ন উঠবে, এবং খুব বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না রানা, জানে ও। ফিলাতভ সম্পর্কে এখনও বলতে গেলে কিছুই জানে না ও। অর্থাৎ প্রকৃত সত্যটা আপনাআপনি বেরিয়ে আসবে ওর মুখ থেকে। পুলিস অফিসাররা মোটেও ঘাবড়াবে না। পরিষ্কার বুঝে নেবে, বদ্ধ একটা পাগলের পাল্লায় পড়েছে তারা। শুধু তাই নয় পাগলের মধ্যে খুনখারাবির প্রবণতাও আবিষ্কার করে বসবে তারা।

একঘণ্টা কাটার পর টেলিফোন বাজল। সংক্ষেপে জবাব দিল জুনিয়র গ্রেড। ক্রাডলে রিসিভার রেখে বুড়ো আঙুল বাঁকা করে দরজা দেখাল সে রানাকে। 'চলো!'

একটা অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। ডেস্কের ওধারে একজন সিনিয়র পুলিস অফিসার। একটা কলম তুলে নিয়ে সামনের একটা চেয়ারের দিকে তাক করে ধরল সে। 'বসো!'

বসল রানা। ভাবছে, নরওয়েজিয়ানদের একবারে একটার বেশি শব্দ উচ্চারণ করতে নিষেধ আছে কিনা। ছাপা একটা ফর্মের গায়ে কলমের আগা ঠেকাল অফিসার। 'নাম?'

'ফিলাতভ,' বলল রানা। আনাতোলি পি, ফিলাতভ।'
'জাতীয়তা?'
'ইসরায়েলী।'
হাত বাড়াল অফিসার, রানার বুকের সামনে তালু। 'পাসপোর্ট।'
পকেট থেকে পাসপোর্টটা বের করে তালুর উপর রাখল রানা। উল্টেপাল্টে সেটা দেখল অফিসার। রেখে দিল। গ্র্যানাইট পাথরের মত স্থির দুটো চোখ। তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'ড্রামেনের রাস্তা দিয়ে ঘন্টায় আনুমানিক একশো চল্লিশ কিলোমিটার স্পীডে গাড়ি চালিয়েছ তুমি। কাজটা বেআইনী হয়েছে, তবে এই ভেবে আমরা খুশি যে-কোন দেয়ালের গা থেকে তোমার হাড়গোড় চেঁছে তোলার দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চাপেনি। ব্যাখ্যা করো। কি বলার আছে তোমার?'
'পেছনের গাড়িটা খামোকা ঠাট্টা-মস্করা করছিল আমার সাথে,' নির্বিকারভাবে বলল রানা। দেখল, ভুরু উপরে উঠে গেছে অফিসারের। 'আমার ধারণা বখে যাওয়া টিন এজার ছিল ওরা, জানোই তো, কাউকে ভয় পাওয়ানোতেই যত আনন্দ ওদের। পেছনে কয়েকবার গুঁতো মেরেছে, সেজন্যে স্পীড বাড়াতে হয়েছে আমাকে। এ থেকেই যা কিছু ঘটেছে।'
কটমট করে তাকিয়ে আছে অফিসার। রানা থামতেও চোখের দৃষ্টি বা মুখের কঠিন ভাবে কোন পরিবর্তন ঘটল না।
নিস্তব্ধতাটুকুকে জমাট বাঁধতে দিয়ে চুপ করে থাকল রানাও, তারপর ধীর এবং পরিষ্কার ভাবে বলল, 'এই মুহূর্তে আমি ইসরায়েলী দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করতে চাই।'
চোখ নামিয়ে টাইপ করা একটা ফর্ম দেখল অফিসার। 'তোমার গাড়ির পেছনের অংশের সাথে তোমার গল্পের মিল আছে। অপর গাড়িটাও আমরা পেয়েছি। খালি। গত রাতে অসলো থেকে চুরি করা হয়েছিল ওটা।' চোখ তুলে তাকাল। 'জবানবন্দীর কোথাও কোন রদবদল করতে চাও?'
'না।'
'ঠিক জানো?'
'ঠিক।'
পাসপোর্ট হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল অফিসার। 'এখানে অপেক্ষা করো বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।
একঘন্টা পর ফিরল লোকটা। 'তোমাদের দূতাবাস থেকে একজন অফিসার আসছেন। এর মধ্যে স্টেটমেন্টটা লিখে ফেলো।'
'হুঁ,' একটু চিন্তিতভাবে বলল রানা। 'আমার পাসপোর্টের ব্যাপারটা কি হবে?'
'দূতাবাসের অফিসার ওটার দায়িত্ব নেবেন। তোমার গাড়িটাকে রেখে দেয়া হবে রঙের স্পেকট্রোগ্রাফিক টেস্টের জন্যে। এক গাড়ির রঙ যদি আরেক গাড়িতে পাওয়া যায় তাহলে তোমার জবানবন্দীর সত্যতা প্রমাণিত হবে। যাই হোক, গাড়িটা এই মুহূর্তে তো আর চালানো যাচ্ছে না—দুটো ইন্ডিকেটর লাইটই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ওটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পাঁচশো গজও এগোতে পারবে না, আবার গ্রেফতার হবে পুলিসের হাতে।'

'অফিসার কতক্ষণের মধ্যে আসছেন?'

'বলতে পারি না। যতক্ষণ না আসে, এইখানেই অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে।' অফিস ছেড়ে আবার বেরিয়ে গেল সিনিয়র গ্রেড।

ঠুঁটো জগন্নাথের মত ঝাড়া দু'ঘন্টা চুপচাপ বসে থাকতে হলো রানাকে। খিদের অভিযোগ তুলতে কিছু স্যান্ডউইচ আর কফির সরবরাহ পেল ও। ইতোমধ্যে একবার শুধু সরকারী ডাক্তার এসে দেখে গেছে ওকে, আর কেউ বিরক্ত করেনি। কপালের বাঁ দিকের ক্ষতটা ধুয়ে ড্রেস করে দিয়ে গেছে ডাক্তার। মেঠো পথ দিয়ে ছুটে পালাবার সময় একটা গাছের ডালের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল। আবছা ভাবে মনে আছে কথাটা। ডাক্তার অবশ্য জানাল, আঘাতটা পেয়েছে ও গাড়িতেই। প্রতিবাদ করল না রানা। দেখল, ফিলাতভের মুখের একটা পাশ বেশ গুরুতর রকম চোট খেয়েছে। কেন যেন, মনে মনে সেজন্যে একটু খুশিই হলো ও।

পাঁজরের ক্ষতটা সম্পর্কে একটা কথাও বলল না রানা। ডাক্তার বিদায় হতে দ্রুত সেটা একবার পরীক্ষা করে নিয়েছে। ছোরাটা ক্ষুরের মত ধারাল ছিল, সন্দেহ নেই, টপকোট, জ্যাকেট এবং সোয়েটার ভেদ করে গেছে ইস্পাতের পাত। লম্বা একটা ক্ষত, তবে তেমন গভীর নয়। সাদা সোয়েটারটা রক্তে লাল হয়ে গেছে, কিন্তু ক্ষতটা পরিষ্কার, মাংস কোথাও থেঁতলে যায়নি, রক্ত পড়াও বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু হঠাৎ নড়লেচড়লে ব্যথা লাগে। ঘাঁটাঘাঁটি না করে যেভাবে আছে সে ভাবেই ছেড়ে দিল।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। প্রথমেই লোকটার বলিষ্ঠ গড়নের দিকে চোখ পড়ল রানার। ওর মতই লম্বা। পেটা শরীর। উঁচু চওড়া কাঁধ। মুখটা নিখুঁত, এতটুকু আঁচড় নেই। চোখ দুটো নীল। বেপরোয়া স্বভাবের লোক, দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু রানার সাথে যথেষ্ট ভদ্র আচরণ করল।

'ডক্টর ফিলাতভ—আমি এডমন্ড জুনেস্কি। আপনাকে ছোট্ট এই ঝামেলাটা থেকে উদ্ধার করতে এসেছি। আপনি সুস্থ বোধ করছেন তো?' শেষ প্রশ্নটায় উদ্বেগের সুর।

তিন সেকেন্ড চুপচাপ তাকিয়ে থাকল রানা। দূতাবাসকে ফিলাতভের সুস্থতা সম্পর্কে একটু যেন বেশি উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো ওর। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ও।

এডমন্ড জুনেস্কির পিছু পিছু ঢুকল সিনিয়র গ্রেড পুলিস অফিসার। দু'জন মিলে রানার লিখিত স্টেটমেন্ট দেখল তারা। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল জুনেস্কি। অফিসার একজন কনস্টেবলকে ডেকে স্টেটমেন্টটা টাইপ করতে পাঠাল।

সাত মিনিট পর টাইপ করা স্টেটমেন্টের চারটে কপিতেই সই করল রানা। সাক্ষী হিসেবে সই দিতে হলো জুনেস্কিকে।

'চুকে গেল ব্যাপারটা!' ছোট্ট একটা হাঁফ ছেড়ে পুলিস অফিসারের দিকে তাকাল জুনেস্কি।

'আপাতত,' সিনিয়র গ্রেড গম্ভীর। 'ডক্টর ফিলাতভকে আবার হয়তো দরকার পড়বে আমাদের। আশা করি, ডাকলেই তাঁর সাড়া পাব আমরা।'

'অবশ্যই,' সহজ সুরে বলল জুনেস্কি। উঠে দাঁড়াল। পাশে দাঁড়ানো রানার দিকে তাকাল। 'চলুন, ডক্টর, হোটেলে ফিরে যাওয়া যাক। আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত

হয়ে পড়েছেন।'

জুনেস্কির গাড়ি নিয়ে হোটেলে ফিরছে ওরা। ড্রামেন থেকে বেরিয়ে এসেছে গাড়ি। জুনেস্কি চালাচ্ছে। একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে রানা। ও যে 'ডক্টর' তা জুনেস্কি জানল কিভাবে? পাসপোর্টে তো শুধু 'মিস্টার' লেখা আছে। নড়েচড়ে বসল রানা। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনে তাকাল। বলল, 'হোটেলেই যদি যাচ্ছি আমরা, আমার পাসপোর্টটা ফেরত দাও আমাকে। ওটা সাথে না থাকলে অস্বস্তি বোধ করি।'

'আপনি হোটেলে যাচ্ছেন না, ডক্টর ফিলাতভ,' বলল জুনেস্কি। 'পুলিসকে সব কথা জানাতে নেই, তাই জানাইনি। আপনি দূতাবাসে যাচ্ছেন। লন্ডন থেকে একটু আগেই ফিরে এসেছেন মি. কার্ল পপকিন। আপনার সাথে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।' মৃদু হাসল সে। 'ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন। এতক্ষণে পায়চারি শুরু করে দিয়েছেন, বাজি ধরে বলতে পারি।'

রহস্য গভীর হচ্ছে, অনুভব করল রানা। মি. কার্ল পপকিনের নামটা জুনেস্কি এমন ভাবে উচ্চারণ করল যেন এই নামের সাথে কতদিনেরই না পরিচয় ওদের! কার্ল পপকিন, কে হে তুমি বাপু?

'পপকিন!' সবজান্তার ভঙ্গিতে মৃদু শব্দে নামটা উচ্চারণ করল রানা। আশা, লোকটা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য খালাস করবে জুনেস্কি। কিন্তু না, টোপটা গিলল না সে। বলল, 'আপনার স্টেটমেন্টে সবটুকু ঘটনা নেই, তাই না, ডক্টর ফিলাতভ? একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছে, স্পাইরেলটোপেনের ওয়েট্রেস সে—কারও সাথে একটু মারামারির মত একটা কিছু ঘটেছে ওখানে। পুলিসও সন্দেহ করেছে, এর মধ্যে গোলমাল আছে কোথাও।'

রানা কথা বলছে না।

আড়চোখে ওর দিকে তাকাল জুনেস্কি। হাসল। 'কিছু মনে করবেন না। পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠিক কাজই করেছেন সব কথা ওদেরকে না জানিয়ে। পুলিসকে কখনও পিস্তল-রিভলভারের কথা বলতে নেই, বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়ে। তবে, ডক্টর, একটা কথা না বলে পারছি না—এ ধরনের একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া মোটেই উচিত হয়নি। মি. পপকিন সাংঘাতিক খেপে আছেন।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল একটা সে। 'আপনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁকে আমি দোষ দিতে পারি না।'

যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল, বুঝতে পারছে রানা। সীটের পেছনে হেলান দিয়ে শরীরটাকে এলিয়ে দিল ও। 'আমি ক্লান্ত।'

'হ্যাঁ,' বলল জুনেস্কি। 'ক্লান্ত তো হবারই কথা!'

পাঁচ

ছোট্ট একটা সিটিং রুমে রানাকে বসিয়ে রেখে রিপোর্ট করতে বেরিয়ে গেল এডমন্ড জুনেস্কি। পনেরো মিনিট পর ফিরে এসে বলল, 'আমার সাথে আসুন, ডক্টর

ফিলাতভ।'

কার্পেটে মোড়া লম্বা একটা করিডরে বেরোল ওরা। শেষ প্রান্ত পর্যন্ত জুনেস্কিকে অনুসরণ করল রানা। মেহগনি কাঠের পালিশ করা একটা দরজার সামনে দাঁড়াল জুনেস্কি, মৃদু চাপ দিয়ে কবাট দুটো খুলল। ভারী পর্দা ঝুলছে। 'ভয়ের কিছু নেই, যান। জানেনই তো মি. পপকিন কেমন মানুষ।'

ডেস্কের পেছনে যে লোকটা বসে আছে তাকে চারকোনা বলা ছাড়া তার চেহারার কোন বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। বিশাল শরীর। চৌকো মাথা। সাদা চুল, গোল করে ছাঁটা। বুকটা অসম্ভব চওড়া, তেমনি দুই কাঁধ। মাংসল হাতে এক একটা আঙুল এক একটা সাগর কলার মত। 'আসুন, ডক্টর ফিলাতভ,' জুনেস্কির দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে, জুনেস্কি, মাই বয়, নিজের কাজে যাও।'

বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল জুনেস্কি।

'বসুন, ডক্টর,' কার্ল পপকিন বলল। গলার সুরে আমন্ত্রণ, হুকুম নয়।

নিঃশব্দে ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বসল রানা। চুপ করে আছে। এক এক করে অনেকগুলো মুহূর্ত পেরিয়ে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণ করছে ওকে পপকিন।

আরও কয়েক মুহূর্ত পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল পপকিন। 'ডক্টর ফিলাতভ, আপনাকে অনুরোধ করা হয়েছিল হোটেল ছেড়ে দূরে কোথাও যাবেন না, যদি বা যান, সেন্ট্রাল অসলোর বাইরে যেন ভুলেও পা না দেন। বলা হয়েছিল, যদি দূরে কোথাও যেতে চান, আগে থাকতে আমাদেরকে খবর দেবেন, যাতে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারি।'

রানা চুপ।

গলা চড়ে গেল পপকিনের, 'হয়তো অনুরোধ করা উচিত হয়নি, হয়তো নির্দেশ দেয়া উচিত ছিল আপনাকে,' পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, রাগে ফেটে পড়া থেকে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে লোকটা। কণ্ঠস্বর নিচে নামিয়ে আনল আবার সে। 'আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এ খবর পেয়ে বাকি সব কাজ ফেলে সাত তাড়াতাড়ি চলে এলাম আমি। এসে কি শুনলাম? শুনলাম, একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে গিয়ে কি না কি ঘটিয়েছেন। কেন, কি কারণে, তা একমাত্র আপনিই জানেন।'

কথার মাঝখানে বাধাকে প্রতিহত করার জন্যে একটা হাত তুলল পপকিন। কিছু মনে করল না রানা। কিছু বলার নেইও ওর, কিছু বলতে যাচ্ছিলও না।

'বুঝলাম,' বলল পপকিন। 'বুদ্ধি করে স্থানীয় পুলিসকে যা বলেছেন তা ভালই হয়েছে। গল্পটা তারা হয়তো বিশ্বাস করবে,' হাত দুটো ডেস্কের উপর বিছিয়ে দিল সে। 'এখন বলুন, আসলে কি ঘটেছিল?'

'জঙ্গলের ভিতরে হাঁটছিলাম,' বলল রানা। 'হঠাৎ একজন লোক আমাকে আক্রমণ করল।'

'বর্ণনা?'

'লম্বা। চওড়া। গড়নটা আপনার কাছাকাছি, তবে যুবক। কালো চুল। নাকটা ভাঙা। হাতে কিছু একটা ছিল—সেটা দিয়ে ঘা মারতে যাচ্ছিল আমার চাঁদিতে। লোহার রড হতে পারে। ভারি নিষ্ঠুর লোক, জাত দুশমনরা কেমন হয় তা তো

আপনি জানেনই।'

'জাত দুশমন? মানে?'

'আমি আরবদের কথা বলছি। ওই শালারাই তো আমাদের জন্মশত্রু।'

পাঁচ সেকেন্ড কথা সরল না পপকিনের মুখে। অদ্ভুত এক বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে আছে সে রানার দিকে। ডক্টর.ফিলাতভকে এমন আরব বিদ্বেষী ভাবাবেগে ভুগতে দেখেনি সে এর আগে।

'যাই হোক। তারপর? কি করলেন আপনি?'

'শুইয়ে দিলাম,' সহজ গলায় বলল রানা।

'শুইয়ে দিলেন!' ভুরু কুঁচকে উঠল পপকিনের। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে বাধছে তার। 'কি বলছেন আপনি, ডক্টর ফিলাতভ। কিভাবে শুইয়ে দিলেন তাকে আপনি?'

'কিভাবে আবার, ঘুসি মেরে,' রানা শান্ত। 'আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, এক সময় আমি বক্সিং প্র্যাকটিস করেছি।'

'বক্সিং প্র্যাকটিস করেছেন? বলেন কি!' চোখ কপালে উঠে গেল পপকিনের। কিন্তু সময় নষ্ট না করে দ্রুত জানতে চাইল, 'তারপর? তারপর কি ঘটল?'

'পেছন দিক থেকে আরেকজন লোক আসছিল, তাই দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করলাম।'

'বুদ্ধিমান—কোন কোন সময়, অন্তত। এরপর?'

'আরেক লোক আমাকে বাধা দিল সামনে থেকে।'

'চেহারার বর্ণনা দিন।'

'এও দুশমন। একটু বেঁটে। ছুঁচোর মত মুখ। লম্বা, খাড়া নাক। জীনস আর ব্লু জার্সি পরা। এই লোকের হাতে একটা ছোরা ছিল।'

'ছোরা? সত্যি নাকি?' মৃদু ব্যঙ্গের সুরে বলল পপকিন, 'শোনা যাক, এ ব্যাপারটা কিভাবে আপনি সামলালেন?'

'বলছি। পেছন থেকে আরেকজন আসছিল কিনা, তাই চিন্তা করার বেশি সময় পাইনি, সামনের ছোরাধারী লোকটার দিকে এগিয়ে গেলাম, এবং…' হেসে ফেলল রানা দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে যেতে।

'এবং?'

'এবং ডামিটা বিক্রি করলাম তার কাছে, শেষ মুহূর্তে।'

'কি? কি করলেন?'

'আই সোল্ড হিম দ্য ডামি। রাগবী খেলার একটা কৌশল, অর্থ হলো…'

'থাক। অর্থটা আমি জানি,' দ্রুত বলল পপকিন। 'আপনি সম্ভবত এক সময় ভাল একজন রাগবী খেলোয়াড়ও ছিলেন, তাই কি?'

'হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন।' গলার সুরে খুশি খুশি ভাব এনে বলল রানা।

মাথা নিচু করে কপালে হাত রাখল কার্ল পপকিন যাতে মুখটা আড়াল হয়। প্রচণ্ড আবেগ দমন করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। 'তারপর কি ঘটল?' বেসুরো, বেসামাল শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

'এর মধ্যে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছি আমি—কিন্তু ওখানে আরেকজন লোক

ছিল।'

'আরও একজন?' ক্লান্ত সুরে বলল পপকিন। 'বর্ণনা?'

'এ লোকটা আরব নয়। নেড়ে কিনা তাও ঠিক ধরতে পারিনি...'

'নেড়ে?'

'মানে, মুসলমান।'

'কোন্ অভিধানে পাব শব্দটা?'

'পাবেন না। লোকটার বর্ণনা দেয়া কঠিন। সম্ভবত খয়েরী রঙের একটা স্যুট পরে ছিল। তার কাছে রিভলভার ছিল একটা।'

'বুলেট ছিল না ওটায়, তাই গুলি ছুঁড়তে পারেনি, তাই না?' ব্যঙ্গের সুরে বলল পপকিন। গলা কাঁপছে তার। 'তা কি করলেন এবার?'

'গাড়িতে উঠে পড়ার পর রিভলভারটা দেখতে পাই, তাই তেমন কিছু করার সুযোগ পাইনি, শুধু তাড়াহুড়ো করে গাড়ি চালিয়ে...'

'ঘণ্টায় একশো চল্লিশ কিলোমিটার—একে আপনি স্রেফ তাড়াহুড়ো করে গাড়ি চালানো বলেন? এক্সপ্রেস ট্রেনের মত ড্রামেনের ভিতর দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে এসে একজন পুলিসের পাছায় গুঁতো মেরেছেন, কিভাবে বর্ণনা করবেন এটাকে?'

'আপনার বর্ণনাই চলবে—ঠিক তাই ঘটেছিল,' মৃদু স্বরে বলল রানা।

'ঠিক তাই ঘটেছিল?' পপকিন ভেঙচাল কিনা ঠিক ধরতে পারল না রানা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে। তারপর মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'যা ঘটেছে বলে দাবি করছেন, শুনলাম। তার কতটুকু বিশ্বাস করব নিজেই বুঝতে পারছি না। যাই হোক, এবার আমি জানতে চাই, ড্রামেনে আপনি কি উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, এবং অসলো ত্যাগ করার সময় অনুসরণকারীদের খসিয়ে দেয়ার জন্যে অত খাটাখাটনির পেছনে আপনার কি উদ্দেশ্য ছিল?'

'অনুসরণকারীদের খসিয়ে দিয়েছি?' ব্যাপারটা বুঝলই না রানা। 'কি বলছেন? আমি জানতেই পারিনি কেউ আমাকে অনুসরণ করছে।'

'এখন আপনি জানেন। আপনার নিরাপত্তার স্বার্থেই ওরা অনুসরণ করেছিল আপনাকে। কিন্তু আমার লোকদের বক্তব্য হলো, তাদের জীবনে তারা কখনও এমন নিপুণ কায়দায় কাউকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। সম্ভাব্য সবরকম কৌশল খাটিয়েছেন আপনি। দু'বার প্রায় সফল হয়েছিলেন, তৃতীয় বার পুরোপুরি সফল হন।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না!' বলল রানা। 'দু'একবার পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। ব্যস এইটুকু, এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

গভীর একটা শ্বাস নিয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকাল কার্ল পপকিন। 'পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন!' ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। 'ডক্টর ফিলাতভ, বলতে পারেন, তেল আবিবের চেয়ে অসলোকে অনেক ভালভাবে চেনা সত্ত্বেও কেন আপনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন?'

দ্রুত উত্তরটা দিল রানা। ঠিক এই ধরনের কোন প্রশ্নের জন্যেই যেন এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল ও।

'কারণটা সম্ভবত এই যে আমি হয়তো ডক্টর ফিলাতভ নই।'

আঁতকে উঠল কার্ল পপকিন, 'কি বললেন?'

ছয়

আগাগোড়া সবটা বলল রানা।

যখন শেষ হলো, কার্ল পপকিনের চৌকোনা মুখ তখন ঝুলে লম্বা হয়ে গেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রানার প্রতিটি বক্তব্য গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে সে। হাতের চুরুটে একবারও টান না দিয়ে নিভে যেতে দিয়েছে এবং কোন মন্তব্য করা থেকে বহু কষ্টে নিজেকে বিরত রেখেছে। রানার কথা শেষ হতে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলল, ডায়াল করে বলল, 'জুনেস্কি? এক মিনিটের মধ্যে স্টকটনকে এখানে আসতে বলো।'

চেয়ার ছেড়ে উঠল দুর্ধর্ষ স্পাই সংস্থা জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনালের স্ক্যানডিনেভিয়ান ইন-চার্জ ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) কার্ল পপকিন। ডেস্ক ঘুরে রানার পাশে দাঁড়াল, ওর কাঁধে মৃদু চাপড় মারল দু'বার। 'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন জরুরী একটা কাজ সেরে আবার আমি আসছি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল দরজার দিকে। সামনাসামনি পড়ে গেল একজনের সাথে, এইমাত্র ঢুকেছে লোকটা। 'এই যে, উইলিয়াম,' হাসল পপকিন, কিন্তু তা পলকের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মুখ থেকে। চাপা স্বরে কিছু বলল সে উইলিয়াম স্টকটনকে। তারপর বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

করিডরে থামল পপকিন। পকেট হাতড়ে চুরুটের প্যাকেট বের করল। ধরাবার সময় লক্ষ করল দুটো হাতই কাঁপছে তার।

নেতিবাচক ভঙ্গিতে আপন মনে মাথা নাড়ল। তারপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল একটা দরজার সামনে। নক করে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না, কবাট খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত বসকে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল এডমন্ড জুনেস্কি। 'স্যার!'

মাথা নিচু করে এগোল পপকিন, জুনেস্কির কথা যেন শুনতেই পায়নি। পেছনে ধোঁয়ার মেঘ ছাড়তে ছাড়তে সোজা এগিয়ে এসে টেবিলের কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসল। 'আমাদের ফিলাতভ কমপ্লিটলি পাগল হয়ে গেছে, জুনেস্কি। অতিরিক্ত প্রতিভাবানদের নিয়ে এই জন্যে আমি কাজ করতে পছন্দ করি না। পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনা ওদের সবচেয়ে বেশি।'

'ডক্টর ফিলাতভ? পাগল?'

'হ্যাঁ, ডক্টর ফিলাতভ, পাগল,' প্রায় ভেঙচে উঠল পপকিন। 'শুধু পাগল হয়নি, আমাকেও পাগল করার ব্যবস্থা করেছে! কি জবাব দেব এখন আমি হেডকোয়ার্টারকে? দু'বছর পর রিটায়ার করতে যাচ্ছিলাম, সব চুলোয় যেতে বসেছে। গায়ের চামড়াটা বাঁচবে কিনা···যা সন্দেহ করছি তা যদি সত্যি হয়,

জুনেস্কি, আই হ্যাভ টু কমিট সুইসাইড। অযোগ্যতার শাস্তি, সে যে কি ভয়ঙ্কর—তার চেয়ে আত্মহত্যা করা…'

'স্যার, স্যার, আপনি শান্ত হোন,' ব্যাকুল কণ্ঠে বলল জুনেস্কি। 'কি হয়েছে…

'তবে শোনো।' পপকিন বলতে শুরু করল।

সব কথা শেষ করে রাগে কাঁপতে লাগল পপকিন। 'রহস্যময় আক্রমণকারীদের কথা অবিশ্বাস্য। তবে, একথা ঠিক, স্পাইরালেনের মাথায় এমন কিছু ঘটেছে যার ফলে ফিলাতভ নিজেকে চিনতে পারছে না। ওর মানসিক স্থিতি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে একজন চিকিৎসক দরকার আমাদের।' দেয়ালের দিকে তর্জনী তাক করল সে। 'ওখানে যে রয়েছে সে মানুষ নয়, জুনেস্কি। ওর কথা শোনার সময় আমি কেঁপেছি, আমার রোম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল!'

'যা বলছে সব সত্যি, এমন হবার কোন সম্ভাবনা নেই, তাই না?' ধীর ভঙ্গিতে জানতে চাইল জুনেস্কি।

'নেই। কোন সম্ভাবনা নেই। তেল আবিবে সর্বশেষ ফাইন্যাল ব্রিফিংয়ের সময় ফিলাতভ আমার সামনে বসে ছিল। পরপর দু'দিন। না, জুনেস্কি, কোন সন্দেহ নেই—এ লোক ফিলাতভ। আমি যেমন কার্ল পপকিন, ও তেমনি আনাতোলি পপোভিচ ফিলাতভ।'

'একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে,' জুনেস্কি বলল, 'ড্রামেনের পুলিস স্টেশনে ওর সঙ্গে যতক্ষণ ছিলাম, নরওয়েজিয়ান ভাষায় একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। অথচ, ভাষাটা ও জানে।'

'শুধু জানে না, খৈ ফোটাতে পারে।'

'অথচ, পুলিসকে প্রথম কথাটাই ও বলেছে, নরওয়েজিয়ান ভাষা জানা নেই ওর।'

'ফর গডস সেক,' বলল পপকিন। 'লোকটার পুরো ইতিহাস তুমিও জানো। ফিনল্যান্ডে জন্ম, সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত ওখানেই ছিল, তারপর অসলোতে বসবাস করতে আসে। চব্বিশ বছর বয়সে তেল আবিবে চলে যায়, তারপর থেকে ওখানেই ছিল। তার মানে বাইশ বছর। জীবনে কখনও রাগবী খেলা তো দূরের কথা, রাগবী বল চোখেও দেখেনি। কিভাবে মুঠো পাকাতে হয় তাই জানে না, বক্সিং প্র্যাকটিসের তো প্রশ্নই ওঠে না। ওর ডোশিয়ারে পরিষ্কার লেখা আছে, সাংঘাতিক ভীতু লোক, কেউ চোখ রাঙালে থরথর করে কাঁপতে শুরু করে দেয়।'

'বক্সিং, রাগবী এবং মারপিট সম্পর্কে যা বলার তা যদি সত্যি হয়, তাহলে এ লোক ফিলাতভ নয়,' চিন্তা করার জন্যে বিরতি নিল জুনেস্কি, তারপর বলল, 'স্পাইরালটোপেনের প্রত্যক্ষদর্শী…একজন লোককে সে মার্সিডিজের পাশে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে।'

'আতঙ্কে অস্থির একজন ওয়েট্রেস, কি দেখতে কি দেখেছে,' বিরক্তির সাথে বলল পপকিন। 'আচ্ছা, থামো এক মিনিট—ফিলাতভকে ব্যাপারটা বলেছ নাকি তুমি?'

'বলেছি, স্যার।'

'মিলে যাচ্ছে,' বলল পপকিন। 'ফিলাতভ পুলিসকে যা বলেছে তা বর্ণে বর্ণে

সত্যি হলে আমি আশ্চর্য হব না। একদল বখাটে ছোকরা ভয় পাওয়াবার চেষ্টা করেছিল।'

'কিন্তু রিভলভারটা?'

'রিভলভারের কথা তোমার কাছ থেকে জেনেছে। জেনেই নিজের গল্পের সাথে নিপুণভাবে বুনে নিয়েছে, তার সাথে ফোড়ন দিয়েছে আরও কিছু, যেমন ছোরা, লোহার রড। আসলে কি জানো, প্রকৃতিগত ভাবে অসহায় আর দুর্বলচেতা লোক তো, তাই নিজের যা হতে পারা উচিত বলে কল্পনা করেছে তাই সত্য ঘটনা হিসেবে চালাবার চেষ্টা করছে। এমন হয়।'

জুনেস্কি যুক্তিটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু প্রসঙ্গটা নিয়ে বসের সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হবারও ইচ্ছা হলো না তার। 'ফিলাতভ নয়, বলছে। কে তবে ও? কি নাম বলছে নিজের?'

'মাসুদ রানা। বলছে, বাংলাদেশে, তদানীন্তন ব্রিটিশ উপমহাদেশের পূর্ববঙ্গে জন্ম। জন্মসূত্রে বাঙালী ইহুদি। কিন্তু বর্তমানে ইসরায়েলী সিটিজেন।'

'ঠিকানা?'

'জাফার একটা ফ্ল্যাট। রাস্তার নাম মনে নেই, নাম্বার মনে নেই।' টেবিলে ঘুসি মারল পপকিন। 'যাই বলো, প্রাণ বাজি ধরে বলতে পারি ও ফিলাতভ, ফিলাতভ, ফিলাতভ। আর কেউ হতে পারে না।' হঠাৎ কৌতূহলী দেখাল তাকে। 'মিস জুলি,' বলল সে, 'ফিলাতভের সাথে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা তার। তার কিছু বক্তব্য পেয়েছ?'

'গতরাতের রিপোর্টে জানিয়েছে সকালে অসুস্থতার অজুহাতে তার সাথে দেখা করেনি ফিলাতভ। সারাটা সকাল সে নাকি বিছানায় ছিল।'

'আসলে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি জুলির?'

'নগণ্য। ঠাণ্ডা লেগেছে, আর সিগারেট ছেড়ে টোবাকো পাইপ ধরেছে।'

'কালকের আলোচ্য বিষয় কি ছিল ওদের?'

'নৈতিক দর্শন।'

'ফিলাতভের সাথে মিলে যাচ্ছে,' পপকিন হাত ঘষছে গালে। 'বুঝুক আর নাই বুঝুক, দর্শন নিয়ে কথা বলার সুযোগ পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। নাহ্, এ ফিলাতভ না হয়েই যায় না। মেরিটোরিয়াস নিরীহ টাইপের মানুষ—সেজন্যেই এই অপারেশনে তাকে নিলে উটকো কোন গোলমাল দেখা দেবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু…আচ্ছা, তুমি কি মনে করো চারজন ছোরা আর রিভলভারধারী লোকের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতে পারবে ফিলাতভ? এখানেই খটকা লাগছে। ওর ডোশিয়ার বলছে কারও গায়ে আঙুলের টোকা মারতেও অক্ষম এই লোক।'

জুনেস্কি চিন্তিত। 'অপারেশনের কি অবস্থা হবে এখন?'

'ফিলাতভ যদি সত্যি পাগল হয়ে গিয়ে থাকে,' রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল পপকিন। 'অপারেশন চুলোয় গেছে। আমিও। ফিলাতভকে বাদ দিয়ে অপারেশনের

কথা ভাবা যায় না। জাহান্নামে যাক অপারেশন। আমি নিজের কথা ভাবছি। কি জবাব দেব হেডকোয়ার্টারকে?'

'এখুনি একবার...'

'পাগল হয়েছ!' আঁতকে উঠল পপকিন। 'ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নিই আগে। হেডকোয়ার্টারকে এই মুহূর্তে কিছুই আমি জানাচ্ছি না। যখন পরিষ্কার বুঝব নিজের কপালে গুলি করা ছাড়া উপায় নেই কেবল তখনই জানাব ওদেরকে। চলো, নিজের চোখে একবার দেখো পাগলটাকে!'

করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। নিজের অফিসের সামনে থামল পপকিন, জুনেস্কির একটা হাত ধরে বাধা দিল তাকে। 'সাবধান। গোটা পরিস্থিতিটা সাংঘাতিক নাজুক, যে-কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে!'

ভিতরে ঢুকে ওরা দেখল ফিলাতভ তখনও তার চেয়ারে বসে আছে। চুপচাপ। তার বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে বসে আছে উইলিয়াম স্টকটন, কিন্তু তার দিকে কোন খেয়ালই নেই ফিলাতভের।

মুখ তুলে তাকাল স্টকটন। কাঁধ ঝাঁকাল।

সামনে এগিয়ে গেল পপকিন। 'ডক্টর ফিলাতভ, আমি দুঃখিত...'

'আমার নাম মাসুদ রানা,' বলল রানা, 'আমি বাংলাদেশী ইহুদী। বর্তমানে ইসরায়েলের নাগরিক। এসব তো আগেই আপনাকে আমি বলেছি।'

পনেরো সেকেন্ড কথা বলল না পপকিন। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল সে। 'ঠিক আছে, আপনি যা বলেন। আমি মনে করি আপনাকে দেখতে একজন ডাক্তারকে সুযোগ দেয়া উচিত। সে ব্যবস্থাও আমি করেছি।'

'ভেরি গুড,' বলল রানা। 'আরও আগে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। ক্ষতটা প্রচণ্ড ব্যথা করছে।'

'ক্ষত?'

ট্রাউজারের নিচে থেকে টেনে বের করল রানা সোয়েটারটা। 'এই যে, ছোরার আঘাতটা। দেখুন না।'

পপকিন এবং জুনেস্কি একযোগে ঝুঁকে পড়ল। সিকি ইঞ্চি গভীর একটা কাটা দাগ। ষোলোটা সেলাই লাগবে চামড়া জোড়া দিতে, অনুমান করল পপকিন।

একযোগে মাথা তুলল ওরা। অবাক বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

জট পাকিয়ে গেছে সব।

সাত

জুনেস্কির অফিসে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে পপকিন। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে জানালার সামনে দাঁড়াল। জানালার বাইরে হাত বের করে দিয়ে নিঙড়ে ঘামের কিছু ফোঁটা ঝরাল রুমালটা থেকে। তারপর আবার শুরু করল পায়চারি।

'বিশ্বাস করি না।' কর্কশ শোনাচ্ছে তার কণ্ঠস্বর। কার উপর যেন আক্রোশে ফুঁসছে। 'এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।'

বিশাল শরীরটা চরকির মত আধপাক ঘুরে গেল, মুখোমুখি হলো সে জুনেস্কির। 'ধরো, আজ রাতে বিছানায় গেলে তুমি, এইখানে এই অসলোয়, ঘুম ভাঙল তোমার আগামীকাল, ধরো, নিউ ইয়র্কের একটা হোটেলে, আয়নায় দেখলে মুখটা অন্য কারও, তোমার নয়। কি হবে তোমার মনের অবস্থা?' টেবিলের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ল জুনেস্কির দিকে।

কপালে চিন্তার রেখা জুনেস্কির। 'কল্পনা করতে পারি না, ভয় লাগছে। সন্দেহ নেই, পাগল হয়ে যাব,' বলল জুনেস্কি।

'কিন্তু লোকটা পাগল হয়নি। সমস্ত দিক ভেবে দেখো, বলতে গেলে পুরোপুরি সুস্থ এবং শান্ত দেখাচ্ছে ওকে।'

'ও যদি সত্যি মাসুদ রানা হয় তাহলে,' বলল জুনেস্কি। একটু ভাবল সে। তারপর বলল, 'কিন্তু ও যদি ফিলাতভ হয়ে থাকে তাহলে কি ওকে আপনি সুস্থ বা শান্ত বলবেন, স্যার?'

রাগে ফেটে পড়ল পপকিন। 'ফর গডস সেক। ও রানা একথা প্রমাণ করার জন্যে এতক্ষণ তুমি আমার সাথে তর্ক করেছ, এখন আবার মত পাল্টে বলছ, ও ফিলাতভও হতে পারে!'

'আমি সম্ভাবনার কথা বলছি, স্যার,' মৃদু কণ্ঠে বলল জুনেস্কি। কেন যেন, সমস্যাটার বিদঘুটে চেহারা অনুভব করতে পেরে দুশ্চিন্তার সাথে সাথে কিছুটা মজাও লাগছে ওর। 'সে যাই হোক, আঁতুড় ঘরে থাকতেই পটল তুলেছে অপারেশনটা, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

'একটা কথার সাফ জবাব দাও আমাকে,' সিধে হয়ে দু'কোমরে হাত রাখল পপকিন। 'কে ও? ফিলাতভ? নাকি ফিলাতভ নয়?'

'ফিলাতভ। চেহারাটা তো…'

'ফিলাতভ একশো চল্লিশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালাতে পারে?' প্রচণ্ড ধমকের সুর পপকিনের গলায়।

'না।'

'সে কাউকে আহত করতে পারে? তার পক্ষে সম্ভব?' গলা আরও চড়ছে পপকিনের।

'না,' ভয়ে ভয়ে বলল জুনেস্কি। ঢোক গিলল।

'ফিলাতভ নরওয়েজিয়ান ভাষা জানে?' গম গম করে উঠল পপকিনের কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ।'

'ফিলাতভ অসলোর পথে হারিয়ে যেতে পারে?'

'না।'

তেড়ে প্রায় মারতে এল জুনেস্কিকে এবার পপকিন। 'তাহলে ওকে ফিলাতভ বলছ কেন?'

'ভুল করেছি,' মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে জুনেস্কি। বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'ও ফিলাতভ নয়।'

'নয়?' বোমা পড়ল কামরার ভিতর।

কেঁপে উঠল জুনেস্কি।

'নয়?' প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে দিল পপকিন টেবিলের উপর। চিড় ধরে গেল কাঁচে। 'আবার বলো কথাটা! ও ফিলাতভ নয়?'

এমন উৎকট সমস্যায় জীবনে কখনও পড়েনি জুনেস্কি। দু'হাত এক করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করল সে। 'দুঃখিত, স্যার। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। আপনি আমাকে মাফ করে দিন।'

কপালের ঘাম মুছছে পপকিন। পায়চারি শুরু করল আবার। মাথায় তারও কি ছাই ঢুকছে কিছু। হঠাৎ থামল, 'শোনো, এ লোক ফিলাতভ। কিন্তু পাগল হয়ে গেছে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।' কিন্তু তার মুখ দেখে জুনেস্কি বুঝল, ব্যাখ্যাটা বসের নিজের কাছেই গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।

কিন্তু সাময়িক নিষ্কৃতি পাবার জন্যে উৎসাহের ভাব দেখাল সে। 'তাই হবে। নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে ডক্টর ফিলাতভ।'

'অসম্ভব!' চেঁচিয়ে উঠল পপকিন। আবার পায়চারি শুরু করল সে। 'ও যা ঘটিয়েছে তা কোন পাগলের পক্ষেও সম্ভব নয়।' হঠাৎ দাঁড়িয়ে মেঝেতে পা ঠুকল। 'কিছুই বুঝছি না। কিছুই ঢুকছে না মাথায়। একটা পাগলকে এমন ধীরস্থির দেখায় না কখনও, দেখাতে পারে না। না, পাগল নয় লোকটা। যা বলছে তাই ও? মাসুদ রানা? অসম্ভব! তাও হতে পারে না। তবে?' জুনেস্কির দিকে বোকার মত চেয়ে থাকল সে।

পুরো এক মিনিট কথা বলল না কেউ। ক্লান্ত, ঝড়ো কাকের মত দেখাচ্ছে পপকিনকে। ধপ্ করে চেয়ারে বসল সে। করুণ সুরে বলল, 'এক গ্লাস পানি!'

'এখানে ওকে রাখা চলে না,' বসের পানি খাওয়া শেষ হতে বলল জুনেস্কি। 'ঠিক যে কারণে ফিলাতভকে দূতাবাসে রাখা যায়নি। দূতাবাসের ওপর সবার নেক নজর আছে।'

'ইতিমধ্যে দু'ঘণ্টার ওপর পেরিয়ে গেছে,' চিন্তিতভাবে বলল পপকিন। মুখের ঘাম মুছছে ভিজে রুমাল দিয়ে। 'হোটেলে ফেরত পাঠিয়ে দেব, বলছ তুমি?'

'কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করে,' বলল জুনেস্কি। 'জুলির সাথে ওর নাকি ডিনার খাবার কথা রাতে।'

'জুলি। ওর ব্যাপারে কিছু জানে লোকটা?'

'না।'

'না জানাই ভাল। জুলিকে খবর দাও। কিন্তু সেও যেন এ ব্যাপারে কোন আভাস না পায়। ওর নিজের চোখে যদি কিছু ধরা পড়ে, নিশ্চয়ই রিপোর্ট করবে এবং সেটাই আমি চাই। শুধু বলবে, কোনমতেই যেন চোখের বাইরে যেতে না দেয়।' একটুকরো কাগজ টেনে নিয়ে নিজের সামনে রাখল, কলম খুলে কাজের সংখ্যা লিখতে শুরু করল। 'এরপরই দু'জন ডাক্তার দরকার আমাদের। নিজেদের লোক হওয়া চাই। একজন প্লাস্টিক সার্জেন, আরেকজন সাইকিয়াট্রিস্ট।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' বলল জুনেস্কি।

'ঠিক,' বলল পপকিন, তারপর চুপ করে গেল। গভীরভাবে কিছু ভাবছে। ধীরে

ধীরে একসময় মুখ তুলল সে। উদ্বেগ আর আশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে গেছে মুখের চেহারা। নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল একবার। 'আর যদি একটা নকলই সরবরাহ করা হয়ে থাকে, কিভাবে তা হয়েছে, কিছু অনুমান করতে পারো?'

'তা পারি,' বলল জুনেস্কি। 'গতকাল ভোর চারটে পর্যন্ত ফিলাতভের সাথে ছিল জুলি। যা কিছু হয়েছে, ও চলে আসার পর। নকল, মানে, রানাকে নিয়ে আসা হয়েছে হোটেলে—কিভাবে?'

'স্ট্রেচারে তুলে—নিশ্চয়ই ওর তখন জ্ঞান ছিল না।'

'রাইট!' উৎসাহিত হয়ে বলল জুনেস্কি। সাথে সাথে দপ করে নিভেও গেল উৎসাহটুকু। বোকা বোকা দেখাচ্ছে তাকে। চেয়ে আছে বসের দিকে।

ব্যাপারটা ধরতে পেরে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল পপকিন। 'ফিলাতভ, আসল ফিলাতভ, আমাদের ডক্টর ফিলাতভ তাহলে কোথায়? কাদের হাতে?'

'সম্ভবত,' ঢোক গিলে বলল জুনেস্কি, 'রানাকে যারা হোটেলে রেখে গেছে তারাই ডক্টর ফিলাতভকে হোটেল থেকে নিয়ে গেছে। কোথায়—এ প্রশ্ন এখন তুলে কোন লাভ নেই। সময়ে হয়তো সব রহস্যই প্রকাশ পাবে, কিন্তু এই মুহূর্তে ওসব কথা ভেবে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

একটু যেন স্বাভাবিক হলো পপকিন। 'সান্ত্বনা এইটুকুই, বুঝলে, জুনেস্কি ডক্টর ফিলাতভ যদি অন্য কারও হাতে পড়েও যায়, তাকে দিয়ে ওদের মনের আশা পূর্ণ হবে না।'

'স্যার, আপনার কথা ঠিক…'

আপন মনে হাসল পপকিন। 'অপারেশনটাকে সফল করার জন্যে যে সব তথ্য দরকার তার সবটুকু তারও জানা নেই।'

হঠাৎ উত্তেজিত দেখাল জুনেস্কিকে। 'তাহলে আমরা ভাবছি কেন অপারেশন চুলোয় গেছে, স্যার? নকল হোক বা আসল হোক চেহারাটা তো ডক্টর ফিলাতভেরই?'

'তুমি একটা বুদ্ধু,' গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল পপকিন। 'কে ও? চেনো ওকে?'

ধমক খেয়ে নয়, নিজের বোকামিটা বুঝতে পেরে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল জুনেস্কি।

'গতকাল হোটেলে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকেছে কিনা খোঁজ নাও। নতুন বোর্ডারদের নামের তালিকাও যোগাড় করো। পুরো হপ্তা জুড়ে কারা এসেছে, কারা গেছে চেক করো। নিশ্চয়ই ফিলাতভের ওপর বেশ ক'দিন থেকেই নজর রাখা হচ্ছিল।'

'বড় ঝামেলার কাজ,' মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল জুনেস্কি। 'স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা নেব কি?'

'এখন? এই অবস্থায়? না। গোটা ব্যাপারটা চেপে যাচ্ছি আমরা।' কাগজের বুকে কলমের আঁচড় কাটছে পপকিন। 'আমাদের মনে রাখতে হবে, পিন খোলা হাত বোমা নিয়ে ডিল করছি আমরা। বেশি ঘাঁটাতে চাই না আমি। এই লোকের দায়িত্ব এখন আমি ছেড়ে দেব একজন সাইকিয়াট্রিস্টের ওপর। আমি এখনও বিশ্বাস করি, এ লোক ফিলাতভ। তবে…হয়তো পাগল হয়ে গেছে। পুরোপুরি হয়তো নয়…ভুল কোন প্রশ্ন করলে, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যেতে পারে সে। জুনেস্কি, এক্ষুণি এই মেসেজটা লন্ডনে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। ডাক্তারদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

দূতাবাসে দেখতে চাই আমি।' খস খস করে মেসেজ লিখতে শুরু করল পপকিন।

লেখা শেষ করে চিরকুটটা টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল পপকিন। 'রানার ওপর নজর রাখার জন্যে লুইস পাঞ্জার, আয়ান, গিবসন, মেটকাফ এবং ভিক্টোরকে পাঠাও। ওদেরকে বলে দেবে, লোকটা যদি কোনভাবে পালাতে পারে বা খুন হয়ে যায়—ওদেরকে আর কখনও আমার দরকার হবে না। একথা বললেই অর্থটা ওরা বুঝবে।'

'ইয়েস, স্যার।'

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে হঠাৎ থামল পপকিন। ঘুরল। 'আমি লন্ডনে যাবার পর কোন চিঠি আসেনি? আমার নামে?'

'এসেছে, স্যার,' বলল জুনেস্কি। 'তেল আবিব থেকে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে। ফার্স্ট সেক্রেটারি আমাকে দিয়েছেন, সেগুলো আমি আপনার ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি।'

'হেড অফিস থেকে কোন চিঠি?'

'বলতে পারি না, স্যার। নেড়েচেড়ে দেখিনি আমি।'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল পপকিন, 'ভেবে দেখো, এসব কিছুই ঘটত না, যদি আগেই রওনা হয়ে যেতে পারতাম আমি ফিলাতভকে নিয়ে। সব ঠিকঠাক, এমন সময় অর্ডার এল—ওয়েট। পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করো। কোথায় সেই পরবর্তী নির্দেশ? যত্তোসব!' মেঝেতে পা ঠুকে রাগের, দুঃখের, ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাল পপকিন। গট গট করে বেরিয়ে গেল।

আট

দূতাবাস থেকে হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জুনেস্কি রানাকে। গাড়িটা দূতাবাসেরই, চালাচ্ছে জুনেস্কি। ওদের নির্দেশ অমান্য করলে কতটুকু বিপদ ঘটতে পারে তার একটা চিত্র তুলে ধরে সাবধান করে দিয়েছে সে রানাকে। 'আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন, অসাধারণ একটা গোলক ধাঁধার মাঝখানে হারিয়ে ফেলেছেন নিজেকে। আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছি ব্যাপারটা ফয়সালা করার। এটাকে নির্দেশও বলতে পারেন, আবার অনুরোধও বলতে পারেন, আমাদেরকে না জানিয়ে হোটেলের বাইরে যাবেন না।' গলার স্বরটা কঠিন হয়ে গেছে ভেবে একটু হেসে পরিবেশটাকে তরল করতে চেষ্টা করল সে। 'আপনার ক্ষতটা এখন কেমন? ব্যথা কমেছে?'

'কমেছে,' বলল রানা। 'কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারকে দেখানো দরকার।' ক্ষতটা ধুয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে জুনেস্কি, কয়েকটা ট্যাবলেটও খেতে দিয়েছে ওকে। ডাক্তার না হয়েও নিপুণভাবে কাজটা করেছে সে, তাই দেখে ধারণা করেছে রানা, ছোরাছুরির আঘাত দেখতে বা নাড়াচাড়া করতে রীতিমত অভ্যস্ত সে, এসব তার কাছে নতুন কিছু নয়। কোথায়, তা ঠিক মনে করতে না পারলেও,

লোকটার সাথে ওর নিজের যেন একটা মিল আছে, এটা স্পষ্টভাবে অনুভব করেছে ও।

'ডাক্তার আপনাকে দেখবে,' বলল জুনেস্কি। 'আগামীকাল।'

'সেই মেয়েটার সাথে একটা ডিনার ডেট আছে আমার,' বলল রানা। 'কি করব এখন আমি?'

'কি করবেন মানে?'

'ফর গড়স সেক! আমি তো ওর নামও জানি না।'

রানার পিঠ চাপড়ে দিল জুনেস্কি। 'চিন্তার কিছু নেই। কোন অসুবিধে হবে না।'

'ফিলাতভ হিসেবে অভিনয় করে যেতে বলছ তোমরা, দেশের স্বার্থে রাজি আছি আমি, কিন্তু কিছু প্রশ্নের উত্তর তো তোমরা দিতে পারো। যেমন ধরো—কে লোকটা? এই ডক্টর ফিলাতভের কথা বলছি। কে সে?'

'আপনার সমস্ত কৌতূহল আগামীকাল মেটানো হবে।'

শেষ চেষ্টা করল রানা। 'দেখো, তোমরা খামোকা আমাকে অন্ধকারে রেখেছ। আমি তো আর তোমাদের পর কেউ নই। তোমরাও ইহুদি, আমিও ইহুদি। তোমরা ইসরায়েলী, আমিও ইসরায়েলী। তোমরা দেশকে ভালবাসো, আমিও দেশকে ভালবাসি।' আবেগে কাঁপছে রানার গলা।

অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল জুনেস্কি। এটা যদি অভিনয় হয়ে থাকে, ভাবছে সে, তাহলে স্বীকার করতে হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এই লোক।

'সব কথা আমাকে খুলে না বলার কি কারণ থাকতে পারে?' বিস্মিত প্রশ্ন রানার গলায়। 'তোমরা কি ইন্টেলিজেন্সে আছ? তুমি একজন স্পাই? আমিও কি তাই?'

একটু বড় হলো জুনেস্কির চোখ জোড়া। কিন্তু মুখ খুলল না। ভাবছে, মর জ্বালা, এ কেমনতরো ল্যাঠা রে বাবা! লোকটা যে বুদ্ধিমান তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঠিক ঠিক কিভাবে যে সব বুঝে যাচ্ছে, গড নোজ।

হোটেল কামরায় ঢোকার পর দশ মিনিটও কাটেনি, ওকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল টেলিফোনটা। কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। তাকিয়ে আছে গম্ভীর মুখে। কয়েকবার বাজতে দিল। সাপের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছে, এই ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে ধরল রিসিভারটা। কানের কাছে তুলল। 'ইয়েস?' রুক্ষ, নীরস কণ্ঠস্বর।

'হ্যানসেন বলছি।'

'কে?' সাবধানে জানতে চাইল রানা।

'জুলি হ্যানসেন, আবার কে? আমরা ডিনার খাব, মনে আছে? কেমন আছ, ডারলিং?'

একটা পুলক অনুভব করছে রানা। চকিতে মনে পড়ে গেছে রক্তকেশী মেয়েটার উত্তুঙ্গ, উপচানো, ঢলঢলে যৌবনের কথা। ওর কণ্ঠস্বর কানে ঢোকা মাত্র শরীরে একটা শিরশিরে ভাব অনুভব করছে। কণ্ঠস্বরে, এবং উচ্চারণ-কৌশলে অদ্ভুত একটা সেক্সি ভাব আছে মেয়েটার। 'এখন একটু ভাল,' ঢোক গিলে বলল রানা।

'ডিনার খেতে নামতে পারছ তো?'

'বোধহয়।'

'তবে ডারলিং, অসুস্থ শরীরটাকে বেশি খাটানো বোধহয় উচিত হবে না। আমি বলি কি, তোমার হোটেলের নিচের রেস্তোরাঁতেই তো আমরা ডিনার খেতে পারি। তুমি কি বলো?'

প্রস্তাবটা রানাই দিতে যাচ্ছিল। এককথায় রাজি হয়ে গেল ও।

'এক্ষুণি তাহলে তোমার রূমে চলে আসছি আমি, কেমন, ডারলিং?'

একটু থতমত খেলো রানা। 'আমার রূমে?' মৃদু গলায় বলল।

কয়েক সেকেন্ড কথা বলল না জুলি। যখন কথা বলল, পরিষ্কার উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল গলার স্বরে, 'এখনও রাগ করে আছ, আন্তন? যা ঘটেছে, ভুলে যাও, প্লীজ। আমি মাফ চাইছি। 'ঠিক আছে, সুদে আসলে সব পাওনা আদায় করে নিয়ো। আজ তোমার জন্যে কোন বাধা-নিষেধ নেই। যা বলবে, যেভাবে বলবে—যত কষ্টই হোক, সব মুখ বুজে সহ্য করব। খুশি?'

'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলল রানা।

'বুঝতে পারছি সাংঘাতিক খেপে আছ আমার ওপর। ঠিক আছে, আসতে দাও আমাকে—দেখব, কিভাবে আমার ওপর রাগ করে থাকতে পারো তুমি! আসছি কিন্তু!'

'না,' বলল রানা। 'ঠিক সাড়ে সাতটায় আসছ তুমি। আমি একটু একা থাকতে চাই।'

'আন্তন!' ভয় পেয়ে গেছে জুলি। 'কি আমার অপরাধ? কেন…কেন…?'

রিসিভার রেখে দিল রানা। রিস্টওয়াচ দেখল। সাড়ে চারটে।

গোটা ব্যাপারটার মধ্যে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে রানা। সেই সাথে অনুভব করছে এর সাথে জড়িত আছে ওর মাতৃভূমি, খোদ ইসরায়েলের বিরাট কোন স্বার্থ। কিন্তু কি সেই স্বার্থ? ওর চেহারা বদলে দিয়ে কি উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাইছে কর্তৃপক্ষ? কর্তৃপক্ষ? নিশ্চয়ই! তেল আবিবের মেন ব্রেনগুলো রয়েছে এর পেছনে, তা না হয়েই যায় না। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যটা কি? ওকে দিয়ে দেশের কি স্বার্থ উদ্ধার করতে চাইছে তারা?

পপকিন ছাই পাঁশ কিছুই জানে না, বুঝতে পেরেছে ও। স্পাইরালেনের মাথায় যা ঘটেছে, বিশ্বাস করেনি সে, সেজন্যেই নিজের পরিচয় যতটুকু জানা আছে ওর, প্রকাশ করে দিয়েছে। শুনে জ্ঞান হারাতেই শুধু বাকি রেখেছে পপকিন।

কিন্তু, কে লোকটা? জুনেস্কির বস্, বোঝা যায়, কিন্তু এটুকু বুঝেও বেশি দূর এগোনো যাচ্ছে না—প্রশ্ন ওঠে, জুনেস্কি কে? অসলোর ইসরায়েলী দূতাবাসে কঠোর চরিত্রের ছোট্ট এই দলটা কি দায়িত্ব পালন করছে, কোন্ কাজে তারা নিবেদিত? ট্রেড রিলেশন? উঁহু, মনে হয় না। ফিলাতভকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল, সে যেন হোটেল ছেড়ে দূরে কোথাও না যায়। এই সাবধানতার প্রয়োজন ছিল। স্পাইরালেনের ঘটনার পর প্রমাণ হয়েছে ব্যাপারটা। কে এই ফিলাতভ, এত যার গুরুত্ব?

হঠাৎ বন্ করে ঘুরে গেল মাথাটা। টেবিল ধরে সামলে নিতে চাইল নিজেকে রানা। কামরাটা ঘুরছে। মনের ভিতর সাংঘাতিক একটা তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। কি যেন মনে পড়তে চাইছে, কিন্তু মনে পড়ছে না। অসুস্থ বোধটা ক্রমেই

বাড়ছে। অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে, বিছানার দিকে যাওয়া উচিত ওর। টেবিলের কিনারা থেকে হাত তুলে নিতেই টলে উঠল শরীর। পড়ে যাচ্ছে রানা। কোন শব্দ হচ্ছে না, অথচ কানের পাশে তীব্র ঝড়ের গর্জন শুনতে পাচ্ছে ও। টলতে টলতে বিছানার দিকে এগোচ্ছে। হাত দুটো অন্ধের মত নাড়ছে সামনে। ঘামে ভিজে গেছে শরীর। পড়ে গেল রানা। তারপর আর কিছু মনে নেই।

চেতনা ফিরতেই ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল রানা। ঘামে নেয়ে উঠেছে।

দরজাটা ভেঙে ফেলবে নাকি? বিছানা থেকে নামতে নামতে ভাবল ও। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল মুখের।

দরজা খুলে দিতেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল জুলি রানার বুকে। একটা হাত পেছনে নিয়ে গিয়ে দরজাটা দ্রুত বন্ধ করে দিল সে, কিন্তু পলকের জন্যে করিডরে উদ্বিগ্ন মুখ দেখতে পেল রানা জুনেস্কির।

'আন্তন! আন্তন! কি হয়েছে তোমার?' জুলি শক্ত করে একটা হাত ধরে ফেলেছে রানার। 'কখন থেকে দরজায় ধাক্কা মারছি...'

মৃদু একটু হাসল রানা। 'দুঃখিত, জুলি। হঠাৎ শরীরটা খারাপ লাগছিল...ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' হঠাৎ প্রশ্ন জাগল মনে, এই মেয়েটাও কি পপকিনের লোক?

'এখন ভাল তো?' হাত ধরে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রানাকে জুলি। চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। 'নিচে নামার আর দরকার নেই, রুম সার্ভিসকে বলে ডিনার আনিয়ে নিলেই চলবে। ডাক্তারকে ডাকব?'

'আরে না,' বিছানায় বসল রানা। 'আমি ঠিক আছি। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল—তেমন কিছু না। এখন ঠিক আছি।'

'দেখি তো,' শার্টের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে উল্টো পিঠ দিয়ে রানার শরীরের উত্তাপ অনুভব করল জুলি। 'গা এমন ভিজে কেন? এত ঘেমেছ? ইস্, কী ঠাণ্ডা!'

হেসে ফেলল রানা। জুলির হাত ধরে নিজের পাশে বসাল। 'তুমি খামোকা ভাবছ। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তুমি বসো,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'চট্ করে তৈরি হয়ে নিই আমি। নিচেই ডিনার খাব আমরা।'

অবাক হয়ে গেল জুলি। এখনও রেগে আছে লোকটা! এর আগে যে ক'বার এই কামরায় ঢুকেছে সে, ঢোকা মাত্র প্রতিবারই বুভুক্ষু নেকড়ের মত ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ফিলাতভ।

'এক্ষুণি তৈরি হতে চাইছ? সবে তো সাতটা। একটু রাত করেও তো ডিনার খেতে পারি আমরা?' বলল জুলি।

'তা পারি,' বলল রানা। 'বারে বসে সময়টা কাটাই চলো। ঘরে বসে থেকে লাভ কি?'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল জুলি। চেহারাটা ম্লান হয়ে গেছে। রানা বাথরুমের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছে দেখে ওর একটা হাত ধরে ফেলল সে। দাঁড়াল। 'না, এক্ষুণি পোশাক পাল্টাবার দরকার নেই। আন্তন,' চোখ বুজল জুলি। মুখটা হাসি হাসি। 'আন্তন, ডারলিং, আমাকে একটা চুমো খাবে?'

মাথাটা একটু পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখল জুলিকে রানা। ম্যাজেন্টা রঙের স্কার্ট, তাতে গোঁজা ফুলহাতা সাদা শার্ট টান টান হয়ে আছে উদ্ধত বুকের

কাছে। এক ইঞ্চি সরে এল রানা। ঠোঁট দুটো মৃদু ফাঁক হয়ে আছে জুলির। খুঁটিয়ে দেখল মুখটা। ভাবছে ফিলাতভের অভিনয় করে যেতে হবে ওকে, উপায় নেই। ঝুঁকল একটু। ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট দুটো দেখল। একটু ভিজে ভিজে। অধরে অধর রেখে চুমো খেলো রানা। একবার। আলতোভাবে। তারপর মুখ তুলল। 'খেলাম। সন্তুষ্ট?'

চোখ খুলল না জুলি। ছাড়ল না রানাকে। 'না!' আশা করছে, রাগ দূর হয়ে গেছে ফিলাতভের, রোজ যা করে আজও সে তাই করবে, টেনে হিঁচড়ে খুলে নেবে তার পোশাক···।

'না?' ইতস্তত করছে রানা।

'কি হলো, আন্তন?' চোখ মেলল জুলি। অবাক দেখাচ্ছে তাকে। 'কেন আমার ওপর রাগ করে আছ তুমি? প্লীজ, বলেছি তো, মাফ করে দাও···'

'কি বলছ তুমি এসব?'

'কি হয়েছে তোমার? আমাকে আর ভাল লাগে না?'

'ছিঃ ছিঃ! কেন···'

'তাহলে এমন নিষ্ঠুরের মত আচরণ করছ কেন আমার সাথে? তুমি ভাল করেই জানো, তুমি যা বলবে, যা চাইবে তা না করে আমার উপায় নেই। যা চেয়েছ তাই পেয়েছ আমার কাছ থেকে। গতকাল তোমার শরীর খারাপ ছিল বলেই না আপত্তি করেছিলাম।'

এক টানে শার্টের চেন খুলে ফেলল সে। ব্রার হুক খুলে দিতেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ভরাট উন্নত দুটি গোলাপী মাংসপিণ্ড।

ধক্ করে উঠল বুকটা রানার। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। হঠাৎ বেড়ে গেছে শরীরের রক্ত চলাচল। চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না ও।

হাসছে জুলি। রানার একটা হাত ধরল, টানল বিছানার দিকে। 'কই, এসো!'

মৃদু একটা হাসির রেখা ফুটল রানার ঠোঁটে। দু'হাতে চেপে ধরল জুলির কাঁধ, টেনে আনল বুকের উপর। মুখ তুলে তাকাল জুলি। আবার নেমে এল রানার ঠোঁট জোড়া। একটা হাত নেমে গেল জুলির কোমরে, স্কার্টের চেনের উপরে, টেনে নামিয়ে দিতেই ঝুপ করে মেঝেতে পড়ল স্কার্টটা গোল হয়ে। রানার শার্টের বোতাম খুলছে জুলি। হাত বাড়াল রানা, আলোর সুইচটা অফ করে দিল। পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ওকে বুকের কাছে।

অস্থির হয়ে উঠল জুলি। পাগল করে তুলছে ওকে লোকটা আজ···

অন্ধকার ঘর। ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল ওদের। আর কোন শব্দ নেই। কোন নড়াচড়া নেই।

ফিসফিস করে বলল জুলি, 'কে তুমি? আনাতোলি পপোভিচ ফিলাতভ নও। কে তুমি?'

'মানে?' অস্ফুটে জানতে চাইল রানা।

জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে ওরা। রানার গালের সাথে সেঁটে আছে জুলির মুখ। নিচু গলা, প্রায় শোনা যায় কি যায় না, অথচ উগ্র একটা কৌতূহল, সেইসাথে

আতঙ্কের রেশ টের পাচ্ছে রানা জুলির স্বরে, 'আমাকে ফাঁকি দিতে পারোনি। হুবহু ফিলাতভের মত দেখতে, কিন্তু তুমি অন্য কেউ। তোমার শরীর একজন শক্তিশালী যুবকের শরীর। কে তুমি?'

সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল জুলির, অনুভব করল রানা। অভয় দিয়ে জুলির নগ্ন পিঠে একটু হাত বুলাল রানা। অস্ফুটে বলল, 'মাসুদ রানা।'

'মাসুদ রানা?' বিস্ময়ে কেঁপে গেল জুলির চাপা কণ্ঠস্বর। 'কে সে?'

'আমি বাঙালী। বাঙালী ইহুদি। নামটা মনে আছে শুধু। তেল আবিবে ছিলাম।'

'এখানে কেন?'

'জানি না।'

'জানো না?'

'মনে নেই। কিছুই মনে করতে পারছি না,' শান্ত কিন্তু শিশুর মত অসহায় একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছে রানার বলার ভঙ্গিতে। 'হঠাৎ গতকাল ঘুম থেকে উঠে নিজেকে আবিষ্কার করেছি এই হোটেলে। অন্য চেহারা নিয়ে। দেখতে আমি অনেক ভাল, চেহারাটা মনে আছে। স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছি।' হঠাৎ জুলির নগ্ন পিঠ খামচে ধরল রানা। 'জুলি! জুলি, তুমি সত্যি জানো আমি ফিলাতভ নই? মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, আমি হয়তো ফিলাতভই! মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগল হয়ে গেছি, তাই নিজেকে বাঙালী ভাবছি, মাসুদ রানা ভাবছি। আসলে হয়তো...সত্যি ধরতে পেরেছ? আমি ফিলাতভ নই?'

অদ্ভুত একটা ব্যাকুলতা রানার গলার সুরে। সংক্রমিত হলো সেটা জুলির মধ্যে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল সে। হাতড়ে টেবিল ল্যাম্পের সুইচটা খুঁজে নিয়ে আলো জ্বালল। তিন সেকেন্ড রানার চোখ দুটো দেখল জুলি। রানার নগ্ন শরীরের উপর চোখ বুলাল। হাঁটুর কাছে পুরানো কাটা দাগটার দিকে থমকাল দৃষ্টি, একটু ঝুঁকে পড়ল জুলি। উরু বেয়ে উঠে আসার পথে আবার একবার থমকাল, তারপর সোজা এসে স্থির হলো রানার চোখে। মাথা নাড়ল এদিক ওদিক।

'কে? কে আমি?' আগ্রহের আতিশয্যে ঝট্ করে বিছানার উপর উঠে বসল রানা। জুলির একটা কাঁধ খামচে ধরল।

'তুমি ফিলাতভ নও। কিন্তু তুমি যদি ফিলাতভ না হও, এখানে কি করছ?'

'ফিলাতভ হিসেবে অভিনয় করে যেতে বলা হয়েছে আমাকে,' বলল রানা। 'দেশের স্বার্থে আপত্তি করিনি।'

'কে বলেছে অভিনয় করে যেতে?'

একটু ভাবল রানা। 'তুমি চিনবে কিনা জানি না। আমাদের দূতাবাসের কার্ল পপকিন নামে এক লোক।'

'কার্ল পপকিন!' জুলির গলাটা এক পর্দা চড়ে গেল। বিস্ময়ের সাথে একটু যেন স্বস্তির ভাবও ফুটে উঠল তার মুখের চেহারায়। 'তিনি জানেন সব?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার কথা বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছে না। তোমার কোন সন্দেহ নেই তো...'

'প্রশ্নই ওঠে না, রানা,' বলল জুলি। চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। অন্যমনস্কভাবে

হাত বাড়িয়ে নিচু তেপয় থেকে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল সে। ডায়াল করল। 'হ্যানসেন, জুলি। মি. কার্ল পপকিনকে…'

'বলছি, জুলি। তোমার ফোনের অপেক্ষাতেই আছি।' গম্ভীর কিন্তু উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কার্ল পপকিনের, 'কে ও? ফিলাতভ?'

'না।'

'আর ইউ শিওর?'

'মোর দ্যান শিওর, স্যার।'

'মাই গড!' আর্তনাদ বেরিয়ে এল পপকিনের গলা থেকে। 'ফিলাতভ তাহলে কোথায়?'

ভয়ে ভয়ে রিসিভারটা কানের কাছ থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিল জুলি। এ ধরনের আর্ত চিৎকার সহ্য করার ক্ষমতা ওর কানের নেই। জবাব দেবার কথা ভাবছে না। প্রশ্নটা নিজেকেই করেছে কার্ল পপকিন।

পাঁচ সেকেন্ড পর জানতে চাইল জুলি, 'স্যার, আমার দায়িত্ব কি শেষ হয়ে গেল…?'

'পাগল হলে নাকি?' দ্রুত বলল পপকিন। 'দায়িত্ব কয়েকশো গুণ বাড়ল আরও। ওকে ছেড়ে নোড়ো না। কাছ থেকে লক্ষ্য রাখো।'

'ইয়েস, স্যার।'

খটাস! অপর প্রান্তে রিসিভার রেখে দেবার শব্দ।

গিটারের হালকা টুংটাং। পরিবেশটা ঠাণ্ডা। অল্প ক'টা জুটি বারে, মৃদু গলায় কথা বলছে, চুমুক দিচ্ছে যার যার গ্লাসে। রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জুলি। বয়স্ক, প্রৌঢ় এক লোকের মুখ, বেমানান…সে-জায়গায় সুন্দর এক যুবকের মুখ কল্পনা করছে সে, বলিষ্ঠ গড়নের দীর্ঘ দেহী একজন যুবককে মানায়, এমন একটা মুখ।

'কি দেখছ?' ম্লান গলায় জানতে চাইল রানা।

একটু থতমত খেয়ে সলজ্জভাবে হাসল জুলি। 'তোমার আসল চেহারাটা কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম।'

বুকটা গুমরে উঠল রানার। গলা বেয়ে উঠে আসতে চাইছে একটা ক্ষোভের বুদ্বুদ। জানা ছিল না, নিজের চেহারাটা ওর কাছে এত প্রিয়। সেটা হারিয়ে বুঝতে পারছে কত ভালবাসত ও নিজের মুখটাকে।

ওর মনের কথা কিভাবে যেন টের পেয়ে গেছে জুলি। টেবিলের উপর পড়ে থাকা রানার হাতটা চেপে ধরল ও। দু'জন চেয়ে আছে দু'জনের চোখে। 'দুশ্চিন্তা কোরো না, রানা,' আশ্বাস দিতে গিয়ে কেঁপে গেল জুলির গলা। 'যাই ঘটে থাকুক, সব প্রশ্নের উত্তর আমরা পাবই। আবার সব মনে পড়বে তোমার। আবার তুমি ফিরে পাবে তোমার আসল চেহারা।'

সত্যি? সত্যি ফিরে পাব আমার চেহারা? সব আবার মনে পড়বে? ভাবছে রানা। তেল আবিবে নিশ্চয়ই ওর আত্মীয়-স্বজন আছে, আছে ভাই-বোন, মা-বাবা…আচ্ছা, ও কি বিয়ে করেছে? যদি করে থাকে, কেমন দেখতে ওর বউটা?

ছেলেমেয়ে ক'টা? সব মনে পড়বে? আবার তাদের সাথে দেখা হবে? তাদেরকে চিনতে পারবে ও? 'তুমি বলছ, জুলি? সত্যি…?' কথা শেষ করতে পারল না রানা, আবেগে বুজে এল কণ্ঠস্বর।

'নিশ্চয়ই! স্মৃতি ফিরে পাওয়া আজকাল আর তেমন অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়। স্মৃতিভ্রংশের চিকিৎসা করলেই আবার সব মনে পড়বে তোমার। আর চেহারার ব্যাপারটা তো কোন সমস্যাই নয়। প্লাস্টিক সার্জারি

'জুনেস্কি বলেছে আগামীকাল ডাক্তাররা পরীক্ষা করবে আমাকে,' বলল রানা। 'দেখা যাক ওরা কি বলে।'

'সবচেয়ে ভাল হবে, এবং সবচেয়ে খুশি হব আমি, রানা, তুমি যদি এসব সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে হাসিখুশি থাকো,' অদ্ভুত একটা মমতার সুর জুলির কণ্ঠে।

'টেলিফোনে তখন কি বলল পপকিন?' জানতে চাইল রানা। 'ফিলাতভ গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিল। কিন্তু আমার তো কোন গুরুত্বই নেই। তোমার বস্ তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার কথা ভাবছেন?'

হাসছে জুলি। 'আরে না! দায়িত্ব আরও বেড়েছে আমার। সারাক্ষণ তোমার কাছে থাকতে হবে এখন থেকে আমাকে।'

'যার নিজের মুখ নেই, অতীত ভুলে গেছে, ঠিকানা নেই, তাকে সঙ্গ দেয়া—খুব কঠিন এবং নীরস কাজের দায়িত্ব চেপেছে তোমার ঘাড়ে। দুঃখিত, জুলি। দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া…'

'কঠিন? নীরস?' খিলখিল করে হাসল জুলি। ফোটা ফুলের মত জুলির হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে রানা। জুলি হাসি থামিয়ে বলল, 'বাড়িয়ে বলছি না, তোমার কাছে থাকার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করছি, রানা। কোথাও লোকসান নেই, সবটুকুই আমার লাভ!'

'লাভ? কিসের লাভ?'

দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে মাথা নাড়ল জুলি, সুরের ঝঙ্কারের মত লাগল তার কথাগুলো রানার কানে, 'সে কথা বলতে মানা! কোন মেয়ে তা উচ্চারণ করতে পারে না।'

বুঝে নিল রানা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমিও ভাগ্যবান। লাভের পরিমাণ তোমার চেয়ে আমারও কম নয়।'

'চলো পালাই,' হঠাৎ ফিসফিস করে বলল জুলি। চোখেমুখে পরিষ্কার একটা ষড়যন্ত্রের ভাব ফুটে উঠল তার।

'কি? পালাব?'

'হ্যাঁ,' রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল জুলি। 'জ্যাক জাস্টিস আর তার বউ আসছে…ওহ্ হো, ওদেরকে তো তুমি চেনোই না…'

'কারা ওরা?'

'দুনিয়ার সেরা বোর ওই লোক। আর বউটা দুনিয়ার সেরা পেত্নী। ওই যে ঢুকছে…'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। দেখল বারের দরজা জুড়ে বিশাল পাহাড়ের মত এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। দু'পাটি দাঁত বেরিয়ে আছে তার, রানার উদ্দেশ্যেই

হাসছে। চিকন, মেয়েলী গলায় বলল, 'এই পেয়েছি। ফিলাতভ, মাই ফ্রেন্ড, কালকের সেই গল্পটা শোনাবার জন্যে শ্রোতা পাচ্ছিলাম না…তুমি আমাকে বাঁচালে, ভায়া।' এগিয়ে আসছে সে। তার পিছনে কদাকার চেহারার এক নিগ্রো মেয়ে, ছুঁচোর মত মুখ, আশ্চর্য বেঢপ গড়ন তার শরীরের। দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকাতে ইচ্ছা করল না।

রানার হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে ওকে জুলি। 'রাতটাই মাটি করবে, চলো পালাই,' দরজার দিকে এগোল ওরা। মুখোমুখি পড়ে গেল জ্যাক জাস্টিস আর তার স্ত্রীর।

'দুঃখিত, জ্যাক.' বলল রানা। 'বিশেষ একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেছে…'

'প্লীজ,' জ্যাক জাস্টিসের মেয়েলী গলা থেকে হাহাকার ধ্বনি বেরিয়ে এল। 'এমন নিষ্ঠুর আচরণ আমার সাথে কোরো না। ফর গডস সেক, গল্পটা বলতে না পারলে,' বুড়ো আঙুল বাঁকা করে নিজের প্রকাণ্ড ভুঁড়িতে টোকা মারল। 'এটা বুম করে ফেটে যাবে…'

খনখনে গলায়, বিলাপের সুরে লিজা বলল, 'তাহলে আমার কি হবে গো…প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি!'

সহানুভূতিতে ম্লান হয়ে গেল জুলির মুখ। 'দুঃখ কোরো না, বোন,' লিজার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল সে একপাশে, রানার হাতটাও ধরে আছে শক্ত করে। দু'পা এগিয়েই লিজার হাত ছেড়ে দিয়ে রানাকে নিয়ে দরজার দিকে দ্রুত এগোল সে।

'আরে, চলে যাচ্ছে…'

ইতোমধ্যে বেরিয়ে গেছে দরজা দিয়ে ওরা। ধাওয়া করতে যাবে জ্যাক জাস্টিস, এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়াল জুনেস্কি। এই যে, 'ওস্তাদোঁকো ওস্তাদ, কি খবর? আরে, আরে, লিজা যে? কেমন আছ তোমরা?'

'ভাল,' মুখটা হাঁড়ি করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল জ্যাক জাস্টিস। 'পথ ছাড়ো।'

'সে কি! তোমাদেরকে একটা গল্প বলব বলে খুঁজছি যে…'

গজর গজর করছে জ্যাক জাস্টিস। 'আমাদের গল্পই কে শোনে, উনি এসেছেন…যত্তোসব!' জুনেস্কিকে এক রকম ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল জ্যাক জাস্টিস লিজাকে নিয়ে।

নয়

পরদিনটা জুলির সাথে চমৎকার সময় কাটল রানার। হোটেল কামরা ছেড়ে বেরোল না। গুণী মেয়ে, নানান কৌশলে মাতিয়ে রাখল রানাকে। আধ বেলা ধরে রানার ছবি আঁকল সে কাগজের বুকে পেন্সিলের আঁচড় কেটে। রানা কাছ থেকে অবশ্য

নির্দেশ-পরামর্শ না দিলে কাজটায় সফল হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না তার। শেষ পর্যন্ত রানার আসল চেহারার খানিকটা আভাস ফুটে উঠল কাগজের বুকে।

'মাই গড!' নিজের শিল্পকর্মের দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকল সে। 'তুমি এত সুন্দর?' তাকাল ঘাড় ফিরিয়ে। 'রানা?'

দৈনিক পত্রিকা থেকে মুখ তুলল রানা। 'বলো।'

এগিয়ে এসে রানার পাশে দাঁড়াল জুলি। ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে চুমু খেলো আলতো ভাবে। 'আই লাভ ইউ।'

দেয়াল থেকে সাক্ষী দিল টিক টিক টিক করে একটা টিকটিকি। একযোগে হেসে উঠল ওরা।

এ মেয়েকে ভাল না লেগে উপায় নেই, ইতোমধ্যে বুঝে নিয়েছে রানা। কোন ক্লান্তি নেই, অভিযোগ নেই, সারাক্ষণ ওকে নিয়ে ব্যস্ত। ওর সুবিধে-অসুবিধের দিকে তীক্ষ্ণ নজর। কোন্ মিউজিক পছন্দ রানার? টিভি দেখবে কিনা? খিদে পেয়েছে? ড্রিঙ্ক? কফি? বইটই পড়তে চায়? কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে? একা থাকলে ভাল লাগবে? এইরকম হাজারটা প্রশ্ন। নিজে ভাল গিটার বাজাতে পারে। আধঘন্টা বাজিয়ে শোনাল। তারপর লাঞ্চ। জ্যাক জাস্টিস নাকি তার বিরাট এক বন্ধু-বান্ধবের দল নিয়ে ওত্ পেতে আছে, নিচে থেকে ঘুরে এসে বলল জুলি। রুম সার্ভিসকে ডেকে লাঞ্চ আনিয়ে নিল ওরা।

তারপর জোর করে শুইয়ে দিল বিছানায় রানাকে, নিজের কোলে তুলে নিল মাথাটা। 'এখন তোমার সবচেয়ে বেশি দরকার এই জিনিসটা—ঘুম।' রানার চুলে বিলি কাটছে। 'অ্যাই পাজি শয়তান, ফের চোখ পিট পিট করে। চোখ বোজো বলছি।'

বিকট একটা দুঃস্বপ্ন দেখে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রানা। ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানার উপর। দেখল জুলির কোলে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে ছিল এতক্ষণ ও। শুয়ে আছে জুলি, কখন যেন সেও ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথায় বালিশ নেই।

ঘামে ভিজে গেছে রানার শরীর, হাঁপাচ্ছে। ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখছে ও। ব্যাপারটা কি? এমন কেন হচ্ছে?

বাথরুম থেকে ফিরে এসে বিছানায় বসল রানা। আলতো ভাবে জুলির মাথাটা ধরে বালিশে তুলে দিতে যাবে, ঘুম ভেঙে গেল জুলির। লজ্জা পেয়ে হাসল একটু, 'ছিঃ ছিঃ—নিজেই কেমন ঘুমিয়ে পড়েছি…কখন ঘুম ভাঙল তোমার? কেমন লাগছে শরীরটা?'

'ভাল লাগছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, 'কিন্তু…'

'কি ব্যাপার, রানা?' উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে জুলিকে।

'একটা দুঃস্বপ্ন…'

'আবার?'

'হ্যাঁ। ভীষণ ভয় পেয়েছি। কারা যেন ভয় দেখায়। কিন্তু ঘুম ভাঙার পর কিছুই মনে করতে পারি না।' অসহায় ভাবে বলল রানা। 'বুঝতে পারছি না কেন এমন হচ্ছে।'

রানার একটা হাত কোলের উপর তুলে নিল জুলি। 'ভয়ের কিছু নেই, রানা।

আমার মনে হয় তোমার স্মৃতি হারাবার সাথে এই দুঃস্বপ্নগুলোর কোন সম্পর্ক আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ ডাক্তাররা দেখবেন তোমাকে, ওঁরা বলতে পারবেন কি থেকে কি হয়েছে, কদ্দিন লাগবে...'

কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত পপকিন বা জুনেস্কির কোন ফোন এল না। হোটেলের পেছনের গেট দিয়ে বাইরে বেরোল ওরা। ফুটপাথ ধরে অনেকক্ষণ হাত ধরাধরি করে হাঁটল। হাসির অনেক গল্প বলছে জুলি। সব ভুলে হাসতে চাইছে রানা, কিন্তু পারছে না। থেকে থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। অসংখ্য প্রশ্ন আড়ষ্ট করে তুলছে ওকে। কে ও? কি ওর পরিচয়? ঠিকানা কি? কোথায় ওর দেশ? কার ছেলে? কার স্বামী? কার বাবা? এখানে কেন ও? কে বদলে দিয়েছে ওর চেহারা? কিভাবে স্মৃতি হারাল? ওকে নিয়ে বিপজ্জনক খেলায় মেতেছে, কারা ওরা? তাদের উদ্দেশ্য কি? শেষ পর্যন্ত কি হবে? এর শেষ কোথায়? বদ্ধ পাগল হয়ে যাবে ও? দুঃস্বপ্নগুলো কি তারই লক্ষণ? যারা ওর চেহারা বদল করেছে তাদের উদ্দেশ্য কি তাই? ও কি সাংঘাতিক কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল, শত্রুতা বশত এই ক্ষতি করা হয়েছে ওর, যাতে ও পাগল হয়ে যায়? ফিলাতভ... কে সে? তার কথা উঠলেই জুলি অমন গম্ভীর হয়ে ওঠে কেন? কেন এড়িয়ে যায়? লোকটা গেলই বা কোথায়? আচ্ছা, সে-ও কি ওর মত একই সমস্যায় পড়েছে? হঠাৎ মাসুদ রানা হয়ে গেছে? নিজেকে চিনতে পারছে না? চিনতে না পারলে, তাতে খুশি হবারই কথা তার। বুড়ো একটা মুখের বিনিময়ে নিখরচায় সুদর্শন একটা মুখ পেয়ে গেছে।

বাইরে বেরোলেই একদল লোক অনুসরণ করছে ওকে, দৃষ্টি এড়ায়নি রানার। অনেকগুলো লোক, কিন্তু তারা সবাই একই দলভুক্ত কিনা জানে না রানা।

শহরের নির্জন একটা এলাকার নিরিবিলি একটা রেস্তোরাঁয় ডিনার খেলো ওরা। বাইরে ঘুর ঘুর করছে লোকগুলো। দরজার কাছে দশাসই চেহারার দু'জনকে দেখতে পেয়েছে রানা। জুলির সাথে চোখ-ইশারায় ইঙ্গিত বিনিময় হতেও লক্ষ করেছে। দূতাবাসের লোক ওরা, বুঝে নিয়েছে ও।

ন'টার মধ্যে ফিরে এল আবার হোটেলে।

'তোমার হাত খুব মিষ্টি,' গিটারটার দিকে চোখ রেখে বলল রানা। 'একটু বাজাবে?'

'সেই সাথে অনুমতি দাও, একটু নাচি?' লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে গেল জুলি। লাল প্যান্ট, কোমরে গোঁজা ফুল হাতা সাদা শার্টে সত্যিই মানায় ওকে। গিটার তুলে নিল, টুংটাং ঝঙ্কারের সাথে ছন্দ মিলিয়ে আলতো ভাবে পা ফেলছে, সুরের তালে তালে নাচছে জুলি। মৃদু হাসি রানার ঠোঁটে। বাঁ হাতে পাইপ, ধোঁয়া উঠছে এঁকে বেঁকে।

ঠিক পৌনে দশটায় নক হলো দরজায়। একবার, তিন সেকেন্ডের বিরতি, তারপর পর পর দু'বার। জুনেস্কি এসেছে, বুঝল জুলি। তবু প্রশ্ন করে সাড়া নিল, তারপর দরজা খুলল সে। ফিসফিস করে কিছু জিজ্ঞেস করল জুনেস্কি জুলিকে। কাঁধ ঝাঁকাল জুলি। চেয়ারে বসে কামরার মাঝখান থেকে দেখছে রানা।

দরজা বন্ধ করে এগিয়ে এল জুনেস্কি। রানার সামনে দাঁড়াল। 'ডাক্তার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনি তৈরি?'

এই অসময়ে?'

শ্রাগ করল জুনেস্কি। অবান্তর প্রশ্ন। 'নিতে এসেছি, তৈরি হয়ে নিয়ে চলুন।'

অবাক হয়ে তাকাল রানা। একটু রূঢ় লাগছে জুনেস্কির আচরণ। লক্ষ করল, ব্যাপারটা পছন্দ করছে না জুলিও। কিছু বলতে যাচ্ছিল জুনেস্কিকে সে, কিন্তু কি ভেবে সামলে নিল নিজেকে।

এসব দিকে লক্ষ নেই জুনেস্কির। সুটকেসের উপর ভাঁজ করে রাখা পাজামাটা দেখে ভুরু কুঁচকে উঠেছে তার। 'ওগুলো পরেন না?'

'ফিলাতভ পরত,' বিছানার কিনারায় বসে পায়ে মোজা গলাচ্ছে রানা। 'আমি পরি না।'

'ও,' আরও গম্ভীর হলো জুনেস্কি।

জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল জুলি। সেটা গায়ে চড়াচ্ছে রানা। 'জুলি, তুমিও যাচ্ছ, তাই না?'

'আমি...মানে...'

'না। জুলি যাচ্ছে না। ওর কাজ আছে এখানে।' জুনেস্কির গলার স্বর বেশ কঠিন।

তার দিকে ফিরল রানা। 'ফিরে যাও তাহলে। পপকিনকে গিয়ে বলো, আমি যাব না।'

'যাবেন না?' অবাক হয়ে গেছে জুনেস্কি। 'কেন?'

'জুলিকে না নিয়ে কোথাও আমি যাব না।'

'রানা, লক্ষ্মী, শোনো...' জুলি এগিয়ে আসছে।

বসেই থাকল রানা। নিভে যাওয়া পাইপটা তেপয় থেকে তুলে নিল। 'লোকটা চলে গেলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ো, জুলি।'

অসহায় ভাবে জুনেস্কির দিকে তাকাল জুলি।

'ঠিক আছে,' হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বিরক্তভাবে কাঁধ ঝাঁকাল জুনেস্কি। 'তবে তুমিও চলো, জুলি, কিন্তু বস্...'

'বুঝিয়ে বলব'খন আমি,' দ্রুত বলল জুলি।

নিচে নেমে এসে জুনেস্কির গাড়িতে চড়ল ওরা। ব্যাক সীটে জুলির সাথে বসেছে রানা। রাস্তায় বেরিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিতেই বুঝল রানা, জুনেস্কি ওকে দূতাবাসে নিয়ে যাচ্ছে না। জানতে চাইলে বলল, 'শান্ত হয়ে বসে থাকুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা।'

দু'মিনিটের মধ্যেই পথের দিশা হারাল রানা। এদিক ওদিক যথেচ্ছ মোড় নিয়েছে গাড়ি, দিক্‌ভ্রান্ত অবস্থা হয়েছে রানার। একটু অস্বস্তি বোধ করছে। তা টের পেয়ে ওর একটা হাত ধরে কোলের উপর তুলে নিয়ে মৃদু আশ্বাসসূচক চাপ দিল জুলি। জুনেস্কির উদ্দেশ্য ঠিক ধরতে পারেনি রানা। হয়তো ওকেই দিশাহারা করতে চাইছে। নয়তো সম্ভাব্য অনসুরণকারীদের খসাতে চাইছে। কয়েক মিনিট পর একটা বড় বিল্ডিংয়ের সামনে থামল গাড়ি। দশটা ফ্ল্যাট নিয়ে পাঁচতলা দালান। এলিভেটরে চড়ে টপ ফ্লোরে উঠল ওরা। একটা দরজার তালা খুলে ইঙ্গিতে ভিতরে ঢুকতে বলল জুনেস্কি।

হলরূমে ঢুকে দু'দিকে দুটো দরজা দেখল রানা। একটা দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল জুনেস্কি, রানাকে ভিতরে ঢোকার ইঙ্গিত করে বলল, 'সার্জেন মি. হেলমুট রেচার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন—ভিতরে যান। আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।'

একটু ইতস্তত করল রানা। জুলিকে কাছ ছাড়া করবে কিনা ভাবছে।

'দরকার হলেই আমাকে ডেকো, রানা,' রানার হাত ধরে বলল জুলি। 'কথা দিচ্ছি, তোমাকে একা রেখে এখান থেকে এক মিনিটের জন্যেও কোথাও যাব না আমি।'

হাসল রানা। বিশ্বাস করেছে জুলির কথা।

রেচার মধ্য বয়স্ক। মেদ জমতে শুরু করেছে শরীরে। ক্লিনশেভ, মাথা জোড়া মস্ত একটা টাক। গলার আওয়াজটা অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। 'আসুন, মি. রানা। আপনার সেবা করার সুযোগ দিন আমাকে।'

পেছনে শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। জুনেস্কি বেরিয়ে গেছে কামরা থেকে। দরজাটা বাইরে থেকে আটকে দিয়েছে সে।

রেচারকে দেখল আবার রানা। তারপর সোজা এগিয়ে গিয়ে উঁচু টেবিলটার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। নিঃশব্দে খুলল জ্যাকেট আর শার্ট। টেবিলে উঠে শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে।

ছোট্ট একটা কাঁচি দিয়ে ব্যান্ডেজটা খুলে পাঁজরের আঘাতটা পরীক্ষা করল রেচার। 'জঘন্য,' বলল সে। 'কিন্তু পরিষ্কার। একটা লোকাল অ্যানেসথেটিকের দরকার হবে। আপনার অ্যালার্জী আছে, মি. রানা?'

'জানি না—নেই বলে মনে হয়।'

'তিনটে পিঁপড়ের কামড় অনুভব করবেন শুধু—তার বেশি কিছু না,' হাইপডারমিক সিরিঞ্জ বের করে সেটা একটা ফাইল থেকে ভরে নিল রেচার। 'শুয়ে থাকুন। নড়বেন না।'

কামড়গুলো অনুভব করল রানা।

'ওষুধের ক্রিয়া শুরু হতে একটু সময় নেবে, আপনি এখন উঠে বসতে পারেন, ব্যাগ থেকে একটা অপথ্যালমোস্কোপ বের করল ডাক্তার। 'আপনার চোখ দুটো একটু দেখব।' রানার ডান চোখের উপর টর্চের আলো ফেলল সে। 'দু'চার ঘণ্টার মধ্যে মদ টদ খেয়েছেন নাকি?'

'না।'

টর্চের আলো এবার রানার বাঁ চোখে ফেলল রেচার। অনেকক্ষণ ধরে দেখল। 'মনে হচ্ছে ঠিকই আছে।'

'ছোরার আঘাতটা আমি বুকের পাশে খেয়েছি, মাথায় নয়,' বলল রানা। 'মাথায় চোট খেয়ে মগজের কোন ক্ষতি বা কংকাশন হয়েছে, তাই স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছি, তাও নয় ব্যাপারটা।'

'ডাক্তারী বিদ্যা অল্প-স্বল্প জানা আছে দেখছি,' অপথ্যালমোস্কোপটা সরিয়ে নিল রেচার। 'কিন্তু অল্প বিদ্যা…জানেনই তো।' উঠে দাঁড়াল সে, রানার মাথাটা পরীক্ষা করছে হাত দিয়ে। 'খুলিতে কখনও কিছু হয়েছিল? খুশকি? অথবা…'

না। যদি হয়েও থাকে, মনে নেই।'

'আই সি। ঠিক আছে।' রানার পাঁজরগুলোয় আঙুলের চাপ দিল রেচার। 'কিছু অনুভব করছেন?'

'অসাড়। তবে চাপটা অনুভব করছি।'

'গুড। ক্ষতটা সেলাই করে দিচ্ছি। কিছুই টের পাবেন না। যদি পান, চেঁচাবেন।' সীল করা প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে একজোড়া গ্লাভস বের করে হাতে পরে নিল রেচার। আরেকটা প্যাকেট থেকে মিহি সুতো বের করল। 'শুয়ে পড়ুন। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকুন।'

সেলাইয়ের কাজটা নিখুঁতভাবে শেষ করতে পনেরো মিনিট সময় নিল রেচার। তার আঙুলের চাপ ছাড়া কিছুই অনুভব করল না রানা।

'হয়ে গেছে, মি. রানা।'

উঠে বসে ক্ষতটা দেখল রানা। জোড়া লেগে গেছে ক্ষতটা।

'সুতো খুলে নেবার পর শুধু চুলের মত লম্বা একটা দাগ থাকবে। এক বছর পর সেটাও আর দেখতে পাবেন না।' ব্যাগ গুছিয়ে নিল রেচার। 'এখুনি আরেকজন ডাক্তার আপনাকে দেখতে আসছেন,' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে। দ্রুত বেরিয়ে গেল দরজা খুলে। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল সে।

একটু খটকা লাগল রানার। টেবিল থেকে নেমে এগিয়ে গেল। মৃদু ধাক্কা দিয়ে বুঝল, যা ভেবেছে তাই, বাইরে থেকে তালা মেরে দেয়া হয়েছে দরজায়। ভুরু কুঁচকে কামরার চারদিকে চোখ বুলাল ও। টেবিলটা ছাড়া দুটো আর্মচেয়ার, ছোট আরও একটা টেবিল, দেয়ালের সাথে একটা বুক কেস, ফার্নিচার বলতে এই। বুক কেসটার দিকে এগোল ও। কিসের সাথে পা আটকে গেল ওর। একই সময় কি যেন নড়ে উঠল নিচু টেবিলের উপর।

টেলিফোনের তারের সাথে পা বেধে গেছে ওর। আর একটু হলে টেবিল থেকে পড়ে যেত যন্ত্রটা। সেটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা।

করিডর ধরে এগিয়ে গিয়ে শেষ মাথার দরজাটা দিয়ে ভিতরে ঢুকল হেলমুট রেচার। পপকিন এবং জুনেস্কি কথা থামিয়ে ঝট্ করে তাকাল তার দিকে। ডান কোগিন, সাইকিয়াট্রিস্ট, বসে আছে একটা আরাম কেদারায়, পা দুটো সামনে প্রসারিত, হাত দুটো কোলের উপর, দশটা আঙুলের মাথা পরস্পরের সাথে লেগে আছে। কামরায় আরও একজন লোক রয়েছে, তাকে চেনে না রেচার। পপকিন বলল, 'উইলিয়াম স্টকটন, আমার স্টাফ। ওয়েল?' ব্যগ্রতা চেপে রাখতে পারছে না সে।

ব্যাগটা নামিয়ে রাখল রেচার টেবিলে। 'ও ফিলাতভ নয়,' একটু থামল। 'তবে, ইদানীং যদি ফিলাতভ প্লাস্টিক সার্জারি করে থাকে, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।'

চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাসটা ধীরে ধীরে ছাড়ল পপকিন। 'আপনি শিওর?'

হাসল রেচার। উত্তরটা একটু রসিয়ে দিল, 'যা দিবালোকের মত সত্য তাই বললাম। ও ফিলাতভ নয়।'

'হুঁ,' ডান কোগিনের দিকে তাকাল পপকিন, 'এবার আপনার পালা, ডাক্তার কোগিন। ওর ভিতর থেকে যতটা পারেন খবর বের করে নিন।'

জবাব দিল না কোগিন। পা দুটো টেনে নিল। মুখটা গম্ভীর। উঠে দাঁড়াল সে। কামরা থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হতেই টেবিল থেকে একটা কার্ডবোর্ডের ফাইল তুলে নিয়ে খুলল পপকিন। তাকাল রেচারের দিকে। 'তেল আবিব থেকে আমার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এইমাত্র রানার একটা ফটো পাঠিয়েছে।' পপকিনের প্রতিনিধি রানার শুধু ছবিই পাঠাতে পেরেছে, ওর সম্পর্কে আর কোন তথ্যই সে যোগাড় করতে পারেনি। ফাইল থেকে ফটোটা বের করে রেচারের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'রানার ইদানীংকার তোলা ছবি, জাফার যে ফ্ল্যাটে বসবাস করছিল, সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। চেহারাটা কি রকম দেখুন। এই চেহারাকে কিভাবে যে এতটা বদলানো সম্ভব, কিছুতেই বুঝতে পারছি না!'

ফটোগ্রাফটা দেখছে রেচার। 'ভেরি ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল সে।

'আজ থেকে মাত্র দশ দিন আগেও তেল আবিবের ওই ফ্ল্যাটে দেখা গেছে মাসুদ রানাকে,' বলল পপকিন। 'আমাদের হিসাব যদি ভুল না হয়, পরশুদিন ওকে রোপণ করা হয়েছে এখানকার কন্টিনেন্টাল হোটেলে। তার মানে মাত্র সাত দিনে সারা হয়েছে চেহারা বদলাবার কাজটা। সম্ভব?'

ফটোগ্রাফটা টেবিলে নামিয়ে রাখল রেচার। 'যতটুকু বুঝতে পেরেছি, স্রেফ এক জায়গায়, বাঁ চোখের পাতার বাইরে কোথাও একটু কাটাকুটি করা হয়েছে। বড়জোর একটা সেলাই পড়েছে, তার বেশি নয়। ওটা শুকাতে এক হপ্তার বেশি লাগার কথা নয়।'

অবিশ্বাস ভরা গলায় জুনেস্কি বলল, 'ব্যস? আর কোথাও কাটাকুটি করা হয়নি?'

'হয়নি,' বলল রেচার। 'বাঁ চোখের পাতা নিচে নামানোর জন্যে ছুরি চালানো হয়েছে। ফিলাতভের কোন ছবি আছে?'

'এই যে,' বলল পপকিন। টেবিলের উপর রানার ছবির পাশে ফিলাতভের ছবিটা রাখল সে।

তর্জনী দিয়ে দেখাল রেচার। 'ওই—দেখছেন? ওর মুখের ওই যে লম্বা ক্ষত, ওটার জন্যেই ঝুলে আছে বাঁ চোখের পাতা। তাই রানার মুখে শুধু কাটা দাগ সৃষ্টি করে ওকে ফিলাতভে রূপান্তর করা যায়নি, সেই সাথে চোখের পাতাটাকেও নামানো হয়েছে।'

'ফিলাতভের মুখে ওই লম্বা দাগটা যুদ্ধের একটা চিহ্ন, সে তখন একেবারে বাচ্চা ছিল,' চুরুট ধরাতে গিয়ে পপকিন লক্ষ করছে তার হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে। 'কিন্তু রানার মুখে ওই দাগটা তারা আনল কিভাবে, কাটাকুটি না করে?'

'খুব চতুরতার সাথে করা হয়েছে কাজটা,' উৎসাহের সাথে বলল রেচার। 'ট্যাটুর এমন নিপুণ কাজ আমি আর দেখিনি। বাঁ চোয়ালের উপর জন্মদাগটাও ওই জিনিস।' চেয়ারে হেলান দিল সে। 'উল্কির কাজ আমিও করি, কিন্তু আমি তুলে নিতে বিশেষজ্ঞ, আরোপে নই,' আবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে, ছবির দিকে গভীর ভাবে তাকিয়ে একটা রেখা খুঁজে বের করল। 'চুলের রেখা অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে depilation-এর সাহায্যে, কামিয়ে নয়। আশঙ্কা করছি, রানা তার চুলের সৌন্দর্য জন্মের মত হারিয়েছে।'

'এসব না হয় না বুঝেও হজম করা গেল,' বলল জুনেস্কি, এগিয়ে এসে টেবিলের উপর দু'হাত রেখে ঝুঁকে পড়ল সে ফটো দুটোর দিকে। 'কিন্তু, লোক দু'জনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। রানার মুখে চর্বি নেই। ফিলাতভের চোয়াল ফুলে আছে মেদ জমে। নাক দুটোয় কত পার্থক্য লক্ষ করুন।'

'এর উত্তর আরও সহজ,' বলল রেচার। 'লিকুইড সিলিকোন ইঞ্জেকশনের সাহায্যে আকারে বড় করা হয়েছে রানার মুখ—যেখানে যতটা দরকার ফোলানো ফাঁপানো হয়েছে। রানার গালে হাত দিয়ে দেখেছি আমি অনুভব করা যায়।' হঠাৎ পপকিনের দিকে তাকাল সে। 'আপনি বলেছেন রানা পুরো একটা হপ্তা স্মরণ করতে পারছে না?'

'শেষ যে কথাটা মনে আছে তার পর থেকে একটা হপ্তা হারিয়ে ফেলেছে, এই রকম কিছু একটা বলতে চায় ও।'

'সেক্ষেত্রে কিভাবে কি হয়েছে তা আমি মোটামুটি অনুমান করে বলতে পারি,' দ্রুত সিগারেট ধরাল রেচার। 'ড্রাগের সাহায্যে পুরো হপ্তাটা অজ্ঞান করে রাখা হয়েছিল ওকে। ওর বাঁ হাতে একটা ড্রেসিং লক্ষ করেছি আমি। পরীক্ষা করিনি, তবে কোন সন্দেহ নেই, ওই জায়গা দিয়েই ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশনের সাহায্যে ফোঁটায় ফোঁটায় গ্লুকোজ ঢোকানো হয়েছে ওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে।'

থামল রেচার। ঘোরের মধ্যে থেকে অস্ফুটে বলল পপকিন, 'বলে যান।'

'চোখের কোণে কাটা হয়েছে, সেটা শুকোবার জন্যে নেয়া হয়েছে পুরো একটা হপ্তা। যে কোন উপযুক্ত সার্জেনের পাঁচ মিনিটের কাজ এটা। এরপর, আমার বিশ্বাস, ট্যাটুয়িং করা হয়েছে ওই লম্বা ক্ষত চিহ্নটা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। একটু ব্যথা ভাব প্রথম দিকে থাকার কথা, কিন্তু এক হপ্তা পর তা না থাকাই স্বাভাবিক। বাকি সব হালকা এবং সহজ কাজ।'

ফটোগ্রাফ দুটো তুলে নিল সে। 'একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বুঝবেন, দু'জন লোকের বোন স্ট্রাকচার, মাথার খুলির আকার সহ, প্রায় একই রকম।' ফটো দুটো রেখে উঠে দাঁড়াল রেচার। 'আজ রাতের মত এর বেশি কিছু করার নেই আমার, জেন্টলমেন। আবার কাল একবার দেখব আমি রানাকে, ওর নিজের চেহারা ওকে আবার ফিরিয়ে দেয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করার জন্যে। কাজটা সম্ভব কিনা বুঝতে পারছি না। ওই সিলিকোন পলিমার বের করা খুবই পাজি কাজ। আর কিছু?'

'না, ডা. রেচার। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার কামরা কোথায় তা তো জানেনই, যান, দয়া করে বিশ্রাম নিন এবার।'

বেরিয়ে গেল রেচার।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল পপকিন এবং জুনেস্কি পরস্পরের দিকে। পপকিন নড়ল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পেছন দিকে। 'কি বুঝলে, স্টকটন?'

'বুঝিনি, স্যার,' বলল উইলিয়াম স্টকটন। 'ঘোড়ার ডিম কিছুই আমি বুঝিনি।'

'দেখা যাক ডা. কোগিন কি বলেন,' বলল পপকিন। 'আজকের রাতটা বেজায় লম্বা লাগছে, স্টকটন। কফির ব্যবস্থা করলে হত না?'

অস্থির ভাবে পায়চারি করছে পপকিন। সে বসছে না, তাই, বুকের কাছে হাত ভাঁজ

করে, জুনেস্কি এবং স্টকটনও দাঁড়িয়ে আছে একধারে। ঝাড়া দু'ঘণ্টা পর ফিরল কোগিন। 'রানাকে একা থাকতে দেয়া উচিত নয়,' ঢুকেই বলল সে।

'স্টকটন!' দ্রুত বলল পপকিন।

সাথে সাথে দরজার দিকে এগোল স্টকটন। কোগিন বলল, 'বলতে চাইলে কথা বলতে বাধা দেবেন না। কোন প্রশ্ন করে বিড়ম্বনায় ফেলবেন না। সাধারণ প্রসঙ্গে কথা বলবেন। বুঝেছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল স্টকটন। চেয়ারে বসল কোগিন। খুঁটিয়ে দেখছে তাকে পপকিন। কিছু সময় নিঃশব্দে কেটে গেল। নিজেকে শান্ত রেখে মুখ খুলল পপকিন, 'হুইস্কি, ডক্টর?'

উপর নিচে মাথা ঝাঁকাল কোগিন। 'ধন্যবাদ।' আঙুল দিয়ে কপাল ঘষছে। 'লোকটার অবস্থা বড় খারাপ।'

একটা গ্লাসে দু'আউন্স হুইস্কি ঢালল পপকিন। 'কি রকম?'

'অন্যায় করা হয়েছে ওর ওপর,' কঠিন সুরে বলল কোগিন। 'ভেঙে চুরমার করে দেয়া হয়েছে ওর মনটাকে।'

ওর হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে দিল পপকিন। 'মানে? ওর ব্রেন···?'

ছোট্ট একটা চুমুক, তারপর ঢক ঢক করে সবটা হুইস্কি গিলে ফেলল কোগিন। 'হ্যাঁ। অন্যায়টা যারাই করে থাকুক, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে তারা। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে ওর মনের আয়নাটাকে।'

ভুরু কুঁচকে বলল পপকিন, 'রেচার বলেছিল পুরো একটা হপ্তা অজ্ঞান ছিল রানা।'

'অনেকটা তাই,' বলল কোগিন। 'ড্রাগের সাহায্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল ওকে—কিন্তু এই ঘুম ঠিক অচৈতন্য অবস্থা নয়, হালকা তন্দ্রার ঘোরে ছিল ও।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন ওর ব্রেন ওয়াশ···'

'হ্যাঁ। ঠিক তাই বলতে চাইছি। ব্রেন ওয়াশ করা হয়েছে মাসুদ রানার। ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেছে ওর ওপর কোন নিষ্ঠুর সাইকিয়াট্রিস্ট, নির্মমভাবে, অতি অল্প সময়ে।'

'কি অত্যাচার?'

'তাদের উদ্দেশ্য ছিল লোকটার ব্রেন ওয়াশ করে ওর মনের পর্দা থেকে প্রায় সব অতীত স্মৃতি চেঁছে তুলে নেয়া। প্রায় বলছি এই জন্যে যে সবটুকু স্মৃতি তার তুলে নিতে পারত, তাও সম্ভব, কিন্তু নেয়নি। নেয়নি, তার কারণ, নিলে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যেত রানা। এ কাজ কাদের, কি তাদের লক্ষ্য, আমি জানি না। কিন্তু এটুকু জানি যে তারা রানাকে সম্পূর্ণ পাগল করে দিতে চায়নি। চাইলে পারত।'

'পারত।' পপকিন যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কিন্তু কিভাবে? কিভাবে?'

পাল্টা প্রশ্ন করল কোগিন। 'হিপনোসিস সম্পর্কে কিছু জানা আছে আপনার?'

খুক্ করে কাশল জুনেস্কি। কপালের চামড়া টান টান করে তার দিকে তাকাল কোগিন। শান্তভাবে বলল, 'না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়—হিপনোসিস ঝাড়-ফুঁক বা ফুস মন্তর নয়। ড্রাগের সাহায্যে Hypngogic অবস্থায় দীর্ঘ সময় রাখা হয়েছে রানাকে, এই সময় সুচতুর ভাবে তার মনটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। নিজের

নাম, নিজের চেহারা, মাতৃভাষা, ছোটবেলার একটা ঘটনা এবং শেষবার কোথায় ছিল তা আংশিকভাবে মনে আছে ওর। এটুকুও রানার কৃতিত্ব নয়। যারা ওর ওপর এই অন্যায় করেছে তারাই চেয়েছে এগুলো স্মরণে থাকুক রানার, তা নাহলে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যাবে, এই ভয়ে।'

'বলে যান।'

'রানার মনের ভিতর অসংখ্য পাঁচিল তুলে দেয়া হয়েছে, এই সব বাধা টপকে ও যাতে নিজের আসল, পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জানতে না পারে। শুধু তাই নয়, ভুয়া কিছু স্মৃতি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ওর মনে, যাতে নিজেকে চিনতে চেষ্টা করলে পথ ভুল করে, দিশেহারা হয়ে পড়ে, এবং ক্ষান্ত হয় সে প্রচেষ্টায়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি: পরিষ্কার মনে আছে ওর, কিছুদিন আগে গলফ খেলেছে। কিন্তু সেই সাথে এও পরিষ্কার জানা আছে ওর যে জীবনে কখনও গলফ খেলেনি ও, খেলতে জানেই না। ব্যাপারটা সাংঘাতিক গোলমেলে নয়? ওরা চেয়েছেও তাই, গোলমালে প্যাঁচ খেয়ে একটা অচল অবস্থায় আটকা পড়ে থাকুক ওর মনটা। ওর ইচ্ছাশক্তি এখন পঙ্গু হতে বসেছে।'

'হিপনোসিসের দ্বারা এসব সম্ভব, বলছেন?' জানতে চাইল জুনেস্কি।

'সম্ভব। এই কামরার মেঝেতে একটা কাল্পনিক চতুষ্কোণ এঁকে আপনাকে সম্মোহিত করে আমি যদি সাজেশন দিই চৌকো জায়গাটাকে এড়িয়ে যেতে, নিজের অজান্তেই, সারাজীবন কখনও ওখানে পা ফেলবেন না আপনি দিনে হাজার বার এই কামরায় আসা-যাওয়া করলেও।'

কোন প্রতিক্রিয়া নেই জুনেস্কির মুখে।

মৃদু হেসে কোগিন বলল, 'আপনি চাইলে আপনার ওপর সম্মোহন প্রয়োগ করে ব্যাপারটা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। এখুনি।'

'না-না!' দ্রুত বলল জুনেস্কি। 'আমি বিশ্বাস করি।'

'গো অন, ডক্টর,' একটু হেসে বলল পপকিন।

'মানুষের মন নিজস্ব একটা ধারায় নিজে থেকেই চালিত হয়,' বলল কোগিন। 'নিজেকে জানতে চাওয়া মনের বিশেষ একটা ধর্ম, সে তার ভিত্তিমূলে পৌঁছুতে চায়। এই নিজেকে জানার কাজটা সম্পন্ন হয় স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে। কিন্তু এই সিঁড়িটাই কেড়ে নেয়া হয়েছে রানার কাছ থেকে। ফলে নিজেকে জানার জন্যে গভীর ভাবে চেষ্টা করলেই দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল দেখতে পাচ্ছে ও, কখনও বা গোলকধাঁধা দেখতে পাচ্ছে, ফলে শঙ্কায় জর্জরিত হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে তন্দ্রার।' পপকিনের ভুরু কুঁচকে উঠেছে, লক্ষ করছে কোগিন। 'ঘুম এসে নিষ্কৃতি দিচ্ছে ওকে। এটা একটা টিপিক্যাল হিস্টিরিক্যাল সিম্পটম। আমার সাথে কথা বলার সময় দু'বার এই অবস্থা হয়েছে ওর। প্রতিবার মিনিট পনেরো ঘুমুতে দিয়েছি ওকে আমি। ঘুম ভাঙার পর কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার কারণ বলতে পারেনি, মন থেকে মুছে গেছে সব। পাগল হয়ে যাবার আশঙ্কা ঠেকিয়ে রাখছে এই ঘুমটা।'

'দুটো ব্যাপার এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়,' নড়েচড়ে বসল পপকিন, বলল, 'এক আপনি বলছেন ওর ইচ্ছা শক্তি পঙ্গু হতে বসেছে। কিন্তু তাই যদি হবে, কিভাবে ও আমার একজন অত্যন্ত কৌশলী এবং উপযুক্ত লোককে বোকা বানিয়ে

স্পাইরালেনের মাথায় গিয়ে উঠল, সেখানে কয়েকজন দুর্ধর্ষ লোককে কুপোকাৎ করে একশো চল্লিশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে নেমে এল নিচে?'

'লোকটা কে, তা আমি জানি না', অত্যন্ত ভেবেচিন্তে, একটা একটা শব্দ উচ্চারণ করে উত্তরটা দিচ্ছে কোগিন। 'কিন্তু যতটুকু বুঝতে পেরেছি, সাংঘাতিক সক্রিয় এবং বুদ্ধিমান এক মানুষ সে। ওর ইচ্ছা শক্তি পঙ্গু হতে বসেছে, এতে কোন ভুল নেই, তবে সেটা শুধু নিজের পরিচয় খোঁজার ব্যাপারে সত্য। মনের পর্দায় এমন সব জটিল গোলমাল রয়েছে, দেখে শুনে হাল ছেড়ে দিতে চাইছে ও, উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ। দ্বিতীয় ব্যাপার...'

'এই ঘুমটা...?'

'ওর ইচ্ছা শক্তি পুরোটা নষ্ট হতে বসেছে,' বলল কোগিন। 'ধীরে ধীরে। পুরোটা নষ্ট হয়ে গেলে নিজের পরিচয় খোঁজার আর কোন চেষ্টাই ও করবে না। তখন আর এ ভাবে ঘুমিয়েও পড়বে না ও। অর্থাৎ, ওর সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হবে। জীবনে কখনও আর নিজেকে চিনতে পারবে না রানা। স্মৃতিভ্রংশ স্থায়ী হয়ে যাবে। চিকিৎসার অতীত একটা কেসে পরিণত হবে।'

'হুঁ,' পপকিন গম্ভীর। কি য়েন ভাবছে। অবশ্যই তা রানার ভালমন্দ কোন বিষয়ে নয়। রানা জীবনে কখনও আর নিজেকে চিনতে পারুক বা না পারুক, তার কিছু এসে যায় না।

'ওকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার,' বলল কোগিন। 'আপনি বললে আমি ব্যবস্থা করতে পারি।'

উঠে দাঁড়াল পপকিন। 'ধন্যবাদ, ডক্টর কোগিন। এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব নয়।'

কোগিনও উঠল। 'কাল আরেকবার ওকে দেখতে চাই আমি। যতদূর আভাস পেয়েছি, অসৎ সাইকিয়াট্রিস্টের হাতে পড়ার আগে রানা সাংঘাতিক ভয়, আশঙ্কা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল। চেষ্টা করে দেখব, আসল ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানা যায় কিনা।'

নিষ্করুণ একটু হাসল পপকিন। 'চিন্তা করবেন না, যত্নের কোন ত্রুটি হবে না ওর।'

ডক্টর ডান কোগিন চলে যেতে নিজের চেয়ারে আবার বসল পপকিন। তাকাল জুনেস্কির দিকে।

'সব শেষ,' ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল জুনেস্কি। 'ফিলাতভ নেই, অপারেশনও নেই।'

কি যেন ভাবছে পপকিন। কোন মন্তব্য করছে না।

'স্যার?'

ধীর গলায় বলল পপকিন, 'ভাবছি, ফিলাতভ হয়তো নেই, কিন্তু তার একটা ভাল বিকল্প তো রয়েছে আমার হাতে।'

বিস্ময় ফুটে উঠল জুনেস্কির চেহারায়। 'আপনি বলতে চাইছেন, স্যার, ওর ওপর ভরসা করবেন? কিন্তু ডক্টর কোগিন এইমাত্র কি বলে গেল মনে নেই আপনার? রানা যখন তখন ঘুমিয়ে পড়তে পারে...'

'কিন্তু পুরো পাগল কখনোই ও হবে না!' বলল পপকিন। 'এবং এই হঠাৎ

ঘুমিয়ে পড়ার কবল থেকেও ধীরে ধীরে মুক্তি পাবে ও।

'তার মানে...'

'রেচার চাইছে রানাকে ওর আসল চেহারা ফিরিয়ে দিতে,' কর্কশ গলায় বলল পপকিন। 'আর কোগিন চাইছে ওর স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে। ওই যে কৌশলটা, সম্মোহন, ওটার সাহায্যে চিকিৎসা করতে দিলে কোগিন তা পারবেও। ব্যস, তাহলে আর কি, একমুখ হাসি নিয়ে বাপের নাম জপতে জপতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে রানা। কিন্তু, আমার কি অবস্থা হবে তা কি একবার ভেবে দেখেছ?' চোখ রাঙাল পপকিন। ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল। পরমুহূর্তে সরল হলো মুখের রেখাগুলো। সিদ্ধান্ত জানিয়ে দ্রুত এবং গম্ভীরভাবে বলল, 'ওকে হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

ঢোক গিলল জুনেস্কি। ইতস্তত করছে। 'স্যার, ভাল করে ভেবে...'

'দেখেছি,' বলল পপকিন। 'হেড অফিসকে এখনও যখন জানাইনি, সম্ভব হলে ভবিষ্যতেও জানাচ্ছি না। নির্দেশ এলে রানাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব অপারেশনে। ও ফিলাতভ নাকি মাসুদ রানা, তা যেন আমরাও কিছু জানি না, ধরতে পারিনি। শুধুমাত্র এই ভাবেই নিজের চামড়া বাঁচাতে পারব আমি।'

জুনেস্কি আর স্টকটন পরস্পরের দিকে তাকাল। কারও মুখে কথা নেই।

'রানাকে চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখা হোক,' বলল পপকিন। 'জুলি তো সারাক্ষণ ওর সাথে থাকছেই। হোটেলের বাইরে আরও লোক পাঠাও। এই নকলটাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় রক্ষা কবচ। যাও তোমরা।'

হোটেলের গ্যারেজে নামিয়ে দিল জুনেস্কি রানাকে। 'আমি আর ওপরে যাচ্ছি না। কাল পাঠিয়ে দেব জুলিকে,' রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল সে। 'কাল মানে আজ; গড, প্রায় পাঁচটা বাজে! আপনি সোজা বিছানায় উঠে ঘুমিয়ে পড়ুন।'

গাড়িতে একটা কথাও বলেনি রানা। 'দাঁড়াও,' জুনেস্কিকে বলল ও, 'ডাক্তাররা যে আমাকে পরীক্ষা করল, তার ফলাফল কি? পপকিন আমার সাথে দেখা করল না কেন?'

'বস্ আপনার সাথে আগামীকাল দেখা করবেন,' বলল জুনেস্কি। 'সব ব্যাখ্যা করবেন তিনি।' একটু থামল জুনেস্কি, নিচের ঠোঁটটা একবার কামড়ে ছেড়ে দিল। 'কথা দিচ্ছি আপনাকে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তর্ক করার প্রবৃত্তি নেই আমার। কিন্তু পপকিন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে সেটা আমি খুব সহজে মেনে নেব না, কথাটা তাকে জানিয়ে দিয়ো। আমার চেহারা এবং মন বদলের পর থেকে আশপাশে শুধু তোমাদেরকেই দেখছি, সুতরাং এর জন্যে আমি তোমাদেরকেই দায়ী করব। গোটা ব্যাপারটা যদি ব্যাখ্যা করে আমাকে বোঝাতে না পারো তোমরা, বিকল্প পথ খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।' কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না রানা। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

দরজা খুলে লবিতে ঢুকল রানা। সুটকেসের পাহাড় দেখল একধারে। নবাগত বোর্ডারদের কল-কাকলিতে জায়গাটা সরগরম। একদল অল্পবয়সী কিশোর-কিশোরী

ওরা। চঞ্চল প্রজাপতির মত পাখনা মেলে উড়ে যাচ্ছে চারদিকে। এগিয়ে গিয়ে পোর্টারের কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল রানা। পোর্টার বেচারা সারা রাত ডিউটি দিয়েছে, এখনও যন্ত্রের মত কাজ করতে হচ্ছে তাকে। শেষ পর্যন্ত তার চোখ পড়ল রানার উপর।

'থ্রী-সিক্সটি, প্লীজ,' বলল রানা।

'ইয়েস, মি. ফিলাতভ,' হুক থেকে চাবির গোছা নামাচ্ছে পোর্টার।

অবাক বিস্ময়ে একটা মেয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে। ব্যাপারটা লক্ষই করেনি রানা। কিন্তু পেছন থেকে ঠাণ্ডা গলার আওয়াজটা পরিষ্কার কানে ঢুকল ওর, 'ড্যাডি!'

চাবি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে রানা। হঠাৎ দেখল মেয়েটাকে। ওর দিকে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, দেখেই রানা বুঝতে পারল, ড্যাডি বলে ওকেই সম্বোধন করছে মেয়েটা।

দশ

প্রায় আঁতকে উঠল রানা। পিছিয়ে এসে অস্বীকার করতে চাইল যে ও ফিলাতভ নয়, ভুল করেছে মেয়েটা। কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারল অস্বীকার করে কোন লাভ নেই, বিপদ তাতে বাড়বে বৈ কমবে না। নাইট পোর্টার কাছেই রয়েছে, ওর নাম জানে সে। নিজের পরিচয় অস্বীকার করলে মহা গোলমাল বেধে যাবে লবিতে। ভিতর ভিতর ককিয়ে উঠল ওর মনটা। আবার এক অপরিচিতার সাথে একান্ত পরিচিতের ভান করতে হবে। এবার আর প্রেমিকা নয়—আপন কন্যা! পান থেকে চুন খসলে...

ইতোমধ্যে ষোলো সতেরো বছরের মেয়েটা এগিয়ে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে ওর গলা, পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে চুমু খাচ্ছে কপালে। একটা আড়ষ্ট ভাব অনুভব করেই সম্ভবত ওকে ছেড়ে এক পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা। ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে নিষ্পাপ সরল মুখ থেকে হাসিটা। 'বাবা! কি হয়েছে তোমার, বাবা? শরীর খারাপ?'

অপ্রতিভ দেখাচ্ছে রানাকে। হাসতে চেষ্টা করছে। 'না, মানে, হ্যাঁ শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না।'

'অসলোয় তুমি আছ জানতাম; কিন্তু এই হোটেলে আছ তা কল্পনাও করিনি। কিন্তু এত ভোরে কোথাও...?'

ফুটফুটে তাজা ফুলের মত লাগছে মেয়েটাকে। ঢোক গিলল রানা। 'এক বন্ধুর সাথে কথা বলতে বলতে দেরি করে ফেলেছি।'

পরনে মোটরিঙ কোট, দেখে বুঝে নিল রানা, গাড়ি চালিয়ে বহুদূর কোথাও থেকে এসেছে মেয়েটা। সাথে কেউ আছে নাকি? ওর মা? দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল রানা।

'আমার কামরা পেতে আরও অনেক সময় লাগবে,' বলল মেয়েটা। 'তোমার কামরায় চলো, একটু পরিষ্কার হয়ে নিই। চেহারাটা কেমন বিতিকিচ্ছিরি হয়েছে

দেখছ তো?'

বয়স্কা কোন মহিলাকে লবির কোথাও দেখতে পাচ্ছে না রানা। ফিলাতভের বউ এখানে নেই, এটা মস্ত একটা স্বস্তির কারণ। কিন্তু জিভটা একেবারে শুকিয়ে গেছে ওর। জবাব দিতে পারছে না।

বাপকে চুপ করে থাকতে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল মেয়েটার। 'কি হলো, বাবা? এই হোটেলেই আছ তো তুমি নাকি…দুত্তোরি ছাই, নিশ্চয়ই এখানে আছ, তা নাহলে চাবি কেন তোমার হাতে?' জোর করে হাসছে মেয়েটা, বাবা ঠিক কি কারণে এমন আড়ষ্ট ব্যবহার করছে, বুঝে উঠতে পারছে না সে।

'একটা ফোন করতে হবে,' বলল রানা, পা বাড়াল।

'কামরা থেকে করলেই তো পারো!'

'কাজটা সেরেই উঠি ওপরে,' না থেমে বলল রানা। ঘেরা বুদ নেই, মাথার উপর শুধু প্লাস্টিকের হুড। তারই একটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল রানা। আড়চোখে লক্ষ করছে, বাপের সাথে এগিয়ে এসে ছয়-সাত হাত দূরে অধীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে। কেউ ধরছে না রিসিভার। ছয় বার রিঙ হলো। তারপর রিসিভার তুলল কেউ। 'ইয়েস?'

নিচু গলায় বলল রানা, 'পপকিনকে চাই আমি।'

'শুনতে পাচ্ছি না। জোরে বলুন। আপনি কে বলছেন?'

গলা সামান্য একটু চড়াল রানা। 'আমি পপকিনের সাথে কথা বলতে চাই।'

অপর প্রান্তের গলার স্বরে সন্দেহ। 'সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না। তিনি এইমাত্র বিছানায়…'

চাপা স্বরে বলল রানা, 'বিছানায় কি করে তা আমি শুনতে চাই না। তোলো তাকে। আমি রানা বলছি।'

দ্রুত নিঃশ্বাস আটকাবার একটা আওয়াজ পেল রানা রিসিভারে। 'ও. কে।'

দেড় মিনিটের মাথায় অপর প্রান্তে এল পপকিন। উদ্বিগ্ন গলা তার, 'রানা?' সেই সাথে অবিশ্বাসের ছোঁয়া।

'গোলমাল দেখা দিয়েছে। ফিলাতভের…'

পপকিন উত্তেজিত। 'তুমি এই ফোনের নাম্বার পেলে কোত্থেকে?'

'পরে শুনবেন। সমস্যাটা…'

'এক্ষুণি বলো,' গলা কেঁপে গেল পপকিনের। 'কে দিয়েছে তোমাকে এই ফোন নাম্বার?'

'ডাক্তাররা যে কামরায় দেখেছে আমাকে,' বলল রানা, 'ওখানে একটা টেলিফোন আছে। নাম্বারটা মনে রেখেছি।'

'মাই গড!' পাঁচ সেকেন্ড বিরতি নিল পপকিন তারপর অপেক্ষাকৃত কোমল গলায় বলল, 'কোগিন বলছিল তুমি নাকি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক, তার কথা বিশ্বাস করছি এখন। ঠিক আছে, এবার বলো, রানা, কি তোমার সমস্যা?'

'ফিলাতভের এক মেয়ে এসে হাজির হয়েছে। ড্যাডি, ড্যাডি করছে।'

কানের পর্দা ফেটে যাবার অবস্থা হলো রানার, পপকিন আর্তচিৎকার করে

উঠেছে। 'হো-য়াট!'

খবরটা পপকিনের কাছেও বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত, বুঝতে পেরে মুহূর্তের জন্যে খুশি হলো রানা। 'এখন আমি করব কি, তাই বলুন!' চাপা, উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল ও। 'ফিলাতভের মেয়ে আছে, আগে বলেননি কেন? এরপর হয়তো পেছনে চিংড়ি পুঁটিগুলোকে নিয়ে ওদের বুড়ী মা হানা দেবে আমার কামরায়। ক'টা ছেলে-মেয়ে আমার, মি. পপকিন?'

'ও গড! ও গড!' হতচকিত পপকিন। 'এক মিনিট অপেক্ষা করো, রানা।' অস্পষ্ট, বিস্ময় সূচক আওয়াজ পাচ্ছে রানা, পপকিন কথা বলছে কার সাথে যেন। একটু পর খুক্ খুক্ করে কাশল সে। বলল, 'রানা? ওর নাম লরেলি।'

'আর কিছু জানেন না?'

'কিভাবে জানব?' অসহায় ভঙ্গিতে বলল পপকিন।

'কি আশ্চর্য!' রেগে উঠল রানা। 'ওর সাথে কথা বলতে হবে না আমার? ফিলাতভের ভূমিকায় যদি অভিনয় করে যেতে হয়, ওর সম্পর্কে সব জানতে হবে না আমাকে? ও আমাদের মেয়ে!'

'কোথায় সে এখন?'

আড়চোখে তাকাল রানা। আরও এক পা এগিয়ে এসেছে লরেলি। ক্লান্ত মেয়েটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। 'মাত্র ছয় হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার কামরায় যেতে চাইছে।'

'দেখি কি করা যায়,' বলল পপকিন। 'লাইনে থাকো।'

'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!' আবার আড়চোখে তাকাল রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। এগিয়ে আসছে লরেলি। দু'চোখে একরাশ অভিযোগ আর অভিমান।

'লরেলি, মা, খুব ক্লান্ত লাগছে তোমার, বুঝতে পারছি,' বাপের উপযুক্ত একগাল স্নেহের হাসি হাসল রানা। 'তোমার ব্যাগগুলো কোথায়? ওগুলো বরং…'

'এক্ষুণি নিয়ে আসছি,' ছুটে চলে গেল লরেলি।

সড় সড় করে ঘাম নামছে কানের পেছন দিয়ে, অনুভব করছে রানা। লাইনে ফিরে এল পপকিন। 'মার্গারেট লরেলি ফিলাতভ—ফিলাতভের প্রথম পক্ষের মেয়ে ও, একমাত্র মেয়ে।'

'ওর মা বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ, ফিলাতভের সাথে ডিভোর্সের পর আবার বিয়ে করেছে।'

'নাম?'

'প্যাট্রিসিয়া জোয়ান মেটফোর্ড, তার বর্তমান স্বামীর নাম জন হাওয়ার্ড মেটফোর্ড, একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি সে।'

'ফিলাতভের দ্বিতীয় স্ত্রী সম্পর্কে?'

'তার সাথেও ডিভোর্স হয়ে গেছে তিন বছর আগে। নাম ছিল জেনেট ফিলাতভ।'

'লরেলি—পড়াশোনা করে? কোথায়? ওর হবি কি?'

'এসব কিছুই জানি না,' বলল পপকিন। 'ফিলাতভের ডোশিয়ারে এর বেশি কিছু নেই। আসল কথা, ওর মেয়ে সম্পর্কে আমরা তেমন কোন খোঁজ নিইনি।'

'এখন নিন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। শুনুন, মি. পপকিন, শুধু দেশের স্বার্থে আপনার কথামত ফিলাতভের ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছি আমি। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাদের অযোগ্যতা দেখে আমার ইচ্ছে হচ্ছে বেলুনটা ফাটিয়ে দিই।'

'কি!' বিষম খেলো পপকিন। 'ওহ্, নো, রানা! লক্ষ্মী বাপ আমার, আমার সাথে আলোচনা না করে ও ধরনের কিছু করতে যেয়ো না, আই প্লীড টু ইউ! যাই করো, মাই ডিয়ার বয়, কাভারটা নষ্ট কোরো না।' ব্যাকুল আবেদনের সুরে বলল পপকিন।

'আমাকে আমার বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'কেন জানতে চাই। সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা যদি দিতে না পারেন...'

'আজকের দিনটা সময় দাও আমাকে, রানা।' আর্তস্বরে বলল পপকিন। 'কথা দিচ্ছি...'

'এবং ব্যাখ্যাটা যেন আমার গ্রহণযোগ্য হয়,' বলল রানা। 'আবার আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি: এসবের পেছনে আমার মাতৃভূমির বড় কোন স্বার্থ জড়িত থাকলেই শুধু আমি ফিলাতভের ভূমিকায় অভিনয় করে যাব, তা নাহলে...'

'স্বার্থটা বিরাট, রানা,' বলল পপকিন। গম্ভীর গলায় কথা বলছে সে, ভেবেচিন্তে। 'এতবড় একটা ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি, এর প্রতিদান তুমি পাবে। ইসরায়েলের প্রতিটি নাগরিক তোমার নামে জয়ধ্বনি দেবে বিশ্বাস করো। দেশ তোমাকে মাথায় তুলে রাখবে,' বিদ্রোহী রানাকে যা খুশি তাই বলে শান্ত করতে চেষ্টা করছে সে।

'প্রতিদান আমার দরকার নেই, কেউ আমার নামে জয়ধ্বনি করুক তাও আমি চাই না,' জানিয়ে দিল রানা। 'দেশের সেবা করতে পারা ভাগ্যের কথা। ওইটুকুই আমার লাভ।'

'ঠিক আছে বাবা,' পপকিন ঢোক গিলে বলল। 'আজকের মধ্যেই তোমাকে সব জানাবার চেষ্টা করব আমি। ইতিমধ্যে মেয়েটাকে যেভাবে হোক সামলে রাখো।'

'পারব কিনা জানি না।'

'সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করো, তারপর ভাগ্যে যা আছে হবে। মেয়েটার সাথে ফিলাতভের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, এটা একটা ভরসার কথা। যতদূর জেনেছি, মায়ের সান্নিধ্যও খুব একটা পায়নি ও।'

'ও আসছে, এবার যেতে হয় আমাকে,' কথাটা বলে রিসিভার রেখে দিল রানা। বেরিয়ে এল বাইরে।

'কারও সাথে যেন তর্ক করছিলে মনে হলো?' সামনে এসে দাঁড়াল লরেলি। হাতে একটা লেদার ব্যাগ, কাঁধেও ঝুলছে একটা কাপড়ের ব্যাগ।

'তাই মনে হলো বুঝি?' মেয়ের হাত থেকে লেদার ব্যাগটা নিল রানা।

'তুমি একটুও বদলাওনি, আব্বু,' ক্ষীণ একটা অভিযোগ প্রকাশ পেল লরেলির গলার সুরে। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলল না। মুখের চেহারায় একটা অভিমানের ছাপ। 'এই ভোর বেলা, বিদেশ বিভুঁই অসলোতে কার সাথে কথা কাটাকাটি করছিলে বলো তো?'

এলিভেটরের সামনে দাঁড়াল ওরা। একটা বোতামে চাপ দিল রানা। 'বাদ দাও ওসব কথা। কোত্থেকে এলে শোনা যাক।'

'বারজেন। রেন্ট-এ কার নিয়ে এক্সকারশনে বেরিয়েছি। কালকের প্রায় সবটা দিন এবং সারারাত ড্রাইভ করতে হয়েছে। ওহ্, বাবা! আমি যে কি সাংঘাতিক ক্লান্ত।'

মৃদু গলায় জানতে চাইল রানা, 'একাই বেরিয়ে পড়েছ?'

'দুষ্টু আব্বু!' আশা করেনি রানা, লরেলি দুম্ করে ওর পিঠে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল। 'বয় ফ্রেন্ডের খোঁজ নিচ্ছ, না? আব্বু, এসব পরে।' আবদারের সুরে বলল মেয়েটা। 'তোমার কামরায় গিয়েই আগে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দাও। তিনজনের নাস্তা একা খেতে পারব এখন।'

আঁতকে ওঠার কৃত্রিম ভঙ্গি করল রানা চোখ কপালে তুলে।

এলিভেটর থেকে নেমে লরেলি বলল, 'কেন যেন মনে হচ্ছে, আগের বাবা নও তুমি, অনেক বদলে গেছ!' গলার স্বরে খুশির আমেজ।

'বয়স বাড়ছে তো,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'কত বয়স হলো তোমার, বলো তো? হিসাবটা মনে থাকে না...'

'সেই পুরানো আব্বু!' অভিমানে কালো হয়ে গেল লরেলির মুখের চেহারা। 'আমি যে তোমার মেয়ে, একথাটা যদি কোনদিন ভুলে যাও, মোটেও আশ্চর্য হব না!' রানার থতমত চেহারা দেখে নিজেকে সামলে নিল লরেলি। নিচের ঠোঁট কামড়াল সে। 'দুঃখিত, আব্বু। আগামী হপ্তায় আমার জন্মদিন, সতেরোয় পড়ছি।'

'দুঃখ প্রকাশ করার দরকার নেই,' বলল রানা। 'দোষ আমার। সে যাই হোক, যথেষ্ট বড় হয়েছ তুমি, লরেলি—আমাকে আব্বু না বলে আন্তন বললেই তো পারো।'

অবাক হয়ে তাকাল লরেলি বাপের দিকে। বাপের কাছ থেকে চিরকাল অবহেলা আর অযত্ন পেয়ে এসেছে, হঠাৎ এই সম্মান এবং সাবালকত্বের স্বীকৃতি পাবে, ভুলেও কখনও আশা করেনি সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাবার কপালে চুমু খেলো সে।

লক্ষ করল রানা, চোখ দুটো ছলছল করছে মেয়ের।

তালা খুলে কামরায় ঢুকল রানা। 'এটা বেডরুম। সোজা যাও, বা দিকে বাথরুম।'

কাঁধের ব্যাগটা বিছানায় নামিয়ে ছোটখাট কিছু জিনিস বের করে নিয়ে সোজা এগিয়ে গেল লরেলি বাথরুমের দিকে। 'ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেয়ো না কিন্তু! এক্ষুণি আসছি আমি!'

বাথরুমের দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। লরেলির শেষ কথাটার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না রানার। ফিলাতভ মেয়েটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে প্রায়ই ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেত।

বাথরুমে পানির আওয়াজ হচ্ছে শুনে ক্রাডল থেকে রিসিভারটা তুলে নিল রানা। 'রুম থারটি সিক্স, থার্ড ফ্লোর থেকে বলছি। ফিলাতভের নামে কোন মেসেজ—বা যাই কিছু থাকুক—সাথে সাথে পেতে চাই আমি।' রিসিভার রেখে দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা লরেলির লেদার ব্যাগটার দিকে।

বাথরুমে এখনও পানির শব্দ, সেদিকে একটা কান খাড়া রেখে দ্রুত হাতে ব্যাগটা খুলল রানা। সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে ভিতরটা। নীল রঙের ইসরায়েলী

পাসপোর্টটা দেখেই তুলে নিল সেটা, পাতা ওল্টাচ্ছে। লরেলির জন্ম-তারিখ, ২১ জুলাই। ছাত্রী। একটা ট্রাভেলার্স চেক বই পেল। প্রচুর টাকা রয়েছে লরেলির হাতে। একটা এনভেলাপ পেল, তাতে ক্রেডিট কার্ড আর ফটোগ্রাফ রয়েছে। খুঁটিয়ে দেখল না, যে-কোন মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে লরেলি বাথরুম থেকে। ব্যাগের একটা ভিতরের পকেটে হাত গলিয়ে দিল, চাবির একটা গোছা ঠেকল হাতে। পকেটের চেন টেনে বন্ধ করে দিতে যাবে, এমন সময় বাথরুমে পানির শব্দটা থামল। লরেলি যখন বেরোল, আরাম কেদারায় বসে জ্যাকেট খুলছে রানা। 'মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল একবার,' বলল লরেলি।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। 'সে কি!' উঠে দাঁড়াল ও। এগিয়ে গিয়ে একটা হাত ধরল লরেলির। 'বসো। ফোন করব ডাক্তারকে?'

অবাক হয়ে চেয়ে আছে মেয়েটা। হঠাৎ হাসল সে। 'না, আব্বু, তার দরকার নেই। একটানা অনেকক্ষণ গাড়ি চালিয়েছি কিনা, তাই এমন হচ্ছে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে লম্বা একটা ঘুম দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে!'

'কিন্তু ছ'টার আগে তেমন কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না,' চিন্তিতভাবে বলল রানা। 'স্যান্ডউইচ আর কফি আনতে বলি? তারপর সময় হলে ফুল ব্রেকফাস্ট...'

'না, আব্বু। আমি বরং অপেক্ষা করব।'

একটু ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করল রানা। 'তোমার মা কেমন আছে?'

'ভালই তো! সুখেই আছে!' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল লরেলি।

একটু ইতস্তত করে আবার একটা প্রশ্ন করল রানা, 'তোমার স্টেপ ফাদার... মি. মেটফোর্ড কেমন আছেন?'

'শেষবার গত বছর দেখা হয়েছে,' বলল লরেলি। 'পাঁচদিন ছিলাম ওদের কাছে। চারদিনই দু'জনের কেউ বাড়ি ছিল না। মি. মেটফোর্ড তার অফিসে টাকা রোজগার করতে ব্যস্ত, আর মা ব্যস্ত সে টাকা খরচ করার কাজে। মেয়ের সাথে কথা বলবে তার সময় কোথায়!' শেষের দিকে গলাটা ধরে এল ওর।

'হুঁ,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'আমরা সবাই তোমার ওপর অন্যায় করেছি। ঠিক আছে, এসব ভুলে যেতে চেষ্টা করো, লরেলি। এখন থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে, অন্তত আমার তরফ থেকে।' মেয়েটার প্রতি অদ্ভুত একটা সহানুভূতি বোধ করছে রানা। 'ভাল কথা, এখানে আমি আছি তা তুমি জানলে কিভাবে?'

'পরীক্ষার পর স্কুল ছুটি হয়ে গেল, কোথায় যাব ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না, তাই টস্ করলাম। হেড মানে তেল আবিব, টেল মানে লন্ডন। হেড দেখে ফোন করলাম, তখনও অবশ্য মনস্থির করিনি। ভেবেছিলাম তোমার গলার আওয়াজ শুনে আগে বুঝতে চেষ্টা করব তুমি খুশি হবে কিনা। কিন্তু উত্তর পেলাম তুমি নাকি অসলোয়। তাই সোজা চলে এলাম। না এলে ভুলই করতাম,' রানার গালে চুমু খেলো লরেলি। 'আমার আব্বু সে মানুষই নেই আর!'

হাসছে রানা।

'একটা সিগারেট দাও দিকি!' বলেই চোখ রাঙাল লরেলি। 'খবরদার! বারণ করার আগে জেনে রাখো, এ বছরই আমি কলেজে ঢুকতে যাচ্ছি—লরেলি এখন আর

সেই খুকীটি নেই!' বলেই খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। 'এক্সারসাইজ ধরেছ নাকি, আব্বু? শরীরটা আগের চেয়ে যেন মজবুত দেখাচ্ছে?'

'ওটাই যখন যুবক থাকার একমাত্র উপায়,' চোখ মটকে হাসল রানা. 'সে যাক। তোমার আর সব খবর কি শুনতে পারি?'

বাঁ হাত মুঠো করে কিল দেখাল লরেলি। 'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!'

'আহা,' গোবেচারা ভাব করল রানা, 'আমি কি আর শাসন করতে যাচ্ছি তোমাকে? বড় হচ্ছ, আমি শাসন করলেও তো···'

'শোনো তাহলে,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল লরেলি। 'ডেভিড। কলেজ থেকে এই বছরই বেরিয়েছে ও, ফার্স্ট ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে বি. এস. সি তে। স্কলারশিপ নিয়ে চলে যাচ্ছে আমেরিকায়। কোর্স কমপ্লিট করে তেল আবিবে যখন ফিরবে আমি তখন ওখানেরই ভার্সিটিতে পড়ছি। আমার ডিগ্রী নেয়া হলেই দু'জন আমেরিকায় চলে যাব···'

'এত সব ঠিক হয়ে গেছে?'

'আমি কি ছাই জানতাম এসব শুনে তুমি রাগ করবে না!' লরেলি ঝট্ করে উঠে বসল। 'কই, সিগারেট দাও!'

'নেই রে! পাইপ টানবি?'

'গড! সত্যি তুমি বদলেছ, নো ডাউট! থাক তাহলে।'

কথা বলতে বলতে আবার শুয়ে পড়ল লরেলি, এবং একটু পরই তার কাছ থেকে হঠাৎ কোন সাড়া না পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা, ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রানা। জ্যাকেটটা চড়াল গায়ে। লরেলির দিকে একবার তাকাল। হাসি হাসি মুখ, কিন্তু ঘুমাচ্ছে। কাঁধে ঝুলিয়ে নিল কাপড়ের ব্যাগটা। লেদার ব্যাগটা হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল বাইরে।

নিচে নেমে পোর্টারকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ওর মেয়ে লরেলি একটা রুম রিজার্ভ করেছে, চারতলায়, ত্রিশ নম্বর কামরা। চাবিটা চেয়ে নিল ও।

লরেলির রুমে ব্যাগ দুটো রেখে মেঝেতে দাঁড়িয়ে মাথার পেছনটা চুলকাচ্ছে রানা। যে মেয়ে ওকে বাপ ডাকছে তার জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা কি উচিত হবে? কাঁধ ঝাঁকিয়ে আপন মনে হাসল রানা। উদ্দেশ্যটা তো আর খারাপ কিছু নয়, এতে দোষ নেই। আগে দরজাটা বন্ধ করে নিল ও। বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে ব্যাগ দুটো ভাল করে পরীক্ষা করতে শুরু করল। তথ্য তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। ওর—ওর নয়, ফিলাতভের একটা ছবি পেল। একটা খেলনা ভাল্লুক পেল। অনেক দিনের পুরানো, বোঝা যায়। এক কালে এটার রঙ ছিল সবুজ, এখন কালো হয়ে গেছে। কয়েকটা বই পেল রানা। গম্ভীর হয়ে উঠল মুখটা। এ ধরনের বই পড়ার বয়স এখনও হয়নি লরেলির, ভাবল ও, আভাসে হলেও কথাটা ওকে জানিয়ে দিতে হবে।

ব্যাগ দুটো র‍্যাকে তুলে রাখল রানা। দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই পাঁচজনের সামনে পড়ে গেল। গম্ভীর, উদ্বেগে ভারী মুখ। জুনেস্কি, স্টকটন—বাকি তিনজনকে রানা চেনে না। ওকে দেখে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

'কি ব্যাপার?'

উত্তর না দিয়ে সঙ্গীদেরকে নীরব ইঙ্গিত দিল জুনেস্কি। অ্যাবাউট টার্ন হয়ে চারজনই করিডর ধরে দ্রুত চলে গেল। রানার আপাদমস্তক দেখল জুনেস্কি। রাগে ফুলে আছে সে, বুঝল রানা। কিন্তু গ্রাহ্য করল না।

'সঙ সেজে দাঁড়িয়ে আছ কি মনে করে?'

'আপনি আমাদেরকে পাগল করে ছাড়বেন দেখছি,' অতি কষ্টে, অনেকটা বাধ্য হয়ে, নিজেকে সংযত রাখছে জুনেস্কি। 'আমরা ডজন খানেক লোক ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছি, এদিকে প্রতি পদে আপনি আমাদের সাথে অসহযোগিতা করছেন।'

'শেষ হয়েছে লেকচার?' হঠাৎ রক্ত চড়ে গেল রানার মাথায়। 'গলা চড়িয়ে কার সাথে কথা বলছ তুমি? পপকিন কোথায়? যদি কিছু বলার থাকে, তাকে পাঠিয়ে দাও আমার কামরায়,' বলেই জুনেস্কিকে পাশ কাটিয়ে এগোল রানা।

থতমত খেয়ে এক সেকেন্ড সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল জুনেস্কি, পরমুহূর্তে রানাকে দ্রুত অনুসরণ করল সে। 'মি. ফিলা…'

হঠাৎ ব্রেক কষল রানা, চরকির মত আধপাক ঘুরল। জুনেস্কি কিছু বোঝার আগে চটাশ করে একটা চড় বসিয়ে দিল রানা। 'ওই নামে আরেকবার ডাকো আমাকে,' শান্ত, নিরুত্তাপ গলায় বলল ও, 'টেনে ছিঁড়ে নেব জিভটা।'

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না জুনেস্কি। রানা ওকে মেরেছে, আবার বলছে ওর জিভ টেনে ছিঁড়ে নেবে, দুটোই অবিশ্বাস্য লাগছে ওর কাছে। ছয় ফিটের উপর লম্বা, অসুরের শক্তি শরীরে, রুখে দাঁড়ালে যে জুনেস্কির সামনে থেকে আট দশজনের একটা গুণ্ডা দল পালাতে দিশে পায় না, তার গায়ে হাত তুলেছে রানা!

কুঁকড়ে গেছে জুনেস্কি। ভয়ে নয়, একটা সমীহ ভাব অনুভব করছে। 'দুঃখিত, মি. রানা,' ক্ষমা চাওয়ার সুরে বলল সে। 'কিন্তু…আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমরা…

'কার নিরাপত্তা? আমার, না ফিলাতভের?' চাপা কণ্ঠে বলল রানা। 'তোমরা আমাকে কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারছি, হামলা করার জন্যে একটা নয়, বেশ কয়েকটা দল আশপাশে সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে আছে। তাদের লক্ষ্য ফিলাতভ, আমি নই। এবং তোমরা জানো, আমি ফিলাতভ নই। এরা কারা, জানি না। এদের কি উদ্দেশ্য তাও জানি না।' মৃদু হাসল রানা। 'কিন্তু ফিলাতভকে তারা খুন করতে চায় না, এটুকু জানি।'

'জানেন? কি ভাবে…'

'চাইলে অনেক আগেই পারত। স্পাইরালটোপেনের মাথায়, পথে, নিচের লবিতে, করিডরে, জানালা দিয়ে কামরার ভিতর—গুলি করার অনেক সুযোগ পেয়েছে তারা। কিন্তু করেনি। ওরা আমাকে কিডন্যাপ করতে চাইছে। সে যাই হোক, এসব ব্যাপারে তোমরা যতক্ষণ আমাকে সব কথা না জানাচ্ছ, ততক্ষণ আমার কাছ থেকে সহযোগিতা পাবার আশা করতে পারো না।'

'বস্ বলেছেন সম্ভব হলে আজকেই তিনি সব কথা খুলে…' রানা আবার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে জুনেস্কি পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে

ছুটল ওর পিছু পিছু, 'মি. রানা, বস্ এটা আপনাকে দিতে বলেছেন।'

দাঁড়াল রানা। এনভেলাপটা নিল। খুলে ভিতর থেকে বের করল এক শীট কাগজ। কাগজটা টাইপ করা। দ্রুত চোখ বুলাল ও। এনভেলাপসহ কাগজটা মুচড়ে গুঁজে দিল জুনেস্কির হাতে। 'লরেলি সম্পর্কে এখানে যা আছে তার চেয়ে বেশি তথ্য ইতিমধ্যে আমি নিজেই যোগাড় করেছি। পপকিনকে গিয়ে বোলো, ওর সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে চাই আমি।'

পকেট থেকে হাত বের করে মাথা চুলকাচ্ছে জুনেস্কি। 'আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা তো করে যাচ্ছি...'

'পপকিন বলেছিল ফিলাতভের একটা ডোশিয়ার দেবে আমাকে,' বলল রানা। 'সেটার কি হলো?'

'সেটা সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি,' গলা খাদে নামিয়ে ইতস্তত করতে করতে বলছে জুনেস্কি। 'টপ সিক্রেট একটা মিশনে রওনা হবার কথা ছিল ডক্টর ফিলাতভের। তার গুরুত্ব কতটা...মানে, তার সম্পর্কে একমাত্র বস্ ছাড়া আমরাও কেউ তেমন কিছু জানি না।'

'তার মানে তোমাদেরকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করা হচ্ছে না?'

সায় দিয়ে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল জুনেস্কি। 'জ্বী জ্বী।' উৎকণ্ঠিত। 'এই তো ঠিক বুঝেছেন ব্যাপারটা। সিকিউরিটি বলে একটা কথা আছে তো। এতই টপ সিক্রেট ব্যাপার যে...'

জুনেস্কির কথা কেড়ে নিয়ে বলল রানা, 'আমাকেও জানানো চলে না—এই বলতে চাইছ?' ঝট করে একটা হাত তুলে জুনেস্কির শার্টের কলার মুঠো করে ধরে তীব্র এক ঝাঁকুনি দিল রানা। 'গরু! ঘাস খেয়ে মাথায় শুধু গোবর জমা করেছ। সিকিউরিটি? আমিই তো এখন তোদের একমাত্র সিকিউরিটি!' আরেকটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিল ও জুনেস্কির শার্টের কলার। 'মনে থাকে যেন, এই কথাটা পপকিনের কানে ওঠা চাই।' বলে আর দাঁড়াল না রানা।

বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে জুনেস্কি। হতভম্ব হয়ে গেছে সে। একটা বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে উঠছে চেহারায়।

নিজের কামরায় ঢুকে নিঃশব্দে বন্ধ করল রানা দরজাটা। পেছন ফিরে দেখল মেয়েটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ছোট্ট হয়ে শুয়ে আছে। হাত দুটো কনুইয়ের কাছে ভাঁজ করা, মুঠো পাকানো, মুঠো দুটো গলার কাছে পড়ে আছে। বালিশ থেকে নেমে গেছে মাথা, লক্ষ করে এগোল রানা। বিছানায় বসে দু'হাত দিয়ে লরেলির মাথাটা ধরে আলতো ভাবে তুলতে চেষ্টা করছে।

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল লরেলি।

থতমত খেয়ে হাত দুটো কোলের উপর টেনে নিল রানা।

'আব্বু!' রানার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে লরেলি। অবিশ্বাস্য কিছু যেন ধরা পড়েছে তার চোখে। 'তুমি...।' কথা বলতে পারছে না মেয়েটা। বিস্ময়টা প্রচণ্ড একটা ধাক্কা, প্রায় আঘাত হয়ে লেগেছে ওকে।

অবস্থা খারাপ রানার। লাল হয়ে উঠেছে মুখটা। কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না, আমতা আমতা করছে। 'আমি...মানে...লরেলি তুমি...মানে...'

বিস্ফারিত চোখে দেখছে রানাকে লরেলি। হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়ে বসল সে। 'আব্বু!' চিৎকার করে উঠেই সে উন্মাদিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। হাউমাউ করে কাঁদছে। ফুলে ফুলে উঠছে পিঠটা।

ঢোক গিলছে রানা। স্রেফ বোকা বনে গেছে। ঠিক কি যে ঘটছে, বুঝছে না। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করবে কিনা ভাবছে, এমন সময় ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল লরেলি, 'তোমার কাছে কি অপরাধ করেছিলাম আমি, আজও জানি না। মাকে তুমি ঘৃণা করতে, তার কারণটা বড় হয়ে বুঝেছি। কিন্তু সেই ছোট বেলা থেকে আমাকেও তুমি ঘৃণা করে এসেছ…না, অস্বীকার কোরো না, বাবা! আমি জানি, তা তুমিও জানো? জেনেও দয়া হয়নি তোমার। কখনও কাছে ডেকে দুটো আদরের কথা বলোনি। কিন্তু আজ তোমার এই পরিবর্তন…মনে আছে, সিঁড়ি দিয়ে পড়ে হাঁটুর চামড়া ছিঁড়ে ফেলেছিলাম একবার। ইস্! সে কি রক্ত। আমি তবু কাঁদিনি। কিন্তু তুমি যখন রেগে চড় মারলে, চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলাম। তুমি আমার সেই বাপ! আজ আদর করে বালিশে মাথা তুলে দিচ্ছ—দেখেও কিভাবে বিশ্বাস হয়, বলো?'

কখন থেকে জানে না রানা, নিজের অজান্তে লরেলির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করেছে ও। 'বয়স হলে মানুষ বদলায়, লরেলি। বুড়ো খোকা তাই অন্যায় আচরণের জন্যে অনুতপ্ত। তাকে ক্ষমা করে দেয়া হোক। তুমি কি বলো?'

রানার বুক থেকে মুখ তুলল লরেলি। ফর্সা মুখটা লাল, চোখের পানিতে ভিজে। হাসছে। 'আমি বলি, আমার বাবা কোনদিন আমার সাথে অন্যায় আচরণ করেনি। তাই ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না। বাবা আমাকে চিরকালই ভালবাসত, কিন্তু দুষ্টু বাবা তা জানতে দিতে চায়নি, পাছে লাই পেয়ে মাথায় চড়ে বসি…'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল রানা, ওর সাথে হেসে উঠল লরেলিও।

হঠাৎ বন্ করে ঘুরে উঠল মাথাটা। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরই আবার সুস্থ বোধ করল রানা। রাত জাগার ফল বুঝি! ভাবল ও। দরজার দিকে তাকাল একবার। নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হচ্ছে। পপকিন আর তার চ্যালা চামুণ্ডাদের উপর ভরসা কি! ওদের কড়া পাহারার নমুনা যে কি ফিলাতভই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাকে সরিয়ে ফেলে আরেক লোককে রেখে যাওয়া হয়েছে, ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। ও যদি নিজেকে মাসুদ রানা বলে দাবি না করত এখনও কিছু জানা হত না ওদের। একদল গরু, ঘাস খায়।

পরবর্তী কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে রানা। আজকের দিনটা শেষ সুযোগ হিসেবে দান করতে যাচ্ছে ও পপকিনকে। সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা যদি সে না দিতে পারে, সোজা জেনেভায় চলে যাবে ও, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির সামনে হাজির করবে নিজেকে। অথবা কাউকে কিছু না জানিয়ে সোজা চলে যাবে তেল আবিবে। নিজের পরিচয় নিজেই তদন্ত করে বের করার চেষ্টা করবে। জানতে হবে, ওর এই দুর্দশার জন্যে কে দায়ী। যে বা যারাই দায়ী হোক, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য যদি গ্রহণযোগ্য হয়, ভাল। আর তা যদি না হয়, দেখে নেবে ও।

সেই সাথে একটা কৌতূহল নিবৃত্ত করার চেষ্টা করবে ও। জানতে চেষ্টা করবে ফিলাতভ কোথায়।

লরেলির জন্যে দুঃখ বোধ করছে। খানিক আগে রেখে এসেছে তাকে তার কামরায়। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বেড়াতে যাবে ওর সাথে। তার সব আবদার এখন রক্ষা করে যেতে হবে ওকে।

'চ্রিক, চ্রিক!' ঝট করে জানালার দিকে তাকাল রানা। হঠাৎ মাথাটা বন্ করে ঘুরে উঠল আবার, তবে দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, নিচের দিকে তাকাতেই কয়েকটা চড়ুই পাখিকে সভায় বসে থাকতে দেখল কার্নিসের উপর। আরও নিচে বাগান। ফুল ফুটেছে। রাত পোহাচ্ছে।

ব্যথা শুরু হলো মাথায়। 'ইশ্, তেল আবিবে আবার যদি ফিরে যেতে পারতাম, আবার যদি সব মনে করতে পারতাম,' স্বগতোক্তি করল ও। 'গড হেলপ মি!' বাড়ছে মাথা ব্যথাটা। ঘুরছে। একটা আচ্ছন্ন ভাব অনুভব করছে ও। হঠাৎ দ্রুত হয়ে উঠছে সময়ের প্রবাহ। নেশা করলে এমন হয়। সব কিছু বড় তাড়াতাড়ি ঘটে যাচ্ছে। সাবধান হতে চাইছে রানা, কিন্তু সময়ের সাথে পেরে উঠছে না। ধীরে ধীরে একটা আচ্ছন্ন বোধ গ্রাস করতে চাইছে ওকে। 'চ্রিক, চ্রিক!' চড়ুই পাখিগুলো কান ঝালাপালা করে ছাড়ল। বাগানে ফুল। 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল···' হঠাৎ মনের মধ্যে বাজতে শুরু করল একটা মিষ্টি কবিতার কলি।

বিপদটা টের পেয়ে গেল রানা। সম্মোহিত হয়ে পড়ছে ও। যান্ত্রিক সাজেশনের মত কানে বাজছে, 'কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল···'

টলছে রানা। ইতোমধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মাতালের মত এদিক যাচ্ছে, ওদিক যাচ্ছে···একটু একটু করে এগোচ্ছে বিছানার দিকে। পৌঁছতে পারবে? কিভাবে যেন জানতে পেরেছে ও, গভীর হিপনটিক ট্রান্স সোমনামবুলিজমে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে।

থরথর করে কাঁপছে শরীর। ঘামে ভিজে গেছে মুখ। হাঁপাচ্ছে। আছাড় খেয়ে পড়ে গেল সে বিছানার উপর। তারপর চলে গেল স্বপ্নের জগতে।

কাঁচাপাকা একজোড়া ভুরু দেখতে পাচ্ছে রানা। সুন্দরভাবে সাজানো একটা কামরা। তীক্ষ্ণ চেহারার এক বৃদ্ধ। ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছেন একটা পিঠ উঁচু রিভলভিং চেয়ারে। চেয়ে রয়েছেন ওর চোখের দিকে।

'ওঠো শিশু মুখ ধোও পরো নিজ বেশ, আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ' গম্ভীর কণ্ঠস্বর। আবৃত্তি করছেন ভদ্রলোক, প্রতিটা শব্দ গেঁথে যাচ্ছে মনের গভীরে।

স্বপ্নটা কতক্ষণ ধরে দেখেছে রানা, তারপর কতক্ষণ গভীর ভাবে ঘুমিয়েছে, কিছুই বলতে পারবে না ও। ঘুম ভাঙল মুহুর্মুহু করাঘাতের শব্দে।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল সে। হঠাৎ ঘুম ভাঙলেও অদ্ভুত একটা প্রশান্তিতে ভরে রয়েছে মন এবং শরীর, অনুভব করল ও। কানে এখনও বাজছে আবৃত্তির সুরটা, 'ওঠো শিশু মুখ ধোও, পরো নিজ বেশ, আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।' কি মিষ্টি ভাষা! ভাবল ও। মুচকি একটু হাসল আপন মনে। সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ ঝরে গেছে শরীর থেকে। শূন্যে ডানা মেলে দেয়া মুক্ত বিহঙ্গের মত হালকা লাগছে নিজেকে। জীবনটা যেন নতুন একটা তাজা গোলাপ ফুল।

এগারো

দু'বার পড়ল পপকিন টেলিগ্রামটা। বোধগম্য হচ্ছে না। হেড অফিস ঠাট্টা করছে, নাকি এটা তাদের ভুলের একটা নমুনা? ভুরু কুঁচকে হাতের টেলিগ্রামটার দিকে তাকাল আবার: উত্তর দিতে এত দেরি হবার কারণ কি? কোগিনের রিপোর্ট পাঠাচ্ছ না কেন?

কিসের উত্তর চাইছে হেডকোয়ার্টার? শেষবার তারা যে নোট পাঠিয়েছিল তাতে নির্দেশ ছিল: অপেক্ষা করো। পরবর্তী নির্দেশ যাচ্ছে।

কোথায় সেই পরবর্তী নির্দেশ? নির্দেশ না দিয়ে উত্তর চাইছে। এর মানে কি? তারপর—কোগিনের রিপোর্ট বলতে কি বোঝাতে চাইছে?

কোগিনের এখন লন্ডন থাকার কথা। হেডকোয়ার্টারের কর্তা ব্যক্তিরা জানে না, জানার কথা নয়, পপকিন তাকে ব্যক্তিগত মেসেজ পাঠিয়ে অসলোয় আনিয়েছে। তাহলে? কোগিনের প্রসঙ্গ তুলছে কেন? কি রিপোর্ট দেবে সে?

ডেস্কের বাঁ পাশে তিনটে টেলিফোন। সেদিকে তাকাল পপকিন। এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। দরজার দিকে চোখ তুলল। ইন্টারকমের দিকে বাড়িয়ে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে নিল হাতটা। সন্দেহ ঢুকেছে মনে। অন্তরাত্মা কেঁপে গেল পপকিনের। চোখ দুটো বিস্ফারিত। অসম্ভব একটা কল্পনা, কিন্তু সত্যি হতেও পারে।

নির্দেশ হয়তো এসেছে। হয়তো তারই প্রেক্ষিতে উত্তর চাইছে হেড অফিস। হয়তো সেই নির্দেশনামাতেই কোগিনকে কোন ব্যাপারে রিপোর্ট তৈরি করে পাঠাতে বলা হয়েছে। কিন্তু সেই নির্দেশপত্র ওর হাতে পৌঁছায়নি।

দরদর করে ঘামছে পপকিন। সন্দেহটা যদি সত্যি হয়, সর্বনাশ হতে বাকি নেই কিছু। যা ক্ষতি তা তো হয়েছেই, তারচেয়ে বড় কথা, দূতাবাসে বিশ্বাসঘাতক রয়েছে কেউ, তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

গলা শুকিয়ে গেছে পপকিনের। ঢোক গিলে ইন্টারকমের সুইচ অন করল। 'এক গ্লাস পানি। আর জুনেস্কিকে বিশ সেকেন্ডের মধ্যে আসতে বলো। জরুরী।'

চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করল পপকিন। হার্টবিট বেড়ে গেছে ওর। অসহ্য অস্থিরতা বোধ করছে। ভাবছে: সম্ভব? টপ্ সিক্রেট চিঠিপত্র সব ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে আসে। আসার পথে খোয়া যাবার প্রশ্নই নেই। দূতাবাসে পৌঁছাবেই। আর দূতাবাসে পৌঁছলে তা হারিয়ে যেতে পারে না। একটা পিন পর্যন্ত হারাবার উপায় নেই, কখনও হারায়নি। না হারাতে পারে না। চুরি? হ্যাঁ।

কে?

নক হলো দরজায়। জবাব দিল না পপকিন। চেয়ারে গিয়ে বসল। বাক্স থেকে চুরুট টেনে নিয়ে ধরাচ্ছে। কামরায় ঢুকে দরজাটা এক হাতে বন্ধ করছে জুনেস্কি। ঘুরে দাঁড়াল। হাতে পানি ভর্তি গ্লাস। এগিয়ে আসছে।

টেলিগ্রামটা ওর দিকে ছুঁড়ে মারল পপকিন। বলল, 'পড়ে দেখে বলো এর অর্থ

কি!’

উড়ে এসে জুনেস্কির পায়ের কাছে পড়েছে কাগজের টুকরোটা। নিচু হয়ে তুলে নিল সেটা। এগিয়ে এসে ডেস্কের উপর গ্লাসটা রাখল। বসের দিকে তাকাল একবার। চুরুট ধরাচ্ছে। দৃষ্টি এড়াল না, হাত দুটো কাঁপছে তার।

বুকটা দুরু দুরু করে উঠল জুনেস্কির। সাংঘাতিক কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। চোখের সামনে তুলল টেলিগ্রামটা।

প্রথম লাইনটাই ঘোল খাইয়ে দিল জুনেস্কিকে। মুখ তুলে আরেকবার তাকাল বসের দিকে। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে দেখে দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিল।

দ্বিতীয় বাক্যটি পড়ছে জুনেস্কি। বরফের নিষ্প্রাণ মূর্তি হয়ে গেছে যেন সে।

প্রচণ্ড এক ধমকের ধাক্কায় সেই বরফ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবার উপক্রম হলো। ‘চুপ করে আছ কেন? কি বুঝলে বলো!’

মুখ তুলল জুনেস্কি। বেকুব দেখাচ্ছে তাকে। ‘মনে হচ্ছে একটা প্রশ্ন করেছিল ওরা, যার উত্তর পায়নি, স্যার।’

‘কি প্রশ্ন? কোথায় সেই প্রশ্ন?’ হুড়মুড় করে কয়েকটা প্রশ্ন বেরিয়ে এল পপকিনের অধৈর্য কণ্ঠ থেকে। ‘কাকে করেছে? কবে করেছে? জানো কিছু?’

এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে জুনেস্কি।

‘তুমি জানো না! আমিও জানি না! কে জানে, জুনেস্কি?’

প্রশ্নটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে ঢোক গিলল জুনেস্কি। ‘সব চিঠিপত্র মিস এলিজার কাছ থেকে নিয়ে এসে আমিই আপনাকে দিই—কিন্তু, স্যার, সে নিশ্চয়ই এই চিঠিটা দেয়নি আমাকে।’ টেলিগ্রামটা আরেকবার পড়ল সে। ‘প্রশ্ন দেখে মনে হচ্ছে…হ্যাঁ, একটা চিঠি এসেছে, কিন্তু সেটা আমাদের হাতে পড়েনি।’ ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল সে। ‘স্যার, সব চিঠি আপনার ড্রয়ারেই তো রাখি। দেখেছেন ভাল করে? আপনি যখন লন্ডনে ছিলেন…’

‘দেখেছি। নেই।’

‘আমি একবার দেখব?’

মাথা হেলিয়ে অনুমতি দিল পপকিন। ডেস্ক ঘুরে গিয়ে রিভলভিং চেয়ারটার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল জুনেস্কি। ধীরে ধীরে টান দিয়ে দেরাজটা বের করল, নামিয়ে রাখল কার্পেটের উপর। তারপর দেরাজ থেকে ফাইল আর এনভেলাপগুলো নামাতে শুরু করল।

‘ওসব আমি দেখেছি,’ বলল পপকিন। ‘মিস এলিজাকে ডেকে জিজ্ঞেস করব?’

মুখ তুলে বসের দিকে তাকাল জুনেস্কি। চোখের কোণে সাদা মত কি যেন ধরা পড়ল তার। ‘আগে বরং খুঁজে দেখি…’ উত্তরটা দেবার ফাঁকেই এইমাত্র ডেস্কের যেখান থেকে দেরাজটা নামিয়েছে সেই ফোকরে হাত চালিয়ে দিয়েছে জুনেস্কি। কি যেন চোখের কোণে ধরা পড়েছিল একটা ওদিকে। ড্রয়ারের ওপর চায়ের কাপ রাখার যে তক্তাটা, টানলে বেরিয়ে আসে, তারই ফাঁকে আটকে রয়েছে। কাঠের খরখরে গা, এর মধ্যে মসৃণ কি যেন ঠেকল আঙুলের ডগায়। টেনে বের করল জিনিসটা। একটা এনভেলাপ। চোখের সামনে তুলেই দেখতে পেল বড় বড় অক্ষরে লাল কালিতে লেখা: টপ সিক্রেট। ‘এই তো পেয়েছি, স্যার!’ প্রায় লাফ দিয়ে সিধে

হয়ে দাঁড়াল জুনেস্কি।

'দেখি.' রিভলভিং চেয়ারের একদিকে কাত হয়ে পড়ল পপকিনের শরীরটা। ব্যগ্র হাতে জুনেস্কির হাত থেকে নিল এনভেলাপটা।

দ্রুত খোলা হলো এনভেলাপ। ডেস্ক ঘুরে ওপাশের চেয়ারে গিয়ে বসল জুনেস্কি। কয়েকটা কাগজের শীট বেরোল এনভেলাপ থেকে। ডেস্কের উপর সেগুলো বিছাল পপকিন। ঝুঁকে পড়ল এক নম্বর কাগজটার উপর। টাইপ করা একটা চিঠি। বাংলা করলে দাঁড়ায়:

টপ সিক্রেট তারিখ···

বিষয়: অপারেশন এক্স-রে

ক) ডক্টর আনাতোলি পপোভিচ ফিলাতভের বিকল্প পাঠানো হচ্ছে।

খ) আসল ডক্টর আনাতোলি পপোভিচ ফিলাতভকে তেল আবিবে আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে।

গ) অপারেশন এক্স-রে মিশন অপরিবর্তিত থাকবে।

ব্যাখ্যা:

ক) আগের পরিকল্পনায় ছিল ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে ফিনল্যান্ডে যাবে তুমি। এখন আসল ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে নয়, নকল ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে ফিনল্যান্ডে যাবে। ওখানে ডক্টর ফিলাতভের যে কাজ ছিল তা নকল ফিলাতভকে দিয়ে করাবে। এরপর তাকে অন্য কোন দিকে পাঠিয়ে দেবে। সাথে থাকবে তোমার কয়েকজন যোগ্য লোক। নিঃসন্দেহে শত্রুপক্ষরা ওকে অনুসরণ করবে। সেই ফাঁকে আসল ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে তুমি তোমার আসল কাজ উদ্ধার করবে।

এই নকল ফিলাতভের আসল পরিচয় নিচে দেয়া হলো। দেশের দোহাই দিয়ে এর কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া সহজ হবে। নিজেকে ও মাসুদ রানা এবং ইসরায়েলী হিসেবে জানে। বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসটা যাতে কোন মতে না ভাঙে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। একে দিয়ে যতটা সম্ভব কাজ উদ্ধার করে নেবে, এবং প্রয়োজন ফুরালেই বিনা দ্বিধায় হত্যা করবে।

খ) আসল ডক্টর ফিলাতভ আপাতত আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকছে। নকল ফিলাতভকে ডাইভারশনে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি প্রথমে নিশ্চিত হবে শত্রুপক্ষের সকলের নজর ওর উপর পড়েছে কিনা, এবং তারা ওকে অনুসরণ করতে শুরু করেছে কিনা। নিশ্চিত হয়ে তুমি আমাদেরকে সিগন্যাল পাঠালেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে আসল ডক্টর ফিলাতভকে।

গ) আসল ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে তুমি আমাদের অরিজিন্যাল প্ল্যান অনুযায়ী রওনা হয়ে যাবে অপারেশন এক্স-রে মিশনে।

নকল ফিলাতভের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

ওর নাম মাসুদ রানা। বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষতম স্পাই। ইসরায়েলের পরম শত্রু। এরই মধ্যে বিপুল ক্ষতি করেছে আমাদের। এ লোক সুযোগ পেলে একের পর এক

আরও অনেক ক্ষতি করবে। ইসরায়েলের এত বড় শত্রু খুব কমই আছে। মাসুদ রানার চেহারা বদল করার সাথে সাথে ওর অতীত স্মৃতি কেড়ে নেয়া হয়েছে। নিজের নাম, ছোটবেলার একটা স্মৃতি, স্মৃতি হারাবার ঠিক আগের দিনের কিছু আংশিক ঘটনা, এবং নিজের চেহারা ছাড়া কিছুই মনে নেই ওর। যাতে পাগল হয়ে না যায় তাই কিছু কিছু স্মৃতি ওর মনের পর্দা থেকে মুছে ফেলা হয়নি। এবং ওর ইচ্ছা শক্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্য কিছু ভুয়া স্মৃতি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ওর মনে।

জীবনে কখনও স্মৃতি ফিরে পাবার প্রায় কোন সম্ভাবনাই ওর নেই। লন্ডন থেকে সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর কোগিনকে আনিয়ে নাও যদি দেখো আমাদের পোস্ট হিপনোটিক সাজেশন দুর্বল হয়ে আসছে, তাহলে কোগিনকে দিয়ে আবার ওর ব্রেন ওয়াশ করিয়ে নাও এবং রিপোর্ট করো।

বি: দ্র:

মাসুদ রানা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ভয়ঙ্কর লোক। বাতাসে বিপদের গন্ধ পায়। সুতরাং সাবধান। যা করবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করবে।

[৪, ৫ এবং ৬নং পৃষ্ঠায় মাসুদ রানার পূর্ণাঙ্গ ডোশিয়ার দেয়া হলো]

'ব্রেন একটা!' চিঠি থেকে মুখ তুলে বলল পপকিন। শেষ তিনটে পাতা রেখে বাকিগুলো বাড়িয়ে দিল জুনেস্কির দিকে। 'পড়ে দেখো।'

রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলল জুনেস্কি চিঠিটা। মুখ তুলে দেখল সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বস্, গভীরভাবে চিন্তান্বিত। বুঝল, যা ঘটেছে এবং ঘটতে যাচ্ছে সব খাপে খাপে মিলিয়ে নিচ্ছে সে।

আপন মনে মাথা নাড়ল পপকিন। 'ব্রেন একটা...' আবার বলল সে। তাকাল জুনেস্কির দিকে।

কার বুদ্ধির প্রশংসা করা হচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না জুনেস্কির। বসের বস্ সম্পর্কে এই প্রশংসাবাণী। একটা হাঁফ ছেড়ে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সে। বলল, 'যাক, বাঁচা গেল। সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'রানা কোথায়?' জানতে চাইল পপকিন।

'ঘুমাচ্ছে।'

'মেয়েটা?'

'সে-ও ঘুমাচ্ছে, নিজের কামরায়।'

'হাতের কাজ সেরে আধঘণ্টার মধ্যে রওনা হচ্ছি আমরা,' বলল পপকিন। 'রানাকে ব্যাখ্যা দিতে এখন আর কোন অসুবিধে নেই। জুলি হোটেলেই যোগ দেবে আমাদের সাথে।'

'কতটা বলবেন রানাকে, স্যার?'

'যতটুকু না বলে পারা যায়,' বলল পপকিন। গম্ভীর।

দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। উঠে বসে চোখ কচলাচ্ছে। জুলি নাকি? বিছানা থেকে নেমে বাথরোবটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে এগোল দরজার দিকে।

দরজা খুলে পপকিনকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। হাসি হাসি মুখ।

'ঘুম ভাঙাবার জন্যে দুঃখিত,' মুখের হাসিতে দুঃখের ছিটেফোঁটাও নেই পপকিনের। 'কিন্তু তোমাকে আর অন্ধকারে রাখতে চাই না...'

ঘুম জড়ানো চোখ দুটো পিট পিট করছে রানার। 'কাম ইন,' বলে ঘুরে দাঁড়াল ও, সোজা হেঁটে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

পপকিন, তার পেছনে জুনেস্কি, এবং সবশেষে কামরায় ঢুকল জুলি। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। জুলি এবং জুনেস্কিকে দেখে একটু অবাক হলো। কিন্তু কিছু বলল না।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পপকিন। পর্দা সরিয়ে রোদ ঢোকার পথ করে দিয়ে রানার দিকে ফিরল সে। এগিয়ে এসে টেবিলে একটা এনভেলাপ রাখল। 'মেয়েটা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য,' বলল সে। 'তোমার অসুবিধে দূর করার জন্যে কয়েকজন লোক অক্লান্ত পরিশ্রম করছে, শীঘ্রিই ওর সম্পর্কে আরও তথ্য আশা করছি আমি।'

'অসুবিধে আমার নয়, আপনাদের,' বলল রানা। তোয়ালেটা একটা চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রাখল। তাকাল পপকিনের দিকে। 'নিন, শুরু করুন। গোটা ব্যাপারটার ব্যাখ্যা চাই আমি।'

একটা চেয়ারের দিকে আঙুল তুলল পপকিন। 'আরাম করে বসো, রানা,' বলল সে। বসল দ্বিতীয় চেয়ারটায়। 'অনেক কথা, বলতে সময় লাগবে।' চুরুট ধরাচ্ছে।

বিছানার কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসল জুলি। কামরায় ঢোকার পর থেকে একটাও কথা বলেনি সে। কয়েকবার তার দিকে তাকিয়েছে রানা, কিন্তু মুখের ভাব দেখে নির্বিকারই মনে হয়েছে তাকে।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জুনেস্কি। হাসি নেই মুখে। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে কেমন একটা সতর্ক ভাব।

এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল পপকিন। সামনে বসা রানার চোখে চোখ রাখল। 'ঠিক কি জানতে চাও তুমি, রানা? তুমি বরং প্রশ্ন করো, আমি উত্তর দিয়ে...'

'কে আমি?' পপকিনকে থামিয়ে দিয়ে প্রায় উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল রানা।

'তুমি আমাদের লোক। একজন ইহুদি। বর্তমানে ইসরায়েলের নাগরিক...'

আবার বাধা দিল পপকিনকে রানা। অধৈর্য কণ্ঠে বলল, 'ফালতু প্যাচাল! আমি ইহুদি, ইসরায়েলের নাগরিক—এসবই তো আমার জানা আছে! আমি জানতে চাই—কে আমি? আমার পেশা কি? কেন আমার চেহারা বদল করা হয়েছে? স্মৃতি কেড়ে নেয়া হয়েছে আমার—কেন? আপনাদের আসল উদ্দেশ্য কি? এবং শেষ পর্যন্ত কি হতে যাচ্ছে আমার অবস্থা?'

জুনেস্কির দিকে চট্ করে একবার তাকাল পপকিন। সকলের অলক্ষ্যে কি যেন একটা ভাবের বিনিময় ঘটে গেল দু'জনের মধ্যে।

'তুমি একজন স্পাই, রানা,' রানার চোখে চোখ রেখে বলল পপকিন। 'জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশন্যালের একজন দুর্ধর্ষ এজেন্ট।' মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। 'আমাদের গর্ব। দেশের কৃতি সন্তান।'

জুনেস্কির ঠোঁটে এক চিলতে বাঁকা হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখটা জুলির। রানার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে। হঠাৎ যেন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সে, উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে মুখের চেহারা।

কোন প্রতিক্রিয়া নেই রানার চেহারায়। 'থামলেন কেন, বলে যান।'

'তোমার মা বাবা মারা গেছেন। ভাই বোন ছিলই না। আত্মীয়-স্বজনও নেই।'

'সুতরাং তাদের সম্পর্কে আমার কোন কৌতূহলও নেই,' নীরস গলায় বলল রানা। 'আমার স্মৃতি কেন কেড়ে নেয়া হয়েছে?'

'সে দীর্ঘ এক কাহিনী। সংক্ষেপে বলছি।' চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না দেখে নিরাশ হলো পপকিন। টেবিলে রেখে দিল চুরুটটা। মুখ তুলল। 'গোটা ব্যাপারটাই একটা ভুলের পরিণতি। আমাদেরই একটা শাখা প্রতিষ্ঠান তাদের বিশেষ একটা অ্যাসাইনমেন্টের স্বার্থে তোমাকে ধার নিয়েছিল। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সাহায্যে তোমাকে ওরা কিছু পোস্ট হিপনোটিক সাজেশন দেবার ব্যবস্থা করে। সেই সাইকিয়াট্রিস্ট কাজটা করতে গিয়ে মারাত্মক একটা ভুল করে বসে, যার ফলে তুমি তোমার প্রায় সবটুকু অতীত স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছ।' কিছু বলতে যাচ্ছে রানা, তাই দেখে হাত তুলে তাকে বাধা দিল পপকিন। 'তার এই ভুলের জন্যে তাকে ক্ষমা করা হবে না, রানা। তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

রানার মুখের ভাবে এখনও কোন পরিবর্তন নেই। পপকিনের ব্যাখ্যা বিশ্বাস করছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। জুনেস্কির ভুরু কুঁচকে উঠেছে। একটা অস্বস্তি অনুভব করছে সে।

'হুঁ,' অনেকটা ব্যঙ্গের সুরে বলল রানা। 'আর চেহারা বদলের ব্যাখ্যাটা?'

'এর মধ্যে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে হঠাৎ তোমাকে আমাদের নিজেদেরই দরকার হয়ে পড়ল,' বলল পপকিন। 'খুব জরুরী একটা অ্যাসাইনমেন্ট, হাতে সময় খুব কম। ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে একটা মিশনে যাবার কথা আমার। হঠাৎ জানা গেল, ডক্টরের পেছনে ফেউ লেগেছে, তাকে কিডন্যাপ করার ষড়যন্ত্র চলছে। হেডকোয়ার্টারকে জানালাম ব্যাপারটা। তারা আমাকে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করতে বলল। এবং, তাড়াহুড়োর মধ্যে চেহারা বদলে তেল আবিব থেকে পাঠিয়ে দিল তোমাকে। এবং ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে চলে গেল নিরাপদ আশ্রয়ে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ডক্টর ফিলাতভের ওপর থেকে শত্রুদের নজর তোমার ওপর সরিয়ে আনা। তুমি একজন দুর্ধর্ষ স্পাই, ওদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার যোগ্যতা শুধু তোমারই আছে। সেজন্যেই বেছে নেয়া হয়েছে তোমাকে।' একটু বিরতি নিয়ে গলার স্বরে আন্তরিকতা ফোটাবার চেষ্টা করল পপকিন। 'কিন্তু তাই বলে ভেব না যে তোমার স্মৃতিভ্রংশের ব্যাপারটাকে অবহেলা করা হচ্ছে। এই অ্যাসাইনমেন্টটা শেষ হয়ে গেলেই দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা সাইকিয়াট্রিস্টের সাহায্যে চিকিৎসা করা হবে তোমার। আবার সব কথা মনে করতে পারবে তুমি। শুধু তাই নয়, প্লাস্টিক সার্জারিরও ব্যবস্থা করা হবে, যাতে আবার আগের চেহারা, আসল চেহারা ফিরে পাও। সব পরিষ্কার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে রানা। 'এসব কিছুই আমি বিশ্বাস করছি না,' বলল ও। 'কিংবা অবিশ্বাসও করছি না। আপনি যা বলছেন, শুনে যাচ্ছি শুধু। সত্যি না মিথ্যা প্রমাণ বা যাচাই করার কোন উপায় নেই এই মুহূর্তে আমার বা আপনার।

প্রথমে আমাকে রানা বলে মানতেই চাননি। এখন আবার নিজেরাই স্বীকার করছেন আমি মাসুদ রানা। যারা এত ঘন ঘন মত পাল্টায় তাদের কথার দাম দেয়া যায় না। ভাল কথা, এত নাটক না করে এসব কথা আমাকে আরও আগেই জানানো হয়নি কেন?'

'আমরা নিজেরাই জানতাম না,' বলল পপকিন। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে তার কপালে। রানার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তাকে অত্যন্ত সাবধানে, চিন্তাভাবনা করে দিতে হচ্ছে। 'তেল আবিব থেকে সব কথা জানিয়ে চিঠি লেখা হয়েছিল, কিন্তু সেটা আমরা দেরিতে পেয়েছি।'

পায়ের উপর পা তুলে দিল রানা। আগের মতই গম্ভীর। 'ইন্টারেস্টিং, সন্দেহ নেই। শুনতে ভালই লাগছে। আরও কিছু শোনান তাহলে। আমার চেহারা বদলে দিয়ে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশন্যাল দেশের কি উপকারটি করতে চাইছে?'

থমথম করছে জুনেস্কির মুখ। রানার মাথার উপর দিয়ে পপকিনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে। বসের সাথে পলকের জন্যে আরেকবার চোখাচোখি হলো তার।

হাসি হাসি মুখে বলল পপকিন, 'আমার কথা বোধহয় মনোযোগ দিয়ে শুনছ না তুমি, রানা। আগেই তো বললাম, ডক্টর ফিলাতভের ওপর থেকে শত্রুদের দৃষ্টি সরাবার উদ্দেশ্যেই তোমার চেহারা বদল করা হয়েছে। বেশ, আরেকটু ব্যাখ্যা করছি। শত্রুদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব চাপানো হয়েছে তোমার কাঁধে। তোমার সাথে আরও লোকজন থাকবে, শত্রুরা মনে করবে ওরা ডক্টর ফিলাতভের নিরাপত্তা প্রহরী। নাকের সামনে মুলো দেখে ছুটবে গাধারা, অনেক দূরে চলে যাবে, এই ফাঁকে আমি আসল ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে অ্যাসাইনমেন্টে রওনা হব।'

'এইটুকুতে আমি সন্তুষ্ট নই,' দৃঢ় স্বরে বলল রানা। 'আগেই বলেছি, আপনাদেরকে আমি বিশ্বাস করি না। দেশের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজি আছি, কিন্তু তার আগে জানতে চাই যারা আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে তারা দেশের উপকার করতে চাইছে, না অপকার?'

'ব্যাপারটা তুমি বুঝছ না, রানা,' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছার ফাঁকে আবার জুনেস্কির দিকে তাকাল পপকিন।

একটা অস্থিরতা অনুভব করছে জুনেস্কি। বসের নার্ভাসনেসটা উপলব্ধি করছে সে। প্যাঁচে আটকে ফেলেছে ওদেরকে রানা।

'বোঝার আমার আছেই বা কি?' রুক্ষ স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'যা কিছু বলছেন, সত্য কি মিথ্যা, প্রমাণ করতে পারবেন? ভাল কথা, হেডকোয়ার্টার থেকে যে চিঠিটা এসেছে বলছেন, কই সেটা দেখি?'

পপকিন গম্ভীর। 'নিয়ম হলো পড়ে দেখার পরপরই সব চিঠি পুড়িয়ে ফেলতে হয়।'

'সেক্ষেত্রে,' বলল রানা, 'পুরো কাহিনীটা শুনতে চাই আমি। সবটা শুনব, বিবেচনা করব, সন্তুষ্ট হব, তারপর জানাব নিজের মতামত।'

পপকিন চুপ করে আছে। একটা উদ্বেগ ফুটে উঠেছে জুলির চেহারায়।

জুনেস্কির মুখে ক্রোধের আভাস, কিন্তু চুপচাপ।

কারও মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ কাটল। নিস্তব্ধতা ভাঙল রানাই। হুমকির মত শোনাল ওর কথাগুলো, 'শুধু তাই নয়, ডক্টর ফিলাতভের পূর্ণাঙ্গ ডোশিয়ার চাই আমি।'

দশ সেকেন্ড কাটল আরও। হঠাৎ কাধ ঝাঁকাল পপকিন। গম্ভীরভাবে বলল. 'বেশ।' কি যেন ভাবল সে। তারপর মুখ তুলে তাকাল জুলির দিকে। 'তার আগে একটা ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা পেতে চাই আমি।' রানার দিকে ফিরল সে। 'প্রথম দিন এখানকার হোটেলে ঘুম ভাঙার খানিকপর তুমি নিচে নেমে গ্যারেজে যাও, তাই না? গাড়িতে একটা পুতুল ও একটা চিরকুট পেয়েছিলে, সে দুটো দেখাতে পারো আমাকে?'

একটা ড্রয়ার খুলে পুতুল আর চিরকুটটা বের করল রানা। পপকিনের দিকে বাড়িয়ে দিল। বিড় বিড় করে চিরকুটের লেখাটা পড়ল সে।

'তোমার ড্রামেন ডলি তোমার জন্যে স্পাইরালটোপেনে অপেক্ষা করছে। ১০ জুলাইয়ের ভোরবেলা।' চিরকুটটা নাকের কাছে তুলে শ্বাস টেনে শুঁকল। 'বাহ্, সুগন্ধ মাখা।'

এই প্রথম কথা বলল জুলি, 'পুতুলটার কথা জানি, কিন্তু সাথে একটা নোট ছিল এই প্রথম জানলাম আমি।'

'এটা পেয়েই তো স্পাইরালটোপেনের মাথায় গিয়েছিল রানা,' বলল জুনেস্কি।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা জুনেস্কির দিকে। সম্বোধনের পরিবর্তনটা কানে বেজেছে ওর। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকল দীর্ঘ পাঁচ সেকেন্ড। রানার চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না জুনেস্কি, চোখের পাতা নড়ে গেল তার। হাসতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু ক'টা দাঁত বেরোল শুধু, হাসিটা ফুটল না।

জুলির কথা কানে ঢুকছে, সচেতন হয়ে ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে নিল রানা।

'চিরকুটটা দেখতে পারি?' বলল জুলি। পপকিনের বাড়ানো হাত থেকে নিল সেটা। পড়ল। ভুরু কুঁচকে উঠছে তার, 'হতে পারে...'

'কি ব্যাপার, জুলি?' দ্রুত জানতে চাইল পপকিন।

ইতস্তত করছে জুলি। বলল, 'গত হপ্তায় ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে স্পাইরালটোপেনে গিয়েছিলাম আমি। রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেয়েছিলাম আমরা।' আবার একটু ইতস্তত করল সে। 'বাথরূমে যেতে হয়েছিল আমাকে, ফিরে এসে দেখি ডক্টর ফিলাতভ একটা মেয়ের কোমরে হাত রেখে কথা বলছেন। দু'জনে খুব হাসাহাসি চলছিল। আমাকে দেখেই চুপ করে গেল ওরা। তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল মেয়েটা।'

'ব্যস এইটুকু?' জানতে চাইল পপকিন।

'জ্বী,' বলল জুলি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জুলিকে দেখছে পপকিন। 'জুলি,' গম্ভীর গলায় বলল পপকিন। 'আমার মনে হচ্ছে কি যেন তুমি লুকাচ্ছ।'

মুখটা লালচে হয়ে উঠল জুলির। আবার একটু ইতস্তত করল সে। তারপর বলল, 'স্যার...ডক্টর ফিলাতভ, মানে...এই ক'দিনে ভদ্রলোককে যতটুকু আমি

চিনেছি, তিনি সাংঘাতিক মেয়ে-ঘেঁষা স্বভাবের লোক। রাস্তা ঘাটে মেয়ে দেখলে তার হুঁশ থাকে না।'

'হুঁ,' বলল পপকিন। 'তুমি বলতে চাইছ স্পাইরালটোপেনের ওই মেয়েটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে শত্রুপক্ষ, তারা জানত ডলি অর্থাৎ মেয়েটার কথা উল্লেখ করে চিরকুট রেখে গেলেই ডক্টর ফিলাতভ অমনি ছুটবে?'

'জী।'

'হুঁ,' বলল পপকিন। ফিরল রানার দিকে। 'আচ্ছা, বলো তো, ওখানে যারা আক্রমণ করেছিল তারা কি তোমাকে স্রেফ ধরতে চেয়েছিল, নাকি খুন করতে চেয়েছিল?'

'ওদেরকে জিজ্ঞেস করার জন্যে দাঁড়াইনি আমি,' ভাবলেশহীন মুখে বলল রানা। 'তবে, বুঝতে পারি আমাকে খুন করা হয়তো ওদের উদ্দেশ্য ছিল না।'

'হুঁ,' টেবিল থেকে নিভে যাওয়া চুরুটটা তুলে নিয়ে তাতে অগ্নি-সংযোগ করল পপকিন। ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'এর মধ্যে হোটেলেও কয়েকবার চেষ্টা করেছে ওরা তোমার কাছাকাছি পৌঁছুতে, কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। তুমি ঠিকই বলেছ, ওদের উদ্দেশ্য ডক্টর ফিলাতভকে অর্থাৎ তোমাকে খুন করা নয়। তোমাকে ওরা কিডন্যাপ করতে চায়।'

'কেননা, ডক্টর ফিলাতভ এমন কিছু জানে বা তার কাছে এমন কিছু আছে যা অত্যন্ত মূল্যবান,' বলল রানা। 'কি সেটা, মি. পপকিন?'

'ঠিক আছে, জুলি,' বলল পপকিন। 'তুমি এবার যেতে পারো।'

রানার দিকে চোখ রেখে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল জুলি। একটু হাসল, কিন্তু জুনেস্কি ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে দ্রুত মুছে ফেলল মুখ থেকে হাসিটা। নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল আবার জুনেস্কি।

জ্বলন্ত চুরুটের দিকে তাকিয়ে আছে পপকিন। রানা তার মুখের ভাব লক্ষ করছে।

'আমার নীতি হলো, রানা,' চোখ না তুলেই কথা বলছে পপকিন। 'যার যতটুকু জানা প্রয়োজন তাকে ততটুকু জানানো, তার বেশি নয়। জুলিকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি কিন্তু সব কথা জানার ওর কোন প্রয়োজন নেই, তাই ওকে জানাচ্ছি না। আমি মনে করি, সব কথা তোমারও জানার প্রয়োজন নেই।'

'আমি মনে করি, আছে,' শান্তভাবে জানিয়ে দিল রানা।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল পপকিন। তারপর মুখ তুলল। দ্রুত কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানার অগোচরে পপকিনকে জানিয়ে দিল জুনেস্কি উপায় নেই, রানা ওদেরকে কোণঠাসা করে ফেলেছে।

তবু শেষ চেষ্টা করল পপকিন। 'ভাল করে ভেবে দেখো, রানা। দেশের স্বার্থ বিবেচনা করো। যত বেশি জানবে তুমি, বিপদের ঝুঁকি তত বেশি। শত্রুদের হাতে ধরা পড়ার ভয় রয়েছে তোমার, ওরা টরচার করে সব কথা তোমার মুখ থেকে বের করে নিতে পারে। তা যদি পারে, মস্ত ক্ষতি হবে দেশের। দেশের ক্ষতি হোক, চাও

তুমি?'

'চাই না,' বলল রানা। 'চাই না বলেই সব কথা জানা দরকার আমার। কে আমার বস্ আমি জানি না। আমার স্মৃতি যদি অটুট থাকত আমার বস্ যদি সরাসরি আমাকে নির্দেশ দিত—কোন প্রশ্ন না করে পালন করতাম সেই নির্দেশ। কিন্তু বর্তমান ঘটনা তা নয়। আপনাদের ওপর আমার কোন আস্থা নেই। সবটুকু শুনব আমি। তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'

রানার চোখে চোখ রেখে দশ সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল পপকিন। কি যেন বলতে গিয়ে সামলে নিল শেষ মুহূর্তে। কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর কোন ভূমিকা না করেই শুরু করল, 'শোনো। ডক্টর আনাতোলি পপোভিচ ফিলাতভ একজন ফিন মানে, ওর জন্ম ফিনল্যান্ডে।'

'ফিন? কিন্তু ওর নামটা তো ফিন নয়?' বলল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল পপকিন। 'ওর নামটা ঠিক ফিনিশ নয়। ও একজন ক্যারোলিয়ান ফিন, জায়গাটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত রাশিয়ান বর্ডারের এপাশে ছিল। জন্মের পর ফিলাতভ যদি সেখানেই থেকে যেত, আজ তাহলে সোভিয়েত রাশিয়ার নামজাদা এক বৈজ্ঞানিক হত সে। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে। বলছি।'

আবার চুরুটটা ধরিয়ে নিল পপকিন।

শরীরের ভার এক পা থেকে আরেক পায়ে চাপাল জুনেস্কি।

'১৯৩৯ সালে রাশিয়া ফিনল্যান্ড আক্রমণ করে,' শুরু করল পপকিন। 'উইন্টার ওয়র হিসেবে এই যুদ্ধটা বিখ্যাত। ফিনরা এ যুদ্ধে রাশিয়ানদেরকে তেমন সুবিধে করতে দেয়নি। এরপর ১৯৪১ সালে জার্মানী আক্রমণ করে রাশিয়াকে। ফিনরা ভাবে, প্রতিশোধ নেবার এটাই হচ্ছে মোক্ষম সুযোগ। কিন্তু তারা ভুল করেছিল, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে লাভ হয়নি কিছু, বরং লোকসান দিতে হয়েছিল।

'ফিনদের কাছে এই যুদ্ধটা কন্টিনিউয়েশন ওয়র হিসেবে পরিচিত। যুদ্ধের শেষে দু'পক্ষের মধ্যে একটা শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী দু'দেশের মাঝখানের সীমান্ত রেখা বাতিল করা হয়। আগের সীমান্তটা লেনিনগ্রাডের খুবই কাছে, রাশিয়ানদের সেটাই ছিল উদ্বেগের কারণ। ফিনল্যান্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে একজন গানার কামানের গোলা ছুঁড়ে লেনিনগ্রাডের মাঝখানটা অনায়াসে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিতে পারত। তাই রাশিয়ানরা চুক্তির মাধ্যমে গোটা Karelian Isthmus এবং আরও কিছু ছোটখাট ভূখণ্ড নিজেদের এলাকায় ঢুকিয়ে নিল। এই এলাকার মধ্যেই ছিল ফিলাতভের জন্মস্থান, এনসো। রাশিয়ানরা এনসোর নতুন নামকরণ করেছে স্‌ভেটোগোরিস্ক।'

ঘন ঘন চুরুটে টান দিয়ে আগুনটাকে গনগনে করে তুলল পপকিন। ধোঁয়ার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে তাকাল রানার দিকে। 'সহজবোধ্য করে বলতে পারছি তো, রানা?'

'বুঝতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না,' বলল রানা। 'কিন্তু নতুন করে ইতিহাসের পাঠ নিতে আমার কোন আগ্রহ নেই। আসল ব্যাপারটা জানতে চাই আমি।'

'সেদিকেই এগোচ্ছি,' কণ্ঠস্বর থেকে তিক্ততার ভাব দূর করতে চাইলেও পারল না পপকিন। একটু বিরতি নিয়ে আবার শুরু করল সে, 'যুদ্ধ যখন শেষ হলো

ফিলাতভ তখন মাত্র যৌবনে পা দিয়েছে। ফিনল্যান্ডের অবস্থা তখন শোচনীয়। নতুন সীমান্ত রেখা টপকে প্রায় সব ফিন মূল ভূখণ্ডে চলে আসছে, কারণ তারা রাশিয়ানদের সাথে থাকতে চায় না। ফিনল্যান্ডের সে এক করুণ অবস্থা। সে তার নিজের নাগরিকদেরকেই জায়গা দিতে পারছে না। অগত্যা বাধ্য হয়ে তারা সুইডেনকে অনুরোধ করল এক লক্ষ ফিনকে রিফিউজি হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে। সুইডিশরা মহৎ হৃদয়, তারা এক কথায় রাজি হয়ে গেল।'

রানা কিছু বলবে আশা করে অপেক্ষা করছে পপকিন। কিন্তু মুখ খুলল না রানা। অনড় বসে আছে। চোখের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না ওর।

'এই এক লক্ষের সাথে সুইডেনে এল ফিলাতভও। অল্প কিছুদিন ওখানে থাকার পর সে চলে এল এখানে, এই অসলোয়। চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত এখানেই ছিল। তারপর গেল ইসরায়েলে। এই পুরো সময়টা একাই ছি সে, যুদ্ধের সময় তার বাবা-মা মারা গিয়েছিল। কিন্তু ইসরায়েলে পৌঁছে সে বিয়ে করল। মেয়েটার টাকা ছিল, তাকে বিয়ে করার সেটাই ফিলাতভের বড় কারণ।'

ধীরে ধীরে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠছে রানার চেহারায়।

'ফিলাতভকে মেধাবী বললে কম বলা হবে, সে একটা প্রতিভা,' আবার শুরু করল পপকিন। 'ইলেকট্রোনিকসে তার দখল সাংঘাতিক। এই বিষয়ে অসংখ্য আবিষ্কার আছে তার। শুধু তাই নয়, নিজের আবিষ্কারগুলোকে নগদ টাকায় রূপান্তর করার ব্যাপারেও চমৎকার কৌশলী সে। ব্যবসা শুরু করার জন্যে প্রথম স্ত্রীর টাকাটাকে কাজে লাগাল সে। কিছুকাল পর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল ওদের। এর মধ্যে স্ত্রীকে কয়েক লক্ষ ডলার লাভ দিয়েছে ফিলাতভ। নিজেও কয়েক লক্ষ ডলার বানিয়ে নিয়েছে, আরও বানাচ্ছে।'

লাইটার জ্বালল পপকিন। চুরুট ধরাবার আগে জুনেস্কির দিকে তাকাল। 'এক গ্লাস পানি।'

'এর মধ্যে প্রতিভাবান ফিলাতভ একজন কেউকেটা হয়ে উঠেছে,' কথার সাথে সাথে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে পপকিনের মুখ থেকে। 'কয়েকটা ফ্যাক্টরির মালিক সে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সাথে চুক্তিতে যুদ্ধাস্ত্রের খুচরো অংশ তৈরি করছে। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও—অ্যাঙলো ফ্রেঞ্চ জাগুয়ার ফাইটার থেকে শুরু করে কনকর্ড পর্যন্ত অসংখ্য বিমানে তার ইলেকট্রোনিকস যন্ত্রপাতির সমাবেশ ঘটেছে। ব্যাটল ট্যাঙ্কগুলোকে অত্যাধুনিক করার পেছনেও তার ফ্যাক্টরির অবদান রয়েছে। ইসরায়েলের প্রধান মন্ত্রী তাকে ডেকে ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, এমন একটা ট্যাঙ্ক তৈরি করো যেটা নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে, চিন্তা করতে পারে, ভুল সংশোধন করতে পারে। তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে, নাম রাখা হয়েছে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। বুঝতেই পারছ, ফিলাতভ এখন উঁচু স্তরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার কথা কিছু জানে না।'

'দু'হপ্তা আগে হলে আমিও জানতে চাইতাম না।' বিরক্ত হয়ে বলল রানা।

গুরুর সাথে চেলার আবার চোখাচোখি হলো। পানির গ্লাসটা ডেস্কে রেখে নিজের জায়গায় দাঁড়াল জুনেস্কি।

পপকিন বলল, 'ফিলাতভ মাথাটা পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে তার বাবার কাছ

থেকে, সুতরাং সেই বুড়োর ওপর কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে…'

'তার কি কোন দরকার আছে?'

'নেই,' বলল পপকিন, 'যদি সবটা না শুনলেও চলে তোমার।'

'সংক্ষেপে বলে যান,' রিস্টওয়াচে চোখ রেখে বলল রানা।

'নিকোলাই ফিলাতভ ছিলেন দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী একজন ফিজিসিস্ট। লোকে বলে, যুদ্ধের সময় তিনি মারা না গেলে নোবেল প্রাইজের তালিকার শীর্ষে নাম থাকত তাঁর। যুদ্ধের জন্যে তাঁর গবেষণা বিঘ্নিত হয়, তিনি ফিনিশ সরকারের পক্ষে কাজ করার জন্যে ভাইপুরীতে চলে যান। ভাইপুরী ফিনল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ছিল। কিন্তু সেটা ক্যারেলিয়া এলাকায়, এবং এখন রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। রাশিয়ানরা শহরের নতুন নামকরণ করেছে—ভাই বোর্গ।'

মুখভাবে বিরক্তি ফুটে থাকলেও প্রতিটি কথা মনে গেঁথে নিচ্ছে রানা, মনে মনে কয়েকবার করে উচ্চারণ করে নিচ্ছে, বিশেষ করে নামগুলো যাতে ভুলে না যায়।

'যুদ্ধের সময় ভাইপুরী প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, সেই সাথে নিকোলাই ফিলাতভের ল্যাবরেটরিটাও। ওখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে এনসোর নিজের বাড়িতে চলে যান তিনি। এর মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রাশিয়ানদেরকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। যুদ্ধের আগে প্রচুর গবেষণার কাজ করেছিলেন তিনি, সেগুলো কোথাও প্রকাশিত হয়নি তখনও। কাগজগুলোর নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। একটা মেটাল ট্র্যাঙ্কে তাঁর সব কাগজপত্র ভরে সীল করে দিলেন, পুঁতে রাখলেন বাড়ির বাগানে। আমাদের ফিলাতভ তাঁকে সাহায্য করল। পরদিন…' চুরুট ধরাবার জন্যে থামল পপকিন।

নিজের অজান্তেই প্রশ্ন বেরিয়ে গেল রানার মুখ থেকে। 'পরদিন? কি হলো পরদিন?'

'একটা বোমা। পরদিন একটা বোমা।' নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে নিয়ে আয়েশ করে ধোঁয়া ছাড়ল পপকিন। 'নিকোলাই ফিলাতভ, তার স্ত্রী, ছোট ছেলে—মারা পড়ল তিনজন। ফিলাতভও মারা যেত, কপাল জোরে বেঁচে গেছে, বাড়িতে ছিল না তখন।'

'কাগজগুলো রক্ষা পেল,' কোনরকম শোক প্রকাশ করল না রানা, বলল, 'কি ধরনের গুরুত্ব ওগুলোর?'

গভীর ভাবে ভাবছে পপকিন। আরেকবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি রানাকে সব কথা না বলে পারা যায় কিনা? উঁহু, ত্যাঁদোড় ছোকরা, কোনভাবেই এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। ব্রেন ওয়াশ করা হয়েছে, অথচ স্বভাবের দৃঢ়তা লোহার মত কঠিন। কোথায় ঠেকে আছে তারা ঠিকই বুঝে নিয়েছে, চাপ দিয়ে সব কথা আদায় করে নিচ্ছে—এখনও এরকম, না জানি এর আসল মূর্তি কতটা ভয়ঙ্কর। মনে মনে হাসল সে। যতই ভয়ঙ্কর হও হে, যমের বাড়িতে দিচ্ছি তোমাকে পাঠিয়ে, টেরও পাবে না বাছাধন…

'সে প্রসঙ্গে পরে আসছি,' গ্লাসটা তুলে নিয়ে কলজেটা ঠাণ্ডা করল পপকিন। 'গত বছরের কথা। আমাদের ফিলাতভ তখন সুইডেনে। হঠাৎ এক মহিলার সাথে দেখা। ফিনল্যান্ড থেকে একা চলে আসার পর এই মহিলাই ক'দিনের জন্যে আশ্রয়

দিয়েছিল ফিলাতভকে। ভারি সৎ মহিলা। ফিলাতভকে দেখেই বলল, তুমি বাবা আমার বাড়িতে একটা বাক্স ফেলে রেখে গেছ, চলো আমার সাথে নিয়ে আসবে সেটা।

'হোটেলে ফিরে এসে বাক্সটা খুলল ফিলাতভ। কিশোর একটা ছেলের শখের জিনিসে ভর্তি বাক্সটা। একটা রেডিওর ডিজাইন পেল ফিলাতভ, তার নিজের করা। সেই বয়সেই ইলেকট্রোনিকস ওকে আকৃষ্ট করেছিল। আরও কিছু ডিজাইন বেরুল। তার মধ্যে একটা রেডিও-কনট্রোলড মডেল। এয়ারক্র্যাফটের। এবং একটা পুরানো রেডিও ম্যাগাজিনের ভিতর পাওয়া গেল একটুকরো কাগজ, তাতে তার বাবার হাতের কিছু লেখা। এই জিনিসটা পাওয়াতেই ওর বাবার সেই মাটিতে পুঁতে রাখা গবেষণা সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলো হঠাৎ সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।'

রিস্টওয়াচের দিকে চোখ রেখে বলল রানা, 'গবেষণার বিষয় কি ছিল ভদ্রলোকের?'

শুনেও না শোনার ভান করল পপকিন। বলল, 'প্রথমে ফিলাতভ বুঝতেই পারেনি কি সাংঘাতিক জিনিস পড়েছে তার হাতে। সুইডেনের কয়েকজন বিজ্ঞানীর সাথে বিষয়টা নিয়ে কথা বলে সে। হঠাৎ তার বোধের উদয় হয়, এবং কালবিলম্ব না করে সোজা চলে যায় তেল আবিবে, সেখানে উপযুক্ত লোকদেরকে ব্যাপারটা জানায়। এই উপযুক্ত লোকেরাই, বুঝতেই পারছ, তোমার আমার মনিব। তাদের নির্দেশেই এর মধ্যে এসেছি আমি। তুমিও।'

'কাজটা হলো বাগানের মাটি খোঁড়া,' বলল রানা। 'তাই না?' গলার স্বরে একটু তাচ্ছিল্যের রেশ।

'হ্যাঁ। তা ঠিক। মাটি খোঁড়াই বটে। তবে,' তিক্ত হাসল পপকিন। 'বাগানটা রাশিয়ায়, এই যা।' চুরুটের আগুনের দিকে চোখ রেখে চুপ করে থাকল সে। 'তুমি সন্তুষ্ট, রানা?'

'এইটুকুতে?' মৃদু হাসল রানা। 'না।'

'আর কি জানতে বাকি আছে তোমার?' রাগ চেপে রাখতে গিয়ে গলাটা বেসুরো করে ফেলল পপকিন।

'আসল কথাটাই এখনও জানি না,' বলল রানা। 'কাগজগুলোর গুরুত্ব কতটা? নিকোলাই ফিলাতভের গবেষণার বিষয়বস্তু কি ছিল? এবং আমার দেশ ওগুলো উদ্ধার করতে চাইছে কেন? কি কাজে লাগবে ওগুলো আমাদের?'

কথা সরল না পপকিনের মুখে। রানার দিকে তাকিয়ে আছে।

'আরও প্রশ্ন আছে আমার,' বলল রানা। 'সেগুলো আসবে পরে।'

হিম গলায় বলল পপকিন, 'না এখনই বলো আর কি প্রশ্ন আছে তোমার।'

'বেশ,' নড়েচড়ে বসল রানা। 'আপনি আমার ওপর যতই অসন্তুষ্ট হন, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আমাকে পেতে হবে। এমন একটা কাজের দায়িত্ব আমি নেব না যে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে, বা যে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আনাড়ীর মত মারা পড়ব। আপনিই জানিয়েছেন, আমি জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট। আপনার এই কথাটা আমি বিশ্বাস করি। তার মানে আমার গুরুত্ব আছে, দেশ আমার কাছ থেকে সেবা চায়। আমার উপযুক্ত নয় এমন একটা কাজ

করতে গিয়ে যদি মারা যাই, দেশের ক্ষতি হবে। একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে সেটা আমি সজ্ঞানে ঘটতে দিতে পারি না। পারি না বলেই আমি জানতে চাই ডাইভারশনে কোথায় আমাকে পাঠানো হবে।'

'আগেই বলেছি, ফিনল্যান্ডে।'

'কিন্তু ফিলাতভ ফিন ভাষা জানত, আমি জানি না। এটা একটা বাধা নয়?'

'না। প্রায় দুই যুগ ধরে ফিনল্যান্ডে অনুপস্থিত ফিলাতভ, ভাষাটা সে ভুলে গেছে। অনেক দিন সম্পর্ক না থাকলে বাপের নাম পর্যন্ত ভুলে যায় লোকে।'

'বেশ। না হয় ভুলেই গেছি। এবার ঝুঁকির প্রসঙ্গে আসা যাক।'

'ঝুঁকি?' ভুরু কুঁচকে তাকাল পপকিন।

'ফিলাতভ হিসেবে ফিনল্যান্ডে যাব। দলে দলে পিছু নেবে শত্রুপক্ষরা। তারা নিশ্চয়ই আমার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্যে…'

'হ্যাঁ, ওরা তোমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করবে,' বলল পপকিন। 'কিন্তু সফল হবে না। তোমার সাথে আরও লোক যাচ্ছে। তারা তোমাকে পাহারা দেবে। আর তুমি নিজেও তো কম নও, একজন দুর্ধর্ষ স্পাই।' মুচকে হাসল পপকিন।

'তারপর? শেষ পর্যন্ত আমার অবস্থা কি হবে?'

'আমার মিশন শেষ হলেই তোমাকে ডেকে পাঠানো হবে,' উৎসাহের সাথে বলল পপকিন। 'সোজা লন্ডনে চলে যাবে তুমি। আগে থাকতেই ব্যবস্থা করা থাকবে। বিখ্যাত সাইকিযাট্রিস্ট এবং প্লাস্টিক সার্জেন তোমার চিকিৎসা করবেন। ক'দিনের মধ্যেই আবার তুমি তোমার স্মৃতি এবং চেহারা ফিরে পাবে। সোজা চলে যাবে তেল আবিবে, রিপোর্ট করবে তোমার বসের কাছে।' এক গাল হাসল পপকিন। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি কোন সন্দেহ নেই, তিনি তোমার পিঠ চাপড়ে দেবেন।'

একটু হাসল রানা। বস্ পিঠ চাপড়ে দেবেন বলায় একটু যেন লজ্জা পেয়েছে, সেই সাথে খুশিও হয়েছে। 'এর মধ্যে কোন ঘাপলা নেই তো?' হালকা সুরে জানতে চাইল রানা।

'ঘাপলা? না না, রানা, ঘাপলা কিসের আবার?' পপকিন দ্রুত বলল, 'যা সত্য তাই বলছি তোমাকে। কোথাও কি অস্বাভাবিক লাগছে আমার বক্তব্য? লাগলে বলো।'

'না, মোটামুটি স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে সব,' বলল রানা। 'শুধু একটা জিনিস বাদে। আপনি আমাকে কাগজগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে এখনও কিছু বলেননি।'

'ব্যাপারটা টপ সিক্রেট, রানা। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে এর সাথে।'

'এক কাজ করুন,' সহজ কণ্ঠে বলল রানা।

'কি?' গোপন কথাটা না বলে পারা যাবে ভেবে সাগ্রহে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল পপকিন।

'প্লেনের একটা টিকেট কেটে দিন। আমি তেল আবিবে চলে যাই।'

হাঁ হয়ে গেল পপকিনের মুখ।

জুনেস্কির হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল।

'তেল আবিব…?'

'তাছাড়া উপায় কি?' বলল রানা। 'কিছুই না জেনে যদি কোন অ্যাসাইনমেন্টে যেতে হয়, বসের নির্দেশেই যাব, আপনার নির্দেশে নয়।'

'তুমি ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছ…'

'না। যুক্তি সঙ্গত অনুরোধ করছি: সবটুকু জানানো হোক আমাকে।'

দেয়ালে পিঠ রেখে উশখুশ করছে জুনেস্কি। তার দিকে তাকাল পপকিন। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

রানার দিকে তাকাল পপকিন। ধীরে ধীরে কঠোর হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। এটা তার একটা কৃত্রিম ভাব, জেনেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো জুনেস্কির।

'যা তোমাকে বলতে যাচ্ছি,' কঠিন হুমকির সুরে বলল পপকিন, 'তার একটা শব্দও যদি কখনও উচ্চারণ করো, বাকি জীবনটা তোমাকে জেলখানায় পচতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য চেষ্টা করব তোমাকে যাতে ফায়ারিঙ স্কোয়াডে পাঠানো হয়। বুঝতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এক মিনিট,' বলল ও। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে ওর। চোখ দুটো জ্বলছে। 'আপনি কি আমার দেশ প্রেম সম্পর্কে কটাক্ষ করছেন?'

ঘাবড়ে গেল পপকিন। 'না, রানা। আমার কর্তব্য তোমাকে সাবধান করে দেয়া, ব্যস। এর মধ্যে আর কোন ব্যাপার নেই।'

চেহারা থেকে উত্তেজনা খসে পড়ছে ধীরে ধীরে রানার। চেয়ারে হেলান দিল ও।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল পপকিন।

'নিন শুরু করুন এবার,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

গলা পরিষ্কার করে নিল পপকিন। ধীরে ধীরে বলল, 'যদ্দূর জানা গেছে, ১৯৩৭ অথবা ১৯৩৮ সালে নিকোলাই ফিলাতভ এক্স-রে-এর প্রতিফলন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।'

পপকিন আর কিছু বলছে না দেখে বিস্মিত হলো রানা, 'ব্যস এইটুকু?'

'হ্যাঁ,' রুক্ষ গলায় বলল পপকিন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আড়মোড়া ভাঙছে।

'এটুকু যথেষ্ট নয়,' বলল রানা। 'এক্স-রে-এর প্রতিফলন পদ্ধতি আবিষ্কারের গুরুত্ব কি?'

'যতটা সম্ভব, জানিয়েছি। এতেই সন্তুষ্ট হতে হবে তোমাকে।'

'উঁহু! ব্যাখ্যা করুন। গুরুত্বটা বোঝান। তাৎপর্যটা জানতে হবে আমার।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল পপকিন। 'ঠিক আছে, জুনেস্কি, বলো ওকে।'

এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল জুনেস্কি। 'সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপারটার তেমন কোন তাৎপর্য নেই,' একটু বাঁকা হেসে বলল সে। 'এক্স-রে-র প্রতিফলন পদ্ধতি—সে আবার কি জিনিস? যুদ্ধের আগে এ বিষয়টা নিয়ে নিকোলাই ফিলাতভ গবেষণা করলেও, তখন এমন কি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের লোকদেরও এ বিষয়ে কোন আগ্রহ ছিল না। সবাই জানত এক্স-রে-র পেনিট্রেট করবার একটা ক্ষমতা

আছে, সেটাকেই কাজে লাগানোর কথা ভেবেছে সবাই—প্রতিফলনের কথা ভাবেনি কেউ। কিন্তু নিকোলাই ফিলাতভ তাঁর যুগের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। যে বিষয়ে কারও কোন আগ্রহ ছিল না, তাঁর ছিল সেই বিষয়েই যত আগ্রহ। কাজে লাগবে কিনা না জেনেই গবেষণা করেছিলেন তিনি, এবং তেমন কোন গুরুত্ব নেই বুঝে রিসার্চের কাগজপত্র ছাপতে না দিয়ে ফাইলে বন্দী করে রেখেছিলেন।'

একটু বিরতি নিল জুনেস্কি। তাকাল বসের দিকে। পপকিনকে চুল পরিমাণ মাথা কাত্ করতে দেখে বুঝে নিল রানাকে সব কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে তাকে। হাসল সে। 'মজার ব্যাপারটা হলো এই যে দুনিয়ার তাবৎ ডিফেন্স ল্যাবরেটরিতে এখন রাতদিন কাজ চলছে এক্স-রে-র প্রতিফলন কিভাবে সৃষ্টি করা যায় তা আবিষ্কার করার জন্যে। কিন্তু এখন পর্যন্ত উপায়টা আবিষ্কারের ধারে কাছেও কেউ যেতে পারেনি।'

'এটা আবিষ্কার হলে কার কি লাভ?'

'তার আগে জবাব দাও, লেযার কিভাবে কাজ করে জানো তুমি?' প্রশ্নটা এল পপকিনের তরফ থেকে।

মাথা নাড়ল রানা। 'না।'

গম্ভীর হয়ে তাকাল পপকিন জুনেস্কির দিকে।

কাঁধ ঝাঁকাল, জুনেস্কি বলল, 'তাহলে প্রথম থেকেই শুরু করি। ১৯৬০ সালে প্রথম আবিষ্কার হয় লেযার। ওটা ছিল সিনথেটিক রুবির একটা রড, ইঞ্চি চারেক লম্বা, ডায়ামিটার আধ ইঞ্চিরও কম, প্রতিফলন সৃষ্টির জন্যে এক প্রান্তে পুরোটা এবং অপর প্রান্তে অর্ধেকটা সিলভার করা। রডটার চারধারে প্যাঁচানো ছিল একটা স্পাইরাল গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প, জিনিসটা ফটোগ্রাফীতে যে ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করা হয় অনেকটা সেই রকম। বুঝতে পারছেন?'

'পরিষ্কার।'

'এই ধরনের ইলেকট্রোনিক ফ্ল্যাশে কতটা পাওয়ার থাকে সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না,' বলল জুনেস্কি। 'পরিষ্কার করে বলছি ব্যাপারটা। সাধারণ একটা ফ্ল্যাশের কথা ধরুন, প্রফেশন্যাল ফটোগ্রাফাররা যেটা ব্যবহার করে। কনডেনসার থেকে ডিসচার্জ হবার মুহূর্তে এক পলকের জন্যে ৪০০০ হর্স পাওয়ার তৈরি করে ফ্ল্যাশটা। প্রথম দিকের লেযারগুলোয় যে ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা হত সেগুলো অবশ্য এর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল—ধরুন, ২০,০০০ হর্স পাওয়ারের। ফ্ল্যাশের মাধ্যমে রুবি রডে ঢোকে আলো এবং তারপরই অদ্ভুত এক কাণ্ড শুরু হয়ে যায়। সিলভারের প্রান্ত দুটোয় প্রতিফলিত হয়ে আলোটা এদিক থেকে ওদিকে যাওয়া-আসা করতে থাকে রুবি রডের ভিতর, এবং সমস্ত লাইট ফোটোন অর্থাৎ আলোক কণা একমুখী প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়। বিজ্ঞানীরা এটাকে coherent লাইট বলে। সাধারণ আলো বিভিন্নমুখী বলেই অতটা শক্তি নেই ওতে। যা বলছিলাম, ফোটোনগুলো সবাই মিলে, আলোর প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা ঢেউয়ের মত বেরিয়ে আসছে রডের হাফ সিলভারড্ প্রান্ত দিয়ে। ফ্ল্যাশের মাধ্যমে রডে যে পরিমাণ শক্তি ঢোকানো হয়েছিল প্রায় সবটা অর্থাৎ প্রায় ২০,০০০ হর্স পাওয়ার এনার্জি সম্পন্ন ওই ঢেউটা বেরিয়ে আসছে একসাথে, কন্‌সেনট্রেটেড অবস্থায়।'

নিঃশব্দে হাসল জুনেস্কি। 'এই আলোটাকে নিয়ে খুব মজা করত সে যুগের বিজ্ঞানীরা। তারা আবিষ্কার করে, ছয় ফিট দূর থেকে এই আলোর সাহায্যে একটা রেজর ব্লেডকে ফুটো করে দেয়া যায়। জিলেট ব্লেডের হিসেবে লেযারের শক্তি পরিমাপের পরামর্শ দিয়েছিল ওরা।'

'ফালতু কথায় সময় নষ্ট কোরো না,' বিরক্তির সাথে বলল পপকিন।

'সামরিক প্রয়োজনে লেযারকে ব্যবহার করা যেতে পারে তা সহজেই বুঝে নিল সবাই,' বলল জুনেস্কি। 'উদাহরণ হিসেবে ধরুন, আপনি একটা লেযারকে রেঞ্জ ফাইন্ডারের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। একটা টার্গেট লক্ষ্য করে ছুঁড়ুন এটাকে, ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসার সময়টা হিসেব করুন, তাহলেই দূরত্বটা জানা হয়ে যাবে আপনার, এক ইঞ্চি এদিক ওদিক হবে না। শুধু রেঞ্জ ফাইন্ডার হিসেবে নয়, লেযারকে আরও নানাভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু আসল কথায় আসছি এবার, লেযারের একটা খারাপ দিকও আছে।'

'কি সেটা?'

'লেযারে ব্যবহার করা হচ্ছে আলো,' বলল জুনেস্কি। 'এবং আলো জিনিসটাকে সহজেই বাধা দেয়া যায়। আলো, তা সে যত শক্তিশালীই হোক, পুরু একটুকরো মেঘের কাছেও অসহায়, ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে না। এটাই তার মস্ত দুর্বলতা।'

'কিন্তু এক্স-রে-র সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'ঠিক। একটা এক্স-রে লেযার তৈরি করা তত্ত্বগতভাবে অসম্ভব নয়, কিন্তু স্রেফ এক জায়গায় একটা কিন্তু আছে। রঞ্জনরশ্মি ভেদ করে যায়, প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু প্রতিফলন ঘটাতে না পারলে এক্স-রে দিয়ে লেযার তৈরি হবে কিভাবে? গোটা ব্যাপারটাই তো নির্ভর করছে গুণিতক হারে প্রতিফলন সৃষ্টির ওপর। আজ পর্যন্ত কেউ এক্স-রে-র প্রতিফলন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেনি, শুধু নিকোলাই ফিলাতভ ছাড়া। যুদ্ধের আগে তিনি এই যুগান্তকারী কৌশলটা আবিষ্কার করে রেখে গেছেন।'

দুটো আঙুল দিয়ে থুতনি ঘষছে রানা, থলথলে ভাবটা অনুভব করছে, ইতোমধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে কৃত্রিম পদার্থটার সান্নিধ্যে। 'এ ধরনের একটা যন্ত্রকে কি কাজে লাগানো হবে?'

'ধরুন, ঘণ্টায় কয়েক হাজার মাইল স্পীডে আসছে একটা মিসাইল, সাথে একটা অ্যাটমিক ওয়ারহেড। এটাকে ধ্বংস করতে হলে আপনারও একটা মিসাইল ছুঁড়তে হবে। ধরুন, আমেরিকান স্প্রিন্ট জাতীয় একটা মিসাইল ছুঁড়লেন আপনি। কিন্তু সোজাসুজি শত্রুর মিসাইলের দিকে তাক করলে চলছে না, আপনি লক্ষ্য স্থির করছেন অন্য জায়গায়। এমন এক জায়গায়, যেখানে শত্রু মিসাইল যখন পৌঁছাবে তখন যেন আপনার মিসাইলও সেখানে পৌঁছে। এর আয়োজন করতে মূল্যবান সময় খরচ হয়, তার সাথে লাগে প্রচুর কমপিউটিং পাওয়ার। কিন্তু, আপনার হাতে যদি একটা এক্স-রে লেযার থাকে? আপনি সেটার লক্ষ্য স্থির করবেন সরাসরি শত্রু মিসাইলের দিকে, কারণ আপনি জানেন আপনার লেযারের গতি আলোর গতির সমান—এক সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল—এবং, শত্রু মিসাইলটাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বেরিয়ে যাবে আপনার রশ্মি—মেঘ বা অন্য কিছুতেই

আটকাবে না।'

'মাই গড!' বলল রানা। 'এ তো মারণরশ্মি!' ভুরু কুঁচকে পপকিনের দিকে ফিরল ও। 'যথেষ্ট শক্তিশালী করে তৈরি করা সম্ভব এটা?'

পপকিন হাসছে।

'প্রথম আবিষ্কার হওয়ার পর অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে লেযার,' শান্ত ভঙ্গিতে বলল জুনেস্কি। 'বড়সড় কর্ম কাণ্ডে আজকাল ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা হয় না। একটা রকেট ইঞ্জিনের সাহায্যে পাওয়ার সাপ্লাই করা হয়। ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ হর্স পাওয়ার অর্জন করা সম্ভব হয়েছে—তবু, তবু এটা একটা সাধারণ আলো। এক্স-রে তা নয়, এর সাহায্যে ইচ্ছে করলে যে কোন উপগ্রহকে কক্ষচ্যুত করে দিতে পারবেন আপনি।'

'তাৎপর্য কি, বুঝেছ এবার?' প্রশ্ন করল পপকিন। জানালার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল রানার দিকে। এগিয়ে আসছে।

উঠে দাঁড়াল রানা। অভিভূত মুগ্ধ বিস্মিত দেখাচ্ছে ওকে। এগিয়ে গিয়ে পপকিনের পথ রোধ করে দাঁড়াল। একটা হাত বাড়িয়ে দিল ও। করমর্দনের জন্যে। 'মি. পপকিন, আমার মনে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। খাপে খাপে মিলে গেছে সব, কোথাও এখন আর কোন খটকা নেই। আমাদের দেশ এমন একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধাস্ত্রের অধিকারী হতে যাচ্ছে, ভাবতেও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছি আমি। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি সেদিন আর দূরে নয় যেদিন প্রাণপ্রিয় স্বদেশ দুনিয়ার বুকে প্রচণ্ড এক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে...'

আবেগে কাঁপছে রানা। পপকিন আর জুনেস্কি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। হাসছে নিঃশব্দে।

রানার হাতটা ছেড়ে দিল পপকিন। 'ধন্যবাদ, রানা। তোমার দেশপ্রেমের অনেক প্রশংসা শুনেছি আমরা। তুমি আমাদের গর্ব। এখন শুধু ভালয় ভালয় এই কাজটা শেষ করতে পারলেই...'

'আপনি কোন চিন্তা করবেন না,' দৃঢ় স্বরে বলল রানা। 'ভুলে যাচ্ছেন কেন আমি একজন জিওনিস্ট এজেন্ট। এমন অভিনয় করব, ঘুণাক্ষরেও কেউ সন্দেহ করতে পারবে না যে আমি আন্তন ফিলাতভ নই।'

বারো

ছেলেমেয়ের বাপ হওয়া যে কি বিপদ, হাড়ে হাড়ে টের পেতে শুরু করেছে রানা। বেলা সাড়ে বারোটার সময় নিজে কামরা থেকে টেলিফোন করে ঘুম জড়ানো আদুরে গলায় জানিয়েছে লরেলি, 'আব্বু, তুমি যদি আমাকে লাঞ্চের দাওয়াত দাও, আমি তোমাকে ডিনারের দাওয়াত দেব—রাজি?'

'রাজি,' বলেছে রানা। 'কিন্তু একটা শর্তে।'

'এর মধ্যে আবার শর্ত? আচ্ছা, বলো, শুনি।'

'কাল থেকে যদ্দিন আছ অসলোয়, প্রতিদিন তিনবেলা আমার দাওয়াত রক্ষা করতে হবে তোমাকে।'

'যাহ্, এতটা তুমি সহ্য করতে পারবে না। সারাক্ষণ আমি যা বকবক করি, সইবেই না তোমার। বড়জোর একটা দিন কোনমতে কাটবে, তারপর বকুনি আর ধমক খেতে খেতে কলজে শুকিয়ে যাবে আমার। না—তার চেয়ে এসো এক কাজ করি, শুধু ডিনারটা একসাথে খাব আমরা, একদিন তুমি খাওয়াবে, পরদিন আমি, এভাবে—কি বলো?'

'বেশ,' বলল রানা। 'তাই হবে। কিন্তু তোমার সান্নিধ্য আমার ভাল লাগবে না, এ তোমার ভুল ধারণা, লরেলি।'

'তাই বুঝি?' লরেলি সকৌতুকে বলল। 'যা বদলেছ, হতেও পারে। আমার ধারণা যদি ভুল প্রমাণিত হয়, সবচেয়ে খুশি হব আমি। সে যাক, দেড়টায় আসছি আমি, কেমন? এর মধ্যে ছোট্ট আরও একটা ঘুম দিয়ে নিই।'

'ভাল কথা, লরেলি,' একটু ইতস্তত করে বলল রানা, 'আমার এক পরিচিতা ভদ্রমহিলার সাথে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে চাই আমি। তোমার কথা বলেছি ওকে, আলাপ করার জন্যে ভীষণ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে...'

অপর প্রান্তে কোন সাড়া নেই।

'লরেলি?'

'ঠিক আছে, আব্বু,' নিস্তেজ গলায় বলল লরেলি, 'আমিও খুশি হব তার সাথে পরিচিত হয়ে।' ইচ্ছা নেই, তবু ভদ্রতার খাতিরে আবার বলল, 'ওকে নিশ্চয়ই তুমি লাঞ্চে দাওয়াত করছ, তাই না? সেক্ষেত্রে আমারও বোধহয় উচিত হবে ওকে ডিনারের দাওয়াত করা, নাকি?'

বুদ্ধি করে বলল রানা, 'সে তোমার ইচ্ছা।'

বুদ্ধির দৌড়ে বাপকে আরেক ধাপ টপকে গেল মেয়ে। 'বুঝেছি, আব্বু!'

অপ্রতিভ বোধ করল রানা, 'বুঝেছ মানে?'

উত্তরে শোনা গেল ফোনের কানেকশন কেটে দেবার শব্দ। বাবার সাথে কোন মহিলার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে বুঝতে পেরে মন খারাপ হয়ে গেছে লরেলির। ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তিত হলো রানা। কিন্তু জুলির কথা ভেবে চিন্তাটাকে মন থেকে দূর করে দিল ও। মানুষকে সহজেই আপন করে নেবার আশ্চর্য একটা গুণ আছে জুলির, তাকে বিরূপ চোখে দেখার কোন কারণই খুঁজে পাবে না লরেলি!

হলোও প্রায় তাই। লাঞ্চে গিয়ে দেখা গেল লরেলিকে নিয়ে জুলি সারাক্ষণ ব্যস্ত। গুম মেরে ছিল প্রথম দিকে লরেলি, কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যে তার মেজাজ বদলে গেল, মন খুলে তাকে হাসতে হলোই। ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর মত হয়ে উঠল দু'জন। তবে, যখনই জুলি আর রানা কথা বলেছে, সতর্ক চোখে ওদেরকে লক্ষ করেছে লরেলি। দু'জনের সম্পর্কটা ঠিক কি ধরনের, বুঝে নিতে চেয়েছে সে।

লাঞ্চ সেরে একটা কফিহাউসে গেল ওরা। কফি খেয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরোল। 'চলো, সামনেই বইয়ের দোকান, তোমাকে কিছু বই কিনে দিই,' লরেলিকে বলল রানা। 'তুমি ঠিক কি ধরনের বই পড়লে আমি খুশি হব, সেটাও জানা হয়ে যাবে তোমার এই সুযোগে!'

বুদ্ধিমতী মেয়ে, বাপের কথার মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা অর্থ আছে বুঝতে পেরে প্রথমে হকচকিয়ে গেল, তারপর অনুমান করে নিল নিশ্চয়ই ওর ব্যাগের বই ক'টা চোখে পড়েছে বাবার। লজ্জা বোধ করল সে। দোষ স্খালনের জন্যে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'এ ব্যাপারে আরও আগে যদি কিছু সবক দিতে, ভাল হত। স্বীকার করছি আজেবাজে কিছু বই বন্ধুরা আমাকে গছিয়ে দিয়েছে।'

প্রসঙ্গটা নিয়ে কেউই আর কথা বাড়াল না। জুলি গোটা ব্যাপারটা শুনেছে রানার কাছ থেকে, কিন্তু সে এমন ভান করে রইল যেন কিছুই জানে না।

বিরাট একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকল ওরা। লরেলির জন্যে একগাদা বই কিনল রানা। 'এবার আমার জন্যে কিছু বই,' বলল ও। হাত নেড়ে কাছে ডাকল লাইব্রেরিয়ান লোকটাকে।

লোকটা যুবক। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সাদা একটা গ্যাবার্ডিনের স্যুট পরে আছে। 'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?' রানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল সে।

পাইপে টোবাকো ভরছে রানা। মুখ তুলে বলল। 'আমি একটা দুষ্প্রাপ্য বই খুঁজছি। তোমাদের শো-কেসে তো নেই। হয়তো গোডাউনে থাকতে পারে।'

'দয়া করে যদি বইয়ের নামটা বলেন...'

'লেখকের নাম মনে নেই,' পাইপে আগুন ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল রানা। 'বিশেষ এক ধরনের রান্না শেখার বই।'

'আব্বু! রান্না শেখার বই...?' বাপের কাঁধে হাত রাখল লরেলি, চোখ কপালে উঠে গেছে তার।

'তোমাকে নিজের হাতে কিছু রেঁধে খাওয়াতে চাই,' অমায়িক হেসে বলল রানা। তাকাল লাইব্রেরিয়ানের দিকে। 'বইটার নাম Salmaguni or Salmagundy. টুকরো মাংসের সাথে ভিনিগার, ডিম, মরিচ ইত্যাদি আর যেন কি কি সব দিয়ে তৈরি করতে হয় ডিশটা...'

'কি... কি বললেন?' বিস্ফারিত হয়ে গেছে লাইব্রেরিয়ানের চোখ দুটো। বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে।

আব্বুকে পাগল ঠাওরেছে লোকটা, ভাবছে লরেলি। একটু রূঢ় গলায় বলল সে, 'কানে কম শোনেন নাকি? বইটা আছে কিনা বলুন না?'

'না...মানে,' দ্রুত নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করছে লোকটা। কিন্তু রানার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। 'বইটা বোধহয় নেই, স্যার। আপনার কি আগামীকাল সময় হবে? খুঁজে দেখব, যদি পাই...'

'উঁহু,' বলল রানা, 'আর হয়তো সময় পাব না। আচ্ছা, ধন্যবাদ!' লরেলির হাত ধরল রানা। জুলিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তুমি যদি একটু ট্রেনিং দাও আমাকে, তাহলেই আমি রেঁধে খাইয়ে মেয়ের প্রশংসা আদায় করতে পারি।' ঘুরে দাঁড়াতে যাবে রানা, হঠাৎ কি মনে করে আবার তাকাল লাইব্রেরিয়ানের দিকে। লোকটা তখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি। 'আচ্ছা, মুন রেকার আছে? মুন রেকার—নাইনথ্ এডিশন?'

ঠোঁট দুটো নড়ছে লোকটার। সবাই বুঝল নিজের মনে নিঃশব্দে বইটার নাম

উচ্চারণ করছে সে। মাথা নাড়ল।

লোকটা পাগল নাকি? লাইব্রেরিয়ানকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভাবল লরেলি। 'বোঝাই যাচ্ছে নেই,' বলল সে। রানার হাত ধরে টান দিল। শ্রাগ করল রানা। দু'পাশে জুলি আর লরেলিকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

ডিনার খেতে দূতাবাস পাড়ায় গেল ওরা। বাপকে একা বসিয়ে রেখে জুলিকে নিয়ে নিদারুণ ব্যস্ততার সাথে বেরিয়ে গেল লরেলি রেস্তোরাঁ থেকে। পনেরো মিনিট পর ফিরল দু'জন। লরেলির মুখে চাপা হাসি।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকাল রানা, 'কোথায় যাওয়া হয়েছিল জানতে পারি?'

'থিয়েটারের টিকেট আনতে,' বলল লরেলি। 'জরুরী কোন কাজ নেই তো তোমার?'

'আছে,' বলল রানা। 'খুব জরুরী কাজ। আমি বোধহয় যেতে পারব না।'

কালো হয়ে গেল লরেলির মুখ। 'টিকেট কাটা হয়ে গেছে যে!'

একটু ভাবল রানা। পপকিন ন'টায় দেখা করতে বলেছে ওকে। এখানকার পরিবেশ নাকি ক্রমশ নাজুক হয়ে উঠছে। দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল রানা। ওর উপর নজর রাখার জন্যে পাঁচজন লোক রয়েছে এই রেস্তোরাঁতেই, ...ইরে আরও অনেক বেশি লোক পাহারা দিচ্ছে। কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না পপকিন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিনল্যান্ডে যেতে চাইছে সে।

'ঠিক আছে,' লরেলির ম্লান মুখের দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্কভাবে বলল রানা, 'ফোন করে বাতিল করে দিচ্ছি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা। খুশি?'

দ্রুত মাথা নেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছে লরেলি, এমন সময় হঠাৎ যেন ভূত দেখে আঁতকে উঠল জুলি।

'কি হলো?'

'জ্যাক জাস্টিস আর তার বউ!'

দরজার দিকে তাকাল রানা। মস্ত হাতিটা ঢুকছে। পেছনে তার সহধর্মিণী পেত্নী, লুসি।

'কারা ওরা?' অদ্ভুত জুটির দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে আছে লরেলি।

'আমাদের পরিচিত একটা দম্পতি,' বলল জুলি। 'দুনিয়ার সেরা বোর ওরা। একবার যদি বসার সুযোগ পায়, তিন ঘন্টার আগে ওঠানো যাবে না।'

'সে কি!' বাবার দিকে তাকাল লরেলি। একটা হাত চেপে ধরল সে রানার, 'লক্ষ্মী আব্বু, কিছু একটা উপায় করো! প্লীজ!'

'বলছিস!' কৌতুকে চিকচিক করছে রানার চোখ দুটো। 'দেখবি কেমন অভিনয় করি?' খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে কলম বের করল রানা। 'কানের কাছে বোমা পড়লেও খেয়াল করব না আমি। বলবি আমি সাংঘাতিক একটা...'

'কাজে ব্যস্ত!' রানার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উৎসাহে প্রায় লাফিয়ে উঠল লরেলি। চাপা কণ্ঠে বলল, 'আঁকিবুঁকি কাটো, জলদি! এসে পড়ল বলে!' হঠাৎ

বিরক্তি ফুটে উঠল লরেলির মুখে, দ্রুত একবার দেখে নিল দরজার দিকটা, জ্যাক জাস্টিস বা তার বউ কেউ এদিকে তাকিয়ে নেই দেখে হাত তুলে রানার মাথার চুল এলোমেলো করে দিল, 'আব্বু, তুমি কিছু জানো না। কাজপাগল বিজ্ঞানীর চুল উষ্কখুষ্ক থাকে।'

নিবিষ্ট ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়ল রানা কাগজের উপর। খস খস করে কি সব লিখছে। ভুরু কুঁচকে আছে ওর। সাংঘাতিক ব্যস্ত। ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে ছিঁড়ে দু'টুকরো করল লরেলি, পাকিয়ে দুটো গোল বল তৈরি করে রানার দু'কানে গুঁজে দিল।

দূর থেকে শোনা গেল জ্যাক জাস্টিসের গলা। 'ওই যে, পেয়ে গেছি শ্রোতা! গল্পটা আজ দারুণ জমবে!' এগিয়ে আসছে সে পেছনে লুসিকে নিয়ে।

'ও মা, আমাদের আন্তনের সাথে ওই ছুকরীটা আবার কে!' খনখনে গলায় বলল লুসি।

'স্ স্ স্,' ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল জুলি। 'আন্তন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত, কেউ যেন বিরক্ত না করে তাই আমরা পাহারা দিচ্ছি।'

তিন চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে জ্যাক জাস্টিস। তার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল লুসি। কিছু বলতে যাবে, কিন্তু বাধা দিল লরেলি।

'লাভ নেই,' দুষ্টুমির হাসি লরেলির ঠোঁটে। 'আব্বুর কানের দরজায় তালা মারা।'

লরেলির দিকে তর্জনী তুলে স্ত্রীর দিকে তাকাল জ্যাক জাস্টিস। ফিস ফিস করে বলল, 'মেয়ে, আন্তনের মেয়ে, বুঝলে?'

'মনে হচ্ছে দজ্জাল মেয়ে,' খোনা গলায় বলল লুসি। তীব্র কটাক্ষ হানল লরেলির দিকে। 'ইঁচড়ে পাকা। চলো, যাই...'

যাবার ইচ্ছে নেই জ্যাক জাস্টিসের, কিন্তু লুসি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

হাসি চেপে রাখতে পারছে না লরেলি, জুলির কাঁধে মুখ লুকিয়েছে।

কোনার একটা টেবিলে গিয়ে বসেছে জ্যাক জাস্টিস। 'এই সুযোগে কেটে পড়া যেতে পারে,' বলল জুলি।

অমনি উঠে দাঁড়াল রানা। হন হন করে দরজার দিকে এগোচ্ছে। খবরের কাগজটা পড়ে থাকল টেবিলেই। জুলি আর লরেলি দ্রুত অনুসরণ করল ওকে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়েই তিনজন ফেটে পড়ল অদম্য হাসিতে। বাপের কান থেকে কাগজের বল দুটো বের করল লরেলি। 'ভাগ্যিস কিছু শুনতে পাওনি। তা নাহলে কি হত বলা যায় না।'

'কেন? কেন?' ঘাড় ফিরিয়ে খালি টেবিলটা দেখল রানা।

'নিগ্রো মেয়েটা আমাকে কি বলেছে জানো?'

শার্টের আস্তিন গুটাচ্ছে রানা, 'কি বলেছে?'

আরেকবার খিলখিল করে হেসে উঠল লরেলি আর জুলি। 'থাক,' বলল লরেলি। 'মেয়েলোকের কথায় কান দিতে নেই।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, মাফ করে দিলাম ওকে,' বলল রানা। আড়চোখে

দেখল পত্রিকাটা তুলে নিচ্ছে একজন।

গভীর রাতে নক হলো দরজায়। পপকিনের গলা শুনে দরজা খুলে দিল রানা। করিডরে দাঁড়িয়ে আছে জুনেস্কি। হাত দুটো ট্রাউজারের দু'পকেটে ঢোকানো। চোখাচোখি হতে হাসল। ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। ঘুরল।

চেয়ারে বসে চুরুট ধরাচ্ছে পপকিন। 'আর দেরি না করে রওনা হতে চাইছি আমরা। কোন অসুবিধে আছে তোমার?'

'লরেলিকে কি বলব?' এগিয়ে এসে পপকিনের সামনে চেয়ারে বসল রানা।

'কিভাবে নিচ্ছে তোমাকে সে?'

'চেহারাটা বাপের, তাই বাপ বলেই মেনে নিয়েছে,' বলল রানা। 'কিন্তু আচরণটা বাপের নয়, প্রতিদিন পঞ্চাশ বার করে শুনিয়ে দিচ্ছে কথাটা।'

'ধরতে পারেনি, তাই না?'

'পারেনি। তবে, পারবে।'

'ভাবছিলাম,' বলল পপকিন। 'সাথে করে ওকে নিয়ে গেলে কেমন হয়? ফেউয়েরা কি ভাববে?'

'হোয়াট?'

'চিন্তা করে দেখো ব্যাপারটা,' বলল পপকিন। 'চেক করে ওর পরিচয় জেনে নেবে ওরা, যখন জানবে ও ফিলাতভের মেয়ে, তোমার আইডেনটিটি সম্পর্কে ওদের কারও মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে না। তোমার কাভারের জন্যে এটা খুব কাজ দেবে।'

'আমি ওর নিরাপত্তার কথা ভাবছি,' বলল রানা। 'আপনি গ্যারান্টি দিতে পারেন?'

'অবশ্যই!' বলল পপকিন। 'সেদিকটা তো আমি দেখবই।'

অনেকক্ষণ ভাবল রানা। 'ঠিক আছে, ওকে জিজ্ঞেস করে দেখব।' আরও খানিক ভাবল রানা। 'আপনি চাইছেন ফিনল্যান্ডে নিয়ে যাই ওকে। আমি চাইছি না। এতে ওর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়বে, সেই সাথে পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার ঝুঁকিটাও। ও যদি টের পেয়ে যায়, তার জন্যে আমাকে দায়ী করতে পারবেন না।'

'ওর বাপ যে ধরনের আচরণ করত ওর সাথে, ঠিক সেই ধরনের আচরণ যদি করো...'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'যতদূর বুঝতে পেরেছি, মেয়ের সাথে ফিলাতভ পশুর মত আচরণ করত। আমি তা চেষ্টা করেও পারব না।' হঠাৎ তিক্ত হাসল রানা, 'তবে আমার আচরণে এমনিতেও যথেষ্ট আঘাত পাচ্ছে ও। একটা খেলনা ভাল্লুক, সেটার নাম আমি ভুলে গেছি দেখে আজ থিয়েটার থেকে ফিরে এসে কেঁদে ফেলেছে ও। এ-ধরনের আরও অনেক ঘটনা ঘটছে।'

'শুভ লক্ষণ,' বলল পপকিন। 'এ ধরনের আঘাত পেয়েই অভ্যস্ত ছিল মেয়েটা। যাই হোক, কাজের কথাটা বলি এবার। আগামীকাল বিকেলে হেলসিঙ্কিতে প্রফেসর পেন্টি ক্যারিয়ানেন-এর সাথে তোমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তোমার

সেক্রেটারি সব ব্যবস্থা করেছে?'

'প্রফেসর···ইনি আবার কে।'

'নিকোলাই ফিলাতভের সহকারী ছিলেন। তোমার কাজ হলো নিকোলাইয়ের ছেলে হিসেবে পরিচয় দিয়ে যথাসম্ভব তথ্য বের করে নেয়া। বিশেষ করে জানতে চেষ্টা করবে তুমি, ১৯২৯ পর্যন্ত নিকোলাই তাঁর ল্যাবরেটরিতে ঠিক কি ধরনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর এক্স-রে-র ওপর রিসার্চ সম্পর্কে আর কেউ কোন খবর রাখে কিনা জানতে চাই আমি।'

পরদিন সকালে ওরা সবাই প্লেনে চড়ে ফিনল্যান্ডে পৌঁছল।

বাপকে নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছে লরেলি। এটা তার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। এর আগে বাপের কাছ থেকে অবহেলা পেয়ে অভ্যস্ত ছিল সে, তাই বাপের প্রতি তার নিজেরও তেমন ভালবাসা ছিল না। কিন্তু বাপ আর সে-বাপ নেই। সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। মেয়ের জন্যে এত ভালবাসা ছিল তার বুকে, বিশ্বাস করাই কঠিন। এত ভালবাসা সইবে তো?

অপ্রত্যাশিত ভালবাসা আর স্নেহ পেয়ে লরেলির মধ্যেও বাপের প্রতি উথলে উঠেছে শ্রদ্ধা আর ভালবাসা। বাপের স্বাস্থ্য, মেজাজ, সুবিধে-অসুবিধে ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি ব্যাপারে সে একটা দায়িত্ব বোধ করছে। প্রতিদান দেবার জন্যে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে। এই অপ্রত্যাশিত ভালবাসা থেকে আবার যাতে বঞ্চিত হতে না হয় সেজন্যে বাপের মন যুগিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তাটুকু ভালভাবেই অনুভব করছে সে। হারাবার একটা ভয় সব সময় বুকে চেপে আছে তার।

ফিনল্যান্ডে যাবার প্রস্তাব পেয়ে সাংঘাতিক খুশি হয়েছে ও। ও যে সাবালিকা হতে চলেছে, সাথে করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবটা তারই স্বীকৃতি হিসেবে নিয়েছে। কিন্তু মাঝখানে জুলির উপস্থিতিটাকে এখনও মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি ও। মেয়েটা ভাল, অস্বীকার করার উপায় নেই ওর। ওর সাথে তো অদ্ভুত ভাল আচরণ করে। ওর নিজের মা-ও এতটা যত্ন নেয়নি ওর, জুলি যেমন নিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত জুলি যদি বাপের সাথে একটা স্থায়ী সম্পর্কে বাঁধা পড়ে, খারাপ লাগবে ওর, আঘাত পাবে মনে, কিন্তু ঘৃণা করবে না জুলিকে। ঘৃণা করা যায় এমন মেয়ে নয় জুলি।

আরও একটা ব্যাপারে বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছে লরেলি। অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ করেছে সে বাপের স্বভাবে। কথা বলার সময় হঠাৎ হঠাৎ এক প্রসঙ্গ থেকে আরেক প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে কোনরকম কারণ ছাড়াই। এ-ধরনের যতগুলো ঘটনা ঘটেছে প্রতিবার অদ্ভুত ভাবে হেসেছে বাবা ওর দিকে তাকিয়ে। কি যেন একটা ঘাপলা আছে কোথাও, কিন্তু ধরতে পারছে না লরেলি।

স্মৃতিও দুর্বল হয়ে গেছে বাবার। এটা তার আরেকটা উদ্বেগের কারণ। অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অথচ বেমালুম ভুলে বসে আছে বাবা। স্মরণ করিয়ে দিলেও মনে করতে পারে না—অথচ, যেন ভোলেনি, এই রকম ভাব দেখাতে গিয়ে হুঁ-হ্যাঁ করে। ভাল্লুকটার কথাই ধরা যাক। বাপের দেয়া প্রেজেন্টেশন ওটা, নামকরণও বাবা করেছে. অথচ ওটার কথা কিছুই তার মনে নেই।

যাই হোক, ফিনল্যান্ডে বাবা ওকে নিয়ে এসেছে বলে ও বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ। জিজ্ঞেস করেছিল, 'ইউনিভার্সিটির এই প্রফেসরের কাছে কেন যাচ্ছ, আব্বু?'

উত্তরে বলেছে রানা, 'আমার বাবার সহকর্মী ছিলেন এই ভদ্রলোক, বাবার সম্পর্কে কিছু জানার জন্যে যাচ্ছি। যাবে তুমি?'

'দাদুর কথা জানতে পাব, যাব না মানে।' উৎসাহের সাথে বলেছে লরেলি।

লরেলির হাত ধরে ইউনিভার্সিটির স্টাফ কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে আসছে রানা। 'উনি খুব জ্ঞানী লোক তাই না, আব্বু?'

অন্যমনস্কভাবে 'হুঁ' বলল রানা। পপকিনের কথা ভাবছে ও। অহেতুক সন্দেহে ভুগছে লোকটা। পক্বকেশ বৃদ্ধ পেন্টি ক্যারিয়ানেন-এর কাছ থেকে যা জানা গেছে তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই তার। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের দিকে বুড়ো নিকোলাই ফিলাতভ এক্স-রে-র উপর রিসার্চ করলেও, ব্যাপারটা সম্পর্কে জানে এমন কেউ এখন আর জীবিত নেই। বুড়োর সহকারীরা সবাই মারা গেছে ইতোমধ্যে। একমাত্র সহকারী পেন্টি ক্যারিয়ানেন জীবিত থাকলেও, নিকোলাইয়ের তখনকার কাজকর্ম সম্পর্কে বিশদ কিছুই জানে না।

'আমার মনে হচ্ছিল,' বলল লরেলি, 'পটিয়ে পাটিয়ে ভদ্রলোকের কাছ থেকে কি যেন তথ্য বের করার চেষ্টা করছ তুমি।'

এত চালাক হওয়া ভাল নয়—ভাবল রানা। প্রকাশ্যে বলল, 'অনেকটা ঠিকই ধরেছ। বাবার সম্পর্কে কিছুই জানি না, তার কাজ কর্ম সম্পর্কে তো একেবারেই অজ্ঞ, চেষ্টা করছিলাম...'

'তা নাহয় বুঝলাম,' নাছোড়বান্দার মত বলল লরেলি। 'কিন্তু তোমার সম্পর্কে ভদ্রলোক যতগুলো প্রশ্ন করলেন, লক্ষ করলাম সবই তুমি চমৎকার কৌশলে এড়িয়ে গেলে। কেন বলো তো?'

'সময় বাঁচাবার জন্যে,' ভারী গলায় বলল রানা। 'বুড়ো মানুষ, গল্প পেলে মেতে উঠবেন, তোমাকে নিয়ে আর সিবেলিয়াস মেমোরিয়্যাল দেখতে যাওয়া হবে না, তাই।'

'উঁহু,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল লরেলি। 'সেটা কোন কারণ নয়। আব্বু, তুমি কি যেন লুকাচ্ছ আমার কাছে!' মেয়ের কণ্ঠস্বরে অভিমান।

'ছাড়বেই না যখন, তাহলে সত্যি কথাটাই বলি,' বলল রানা। 'আমার বেশির ভাগ কাজ ডিফেন্স সংক্রান্ত। বিদেশে এসে নিজের সম্পর্কে যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল। এবার বুঝেছ?'

বুঝতে চাইছে না লরেলি। মেনে নিতে পারছে না রানার যুক্তি। গম্ভীর হয়ে আছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'বোধ হয়।'

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছে ওরা। পথে কেউ কারও সাথে কথা বলল না।

'দেখতে ঠিক যেন একটা অরগ্যান, তাই না, আব্বু?' ধারণাটা সমর্থন করবে বাবা, এই আশায় রানার মুখের দিকে তাকাল লরেলি। 'কী-বোর্ড থাকলে বাজানো যেত! ভাবতে বেশ একটু আশ্চর্য লাগে, সিবেলিয়াস একজন অর্কেস্ট্রাবাদক ছিলেন, তাই

তো, নাকি?'

'বোধ হয়,' বলল রানা। গাইড বুকে দ্রুত চোখ বুলাল ও। 'ওজন আটাশ টন, এবং একটা মেয়ের হাতে তৈরি! কাজটাকে তুমি নারী স্বাধীনতার প্রাচীন নমুনা হিসেবে ধরতে পারো। এসো, বসি, কত জাতের ট্যুরিস্ট আসছে ওদের প্যারেড দেখা যাক।'

বাস থেকে একদল লোক নামছে! বেঞ্চিতে বাপের গা ঘেঁষে বসল লরেলি। অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছে নবাগত ভ্রমণবিলাসীদের দিকে, কিন্তু নিচের ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবছে সে। স্টকটন আর জুনেস্কিকে মনুমেন্টের নিচে দিয়ে অলস ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে দেখতে পাচ্ছে রানা। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সাগরের দিকে তাকাল ও। মেঘহীন নীলচে আকাশের গায়ে গাঢ় নীল পতাকার মত বাতাসে উড়ছে ইয়টের পালগুলো। ভাবছে রানা, কবে নাগাদ রওনা হতে বলবে ওকে পপকিন?

'কি সুন্দর, না?' বাপের দৃষ্টি অনুসরণ করে সাগর দেখছে লরেলি। 'ফিনল্যান্ড যে এত সুন্দর, স্বপ্নেও ভাবিনি। মেডিটারেনিয়ানের তীরের কোন দেশ মনে হয়, অনেকটা ইবিজার মত! সেই যে ওখানে গিয়েছিলাম—তোমার মনে আছে, আব্বু?'

'হুঁ-হুঁ,' মৃদু গলায় বলল রানা।

হাসছে লরেলি। 'সেই বিদঘুটে হোটেলটার কথা এখনও আমার মনে আছে, গরম পানি পাওয়া যায় না শুনে সে কি রাগ তোমার। কি যেন নাম ছিল মালিকটার—ইয়া মোটা লোকটা?'

'মনে নেই,' বলল রানা। মনে নেই বলাতে তেমন কোন ঝুঁকি নেই, ভাবছে রানা, যার সাথে দেখা হবে তার নামই মনে রাখতে হবে এমন কোন কথা নেই।

'তারপরই জঘন্য ঘটনাটা ঘটল। আমি তো কেঁদেই মরে যাচ্ছিলাম। ওরা তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। যন্ত্র দিয়ে পেট থেকে কি সব বের করল একগাদা। বলল সি ফুড পচা ছিল, ফুডপয়জনিং হয়েছে।'

'পেটটা আমার চিরকালই একটু অবাধ্য,' বলেই বুঝল রানা, বোধহয় ভুল করে ফেলল। ফিলাতভের পেট সম্পর্কে তার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুলও হতে পারে। কিন্তু লরেলি প্রতিবাদ করল না দেখে হাঁফ ছাড়ল একটা। সাগরের দিকে হাত তুলে দেখাল ও। 'ওখানে বোধহয় ওই ইয়টগুলো রেস করছে?'

'হ্যাঁ,' বলল লরেলি, 'ইয়টগুলোকে দেখে আমাদের হেসপেরিয়ার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, আব্বু। এই গ্রীষ্মে তুমি যদি ওটা নিয়ে সাগর ভ্রমণে না বেরোও···বেরুবে নাকি! সেরকম কিছু ভেবেছ?'

'এখনও ঠিক করিনি কিছু,' গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল রানা। 'সময় পাব বলে মনে হয় না···'

'আগেই জানিয়ে দিয়ো। আমার বন্ধুরা আমাকে ধরেছে, ওদেরকে নিয়ে আমিই বেরুব কিনা ভাবছি।'

কি বলবে রানা? এখন চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

'চুপ করে আছ কেন?' লরেলি বলল, 'দেখো, আব্বু, আনন্দটা মাটি কোরো না কিন্তু! জিম কাকাকে জানিয়েছি, সে আমাকে কথাও দিয়েছে সব ব্যবস্থা করে রাখবে। এখন তুমি অনুমতি দিলেই হয়। ওটা যখন তোমারই ইয়ট।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু সাবধান, কোন বিপদ ঘটিয়ে বোসো না আবার।'

'দু'বছর আগে নতুন একজোড়া পাল কিনতে চেয়েছিলে তুমি—কিনেছিলে?'

'হ্যাঁ,' দ্রুত উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলো যাই। হোটেলে একজনের সাথে দেখা করব কথা দিয়েছি, বেচারা অপেক্ষা করবে।'

'সবই বড় রহস্যময়,' বলল লরেলি, 'সত্যি কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে,' জোর করে হাসছে মেয়েটা, 'নাকি স্রেফ অজুহাত?'

অস্বস্তি বোধ করছে রানা। কষ্ট করে হাসল। 'না-না, অজুহাত হবে কেন! আসলে জ্যাক জাস্টিসকে কথা দিয়েছি ওর সাথে ড্রিঙ্ক করব, এই আর কি।' কথাটা মিথ্যে নয়।

বিস্ময় ফুটে উঠল লরেলির চেহারায়। 'ওরাও ফিনল্যান্ডে এসেছে নাকি?'

'হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করায় বলল, দুনিয়াটা গোল, ঘুরে ফিরে নাকি সবার সাথে দেখা হয়ে যায় সবার।'

'হুঁ,' বলল লরেলি। গম্ভীর। 'চলো তাহলে।'

হোটেলে ফিরল ওরা। লবি পেরিয়ে এলিভেটরের দিকে যাচ্ছে। 'তোমার কামরায় যাব, কিছু মনে করবে?' লবির চারদিকে তাকাল লরেলি। 'তোমার সাথে কথা আছে।'

'কি কথা?'

হোটেলের প্রবেশ পথের দিকে হাত তুলল লরেলি। 'অনেক কথা। তার মধ্যে একটা ওই লোকটা সম্পর্কে। কে ও?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই জুনেস্কিকে দেখতে পেল রানা।

'ওর মত আরও ডজন দু'য়েক লোক আছে। যেখানেই যাচ্ছি আমরা, পিছু লেগে থাকছে।' চাপা গলায় বলল লরেলি। 'কেন?'

'তুমি তো জানোই আমি ডিফেন্সের হয়ে কাজ করি।' হাসল রানা, 'আমার নিরাপত্তা সম্পর্কে তাদের একটা দায়িত্ব আছে।'

খুশি হলো না লরেলি। প্রচণ্ড ভাবাবেগ দমন করে রেখেছে সে, মুখ দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা।

'আমার মনে হয় সব কথা খুলে বললে তুমি ভালই করবে। তোমার, না আমার কামরায়?' জেদের সুরে বলল লরেলি।

থমকে গেছে রানা। ঝড়ের পূর্বাভাস পাচ্ছে। 'ঠিক আছে,' হাল ছেড়ে দিয়ে বলল ও।

এলিভেটরে চড়ে চারতলায় উঠল ওরা। তালা খুলে পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াল রানা। লরেলির পিছু পিছু ঢুকল কামরায়। 'আর কি কথা, লরেলি?'

'আ...আন্তন, কোথাও তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ।' ধীরে ধীরে বিছানায় বসল লরেলি। 'কেন?'

'ফাঁকি?' মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল রানা।

'অস্বীকার করতে পারো?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে লরেলি রানার চোখের দিকে। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো।

'ফাঁকি?' ঢোক গিলে বলল রানা। 'না তবে কিছু রহস্য আছে। যা তোমাকে বলা যায় না। আমার ব্যবসার স্বার্থে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লরেলি। চোখে পলক নেই। শিরদাঁড়া খাড়া।মুখের চেহারা থমথম করছে। ডান হাতে খামচে ধরে আছে চাদরটা। 'আমার ভয় লাগছে!'

'ভয়ের কিচ্ছু নেই। আমার ওপর যাতে কোন হামলা…'

'সেজন্যে নয়।'

'তাহলে?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল রানা। ঘামতে শুরু করেছে ও।

'ভয় লাগছে তোমাকে চিনতে পারছি না বলে… কোথাও গোলমাল আছে…'

দ্রুত থামিয়ে দিল লরেলিকে রানা। 'এ তোমার কল্পনা।' উঠে দাঁড়াল সে। 'লরেলি, এবার বোধহয় থামা উচিত।' কঠিন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছে রানা চেহারায়। 'তুমি প্রলাপ বকছ।'

'না, থামব না!' গলাটা কেঁপে গেল লরেলির। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল সে-ও। 'সিবেলিয়াস মেমোরিয়্যালের গোটা ইতিহাস তোমার জানা, কেননা তুমি একজন ফিন। অথচ, এখন তুমি কিছুই জানো না।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, ওকে থামিয়ে দিল লরেলি।

কাঁপছে মেয়েটা। 'সব গোলমাল করে ফেলেছ তুমি। ধরা পড়ে গেছ। ইবিজায় জীবনে কখনও যাইনি আমি, এবং আমার জানা মতে, ফুড পয়জনিংয়ের জন্যে কখনও তোমাকে হাসপাতালে যেতে হয়নি।'

স্তম্ভিত হয়ে গেছে রানা। 'লরেলি!'

গলা চড়ছে লরেলির। চোখ দুটো কুঁচকে উঠেছে। 'হেসপেরিয়া নামে কোন ইয়ট নেই কোথাও—আর ওই লোকটা, জিম কাকা, তারও কোন অস্তিত্ব নেই! অথচ একটা অস্তিত্বহীন ইয়টের জন্যে তুমি একজোড়া পালও কিনেছ!'

রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। চোখের কোণে পানি চিকচিক করছে। বোঝা যাচ্ছে, সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে সে।

কাঁপুনিটা থামছে না। চিৎকার করে উঠল অকস্মাৎ, 'তুমি আমার বাবা হতে পারো না!' পরমুহূর্তে খাদে নেমে গেল লরেলির গলা। অসহায়, বিমূঢ়, আতঙ্কিত দেখাচ্ছে তাকে। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি আমার আব্বু নও! কে তুমি?'

আমিই রানা-২

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৭৯

এক

ঢাকা।

মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেড অফিস। মস্ত বিল্ডিংটার আন্ডার গ্রাউন্ড এবং ছয় ও সাততলা জুড়ে ফার্স্ট আওয়ারের দারুণ কর্মব্যস্ততা।

ছয়তলা। লম্বা করিডরের দু'পাশে সারি সারি অফিসরূম। টেলেক্স, অয়্যারলেস, কমপিউটর, টিভি ও নানান রকম ইলেকট্রনিকস্ যন্ত্রপাতি নিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে অপারেটররা। নানারকম যান্ত্রিক শব্দ হচ্ছে। সব শেষে বারোটা কামরা, অনেক বাছাই ও পরীক্ষার পর মনোনীত দুঃসাহসী, প্রতিভাবান এজেন্টদের। করিডরের এপাশে ছয়টা, ওপাশে ছয়টা। প্রয়োজনে মানুষ হত্যার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এদের। এপাশের ছয়টা কামরায় বসে রূপা, পাশা, শাহেদ, জিয়া, শান্তি, শিউলী। ওপাশে রাশেদ, তারেক, সাঈদ, মামুন, প্যাটেল, পারভিন। অজ্ঞাত সংখ্যক আরও অনেক এজেন্ট সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। তারা ক'জন, কে কোথায় আছে, কি করছে ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার চীফ মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান ছাড়া আর জানে মাত্র একজন—চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ।

উপস্থিত এজেন্টরা সবাই ফাইল-ওঅর্ক নিয়ে ব্যস্ত। কাজের যত চাপই থাকুক, চা খাবার ফাঁকে ছোটখাট আড্ডা, লাঞ্চের সময় হৈ-হট্টগোল রোজকার ব্যাপার, একঘেয়ে কর্মব্যস্ততার মাঝখানে টক-ঝাল-মিষ্টির মত চাটনি—কিন্তু গত ক'দিন থেকে এসব একেবারে বন্ধ। কেউ নিষেধ করেছে বা কিছু, তা নয়। আসলে মন ভাল নেই কারও, মুড অফ। নাক-মুখ গুঁজে কাজ করছে সবাই, কিন্তু হলে হবে কি, কেন যেন কাজে ভুল হয়ে যাচ্ছে বিস্তর।

এই বারোজন এজেন্টের ইমিডিয়েট বস্ এখন সোহানা চৌধুরী। কাজের ফাঁকে অবসর মুহূর্তে বেদম হাসি ঠাট্টা চলে ওর সাথে, ভাবী বলতে সবাই অজ্ঞান। কিন্তু কাজের সময় খাপ মুক্ত তলোয়ারের মত ধারাল সোহানা, পান থেকে চুন খসলে রক্ষে নেই, নির্মম কথার ছুরি সেঁধিয়ে দেয় কলজের মধ্যে, অবস্থা খারাপ করে দেয়। কিন্তু গত কয়েক দিন থেকে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন ঘটেছে। ভুল দেখে ভুরু কুঁচকে উঠছে তার, বিরক্তির ভাব ফুটছে চেহারায়, কিন্তু ওই পর্যন্তই, পরমুহূর্তে মুখের চেহারা দাঁড়াচ্ছে ভাবলেশহীন। একটা দীর্ঘশ্বাস দমন করছে সে নিঃশব্দে। সকলের মনের অবস্থা যে কি, তা তো তার অজানা নেই কিছু।

অদ্ভুত একটা ভৌতিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে গোটা অফিসে। কাজ থেকে হাত গুটিয়ে বসে নেই কেউ, কিন্তু থমথম করছে পরিবেশটা।

সাততলায় চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেলের মুখোমুখি কামরাটাই এখন রানার। বর্তমানে খালি। দরজা বন্ধ। তালা মারা। রানার পাশের কামরাটা জাহেদের। পদোন্নতির সাথে সাথে দুটো গুরু দায়িত্ব বর্তেছে জাহেদের কাঁধে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা এজেন্টদেরকে সরাসরি পরিচালনা করা ছাড়াও অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে সাহায্য করছে সে সোহেলকে। জাহেদের পাশে সলীলের কামরা। সে এখন ইউরোপের অপারেশন্যাল চীফ। ইউরোপের তেষট্টিজন অপারেটার মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে ওকে সন্তুষ্ট করার জন্যে—ওর মুখের সামান্য হাসি আর মৃদু পিঠ চাপড়ানির জন্যে। তার পাশের কামরাটা সোহানার। হেডকোয়ার্টারের স্পেশাল এজেন্টদের ইমিডিয়েট বস্ই নয় শুধু, ওর কাঁধে গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অপারেশন্যাল চীফের দায়িত্বও চেপেছে। ওর পাশে আরও দুটো কামরা রয়েছে বিভিন্ন এলাকার অপারেশন্যাল চীফদের। জাহেদ-সলিলদেরই সমসাময়িক এরা—হাসান আর তিমির।

দশটা ঊনষাট মিনিট। সোহেলের চেম্বার। রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে সোহেল। গালে হাত। ঝুঁকে পড়েছে ডেস্কের উপর। সামনেই অনেকগুলো টেলেক্স মেসেজ। আবার এক এক করে সবগুলোয় চোখ বুলাল সে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল নিজের অজান্তে। হেলান দিল চেয়ারে। সিলিঙের দিকে চোখ। গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবছে। একটু পর বন্ধ করল চোখ দুটো। কপালে চিন্তার রেখাটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এক মিনিট পর চোখ মেলল সে। রিস্টওয়াচ দেখল। তড়াক করে চেয়ার ছাড়ল। সর্বনাশ! ঠিক এগারোটায় যাবার কথা বসের চেম্বারে। পনেরো সেকেন্ড দেরি হয়ে গেছে।

টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে দ্রুত বেরিয়ে এল সোহেল করিডরে। পাশেরটাই মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেম্বার। পর্দা সরিয়ে বাইরের কামরায় ঢুকল সোহেল।

সোহানা, রূপা এবং ইলোরা। তিন মাথা এক করে কি যেন আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে। মন মেজাজ খারাপ, কারও মুখে হাসি নেই। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সোহেল, কিন্তু হাঁটার গতি একটুও শ্লথ হলো না। কামরাটা পেরিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াল একটা দরজার সামনে। নক করল মৃদু। সাথে সাথে জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'কাম ইন।'

ভিতরে ঢুকে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে নিবিষ্ট মনে একটা ফাইলে মুখ গুঁজে থাকতে দেখল সোহেল। চোখ না তুলেই বললেন, 'বসো।'

একটা চেয়ারে বসল সোহেল।

ধীরেসুস্থে ফাইলটা বন্ধ করলেন রাহাত খান। বাঁ হাতে একটা হাভানা চুরুট জ্বলছে। 'কোন খবর পেলে ওর?' কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট বিরক্তি।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল সোহেল। 'না, স্যার। কেউ কোন খবর দিতে পারছে না।'

'শেষবার কবে কোথায় ওকে দেখা গেছে তাও জানতে পারোনি?' প্রশ্ন তো

নয়, ধারাল ছুরির ফলার মত তিরস্কার।
'তা জানা গেছে, স্যার,' ঢোক গিলে বলল সোহেল। নার্ভাস ফিল করছে সে। একটা অপ্রীতিকর তথ্য প্রকাশ করতে হবে এখন ওকে সে-কথা ভেবেই ঘামছে। 'ছয় দিন আগে শেষবার দেখা গেছে তেল আবিবে।'
'তেল আবিবের কোথায়?'
'জাফার একটা ফ্ল্যাটে, স্যার।'
'কারও সাথে, নাকি একা?'
'রাত দশটা এগারোটার দিকে ফ্ল্যাটে ফেরে ও, সাথে···মানে, রানার সাথে একজন ছিল···মানে, একটা মেয়ে। নাম তাতিনা, সোসাইটি গার্ল···'
'বুঝেছি। তারপর?' দ্রুত প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন রাহাত খান। মুখের চেহারায় একটা প্রকট অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠেছে।
'মেয়েটিকে আমাদের লোক ধরেছিল,' বলল সোহেল। 'তার বক্তব্য, গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায়, পাশে রানাকে সে দেখতে পায়নি···'
হাত নেড়ে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করলেন মেজর জেনারেল, 'ডিটেলসে যাবার দরকার নেই।'
'ভয় পেয়ে যায় মেয়েটা। কোন গোলমাল হয়েছে বুঝতে পেরে ফ্ল্যাট থেকে পালিয়ে যায় একা। পুলিস বা আর কাউকে কিছু জানায়নি। আমাদের লোক খবর নিয়ে জেনেছে মেয়েটা এসপিয়োনাজের সাথে কোনভাবেই জড়িত নয়।'
'সেই শেষ? তারপর থেকে আর কারও চোখে পড়েনি রানা?'
'না, স্যার।'
'রানা এজেন্সির এজেন্টরাও কিছু বলতে পারছে না?'
'সবাইকে অ্যালার্ট করে দিয়েছিলাম। প্রায় সব বড় শহর থেকেই রিপোর্ট পেয়েছি ওদের। কেউ কিছু বলতে পারছে না। হেড অফিস থেকে প্রত্যেক এজেন্টের কাছে ইমার্জেন্সী রেড সিগন্যাল পাঠানো হয়েছে।'
'হুঁ,' এই প্রথম ভুরু কুঁচকে মৃদু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন রাহাত খান। চুরুটে ঘন ঘন টান দিলেন ক'বার। সোহেলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। 'তুমি কিছু অনুমান করতে পারো? গেল কোথায়?'
একটু অসহায় দেখাল সোহেলকে। ঠিক কি বলবে, মনস্থির করতে পারছে না। ইতস্তত করছে। 'এর আগে এমন কখনও হয়নি, স্যার। আমার বিশ্বাস রানা কোন বি···'
'কি ধরনের বিপদ?'
ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠল সোহেল। বলল, 'আমি জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স···'
এবারও সোহেলকে কথা শেষ করতে দিলেন না মেজর জেনারেল। 'তোমার এ বিশ্বাসের কারণ?'
'কোন তথ্য এখনও পাইনি, স্যার,' মৃদু কণ্ঠে বলল সোহেল। 'কিন্তু তেল আবিব থেকে নিখোঁজ হয়েছে···'
'এত সহজে ধরা পড়বে রানা, আমি বিশ্বাস করি না,' কণ্ঠস্বরে বিরক্তির কোন

কমতি নেই, কিন্তু সেই সাথে রানার প্রতি অগাধ বিশ্বাসেরও ভাব ফুটে উঠল তাঁর বলার ভঙ্গিতে। 'জায়গাটা তেল আবিব বলেই অসাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করবে রানা। ও জানে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হাতে ধরা পড়া মানে অবধারিত মৃত্যু।' কি যেন ভাবলেন তিনি, আপন মনে বললেন, 'উঁহুঁ,' তারপর কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কিন্তু তোমার সন্দেহ কখনও মিথ্যে হয় না, এটাই যা দুশ্চিন্তার কথা। শোনো,' কথা শেষ না করে নিভে যাওয়া চুরুটে অগ্নি সংযোগ করলেন তিনি।

সোহেল দেখল বসের ডান কপালে একটা রগ তিড়িক তিড়িক করে লাফাচ্ছে। 'সারা পৃথিবীর সমস্ত এজেন্ট আর অপারেটরদের···'

'ইমার্জেন্সী সিগন্যাল পাঠাব?'

'হ্যাঁ। আর শোনো, খবর নাও, রানা যেদিন থেকে নিখোঁজ তার আগে এক হপ্তার মধ্যে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স বড় ধরনের কোন কাজে হাত দিয়েছে কিনা। ওদের নাম করা এজেন্টদের গতিবিধি সম্পর্কে রিপোর্ট চাই—রানা নিখোঁজ হবার আগে এবং পরে ওরা কে কোথায় ছিল, কি করছিল—ডিটেলস।'

'ইয়েস, স্যার।'

সামনের ফাইলটা আবার খুলছেন রাহাত খান। তার মানে, এবার তুমি যেতে পারো।

বস্ এখন একা অস্থির ভাবে পায়চারি করবেন, জানে সোহেল। ইচ্ছা হলো আশ্বাস দিয়ে কিছু বলে, কিন্তু রানার মুখটা হঠাৎ ভেসে উঠল চোখের সামনে। আবেগে গলাটা বুজে এল সোহেলের। যদি সত্যিই ও ধরা পড়ে থাকে···আর ভাবা যায় না। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে চট্ করে চেয়ার ছাড়ল ও, দরজার দিকে এগোল। ভাবছে, রানা নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে। ওকে সাহায্য করতে হবে। সবচেয়ে আগে ওর খোঁজ চাই। প্রয়োজন হলে গোটা বি.সি.আই. এর সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে···।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সোহেল। সামনেই সোহানা। বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। সোহেলকে দেখল, কিন্তু ঠিক যেন চিনতে পারছে না। চট্ করে রূপা আর ইলোরার দিকে তাকাল সোহেল।

নিজের চেয়ারে বসে আছে ইলোরা। মাথাটা ডেস্কের উপর নামানো।

আর রূপা, অফিসের সবচেয়ে বাস্তববাদী, ভাবাবেগশূন্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে যার খ্যাতি, দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে পিঠটা।

'কি হয়েছে, সোহানা?'

তিন সেকেন্ড কোন প্রতিক্রিয়া ঘটল না সোহানার মধ্যে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি অপরিবর্তিতই রইল। শুধু বাঁ হাতটা উঠে এল পাশ থেকে। হাতটা কাঁপছে, কাঁপছে হাতে ধরা কাগজটাও।

ছোঁ মেরে সোহানার হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিল সোহেল। দেখেই বুঝল, এটা একটা টেলেক্স মেসেজ।

মেসেজটা পড়ল সোহেল। একবার, দুবার, তিনবার। চোয়াল দুটো উঁচু হলো।

চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা। কারও দিকে না তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল দরজার দিকে মুখ করে। দরজার কবাট ধরে দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। তারপর নক করল, উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

পায়চারি থামিয়ে নিঃশব্দে তাকালেন মেজর জেনারেল। সোহেলের রক্তশূন্য মুখের চেহারা দেখে কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল।

সামনে গিয়ে দাঁড়াল সোহেল। 'আমরা বোধহয় চিরকালের জন্যে হারিয়েছি ওকে, স্যার,' চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বরের কাঁপুনিটা রোধ করতে পারল না সে। 'রানা জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হাতে ধরা পড়েছে।'

মেসেজটা হাত বাড়িয়ে নিলেন মেজর জেনারেল। শান্তভাবে এগিয়ে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসলেন। কাগজটা ডেস্কে রেখে ঝুঁকে পড়লেন সেটার দিকে। কপালে চিকচিক করছে চিকন ঘাম।

ফিনল্যান্ড। ইসরায়েলী দূতাবাস।

সুসজ্জিত একটি কামরা। সবুজ রেক্সিনে মোড়া ডেস্কের ওধারে বিশাল শরীর, চৌকো মাথায় গোল করে ছাঁটা ধবধবে সাদা চুল নিয়ে বসে আছে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশন্যালের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান চীফ কার্ল পপকিন। ডেস্কের এধারে বসে আছে সাইকিয়াট্রিস্ট কোগিন, অপারেটর জুনেস্কি, অপারেটর ম্যাক, অপারেটর ফেজ।

'আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না,' কোগিনের দিকে তাকিয়ে বলল পপকিন। 'রানাকে আবার একবার ভাল করে চেক করে দেখতে হবে আপনার। সেজন্যেই আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে।'

'ঠিক কি...'

'বলছি,' কোগিনকে বাধা দিয়ে বলল পপকিন। 'আমি জানতে চাই অতীত-স্মৃতি অল্প কিছুদিনের মধ্যে ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা রানার আছে কিনা। সে ধরনের কোন সম্ভাবনা থাকলে সাথে সাথে আবার পোস্ট হিপনোটিক সাজেশন প্রয়োগ করবেন আপনি।' কোগিন অবাক হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল তাকে পপকিন। 'প্লীজ, সব কথা জানতে চাইবেন না। আমরা টপ সিক্রেট একটা কাজে জড়িত রয়েছি।'

কোগিনের জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। পপকিনের কথার অর্থ বুঝে নিয়েছে সে: রানার ভাল মন্দ সম্পর্কে মাথা ঘামাতে নিষেধ করে দেয়া হলো তাকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল সে।

জুনেস্কির দিকে তাকাল পপকিন। 'রানা এখন কোথায়?'

'দেখে এসেছি লরেলিকে নিয়ে ওর কামরায় ঢুকেছে,' বলল জুনেস্কি। 'স্টকটন তার লোকজন নিয়ে আশপাশেই আছে।'

'ফোন করো ওকে। বলো, আমি ডাকছি।'

ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ে ক্রেড্‌ল্ থেকে রিসিভারটা নিতে যাবে জুনেস্কি, সবাইকে চমকে দিয়ে ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোনটা। দ্রুত চোখাচোখি

হলো পপকিনের সাথে জুনেস্কির। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল সে। পাঁচ সেকেন্ড শুনল, তারপর বাড়িয়ে ধরল রিসিভার পপকিনের দিকে। 'আপনার, স্যার। স্টকটন কথা বলতে চাইছে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল পপকিনের। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে কর্কশ গলায় জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, স্টকটন?'

চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল স্টকটন, 'আমার কামরায় ছিলাম আমি, খোলা দরজা দিয়ে রানার কামরার দরজা দেখতে পাচ্ছিলাম। এই একটু আগে দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এল লরেলি। তাকে দেখেই করিডরে বেরুলাম আমি। আমাকে খামচে ধরে সে বলল, রানা সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তার জ্ঞান নেই। রানার কামরায় গিয়ে দেখি মেঝেতে লম্বা হয়ে পড়ে আছে সে। এইমাত্র ওর জ্ঞান ফিরেছে।'

'এখন কেমন? সুস্থ?'

'বলছে।'

'সেক্ষেত্রে তোমরা ওকে এক্ষুণি এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। এখানে কোগিন আছেন, ওকে পরীক্ষা করবেন।'

কয়েক সেকেন্ডের বিরতি, তারপর স্টকটন বলল, 'লরেলি বলছে সে-ও যাবে রানার সাথে।'

'অসম্ভব!' বলল পপকিন। 'যেভাবে হোক ওকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এসো তোমরা।'

'সমস্যাটা বোধহয় আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারিনি আমি; স্যার,' বলল স্টকটন। 'করিডরে লরেলি আমাকে বলেছে রানা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে—ফিলাতভ বা আব্বু নয়।'

কপালে উঠে গেল পপকিনের ভুরু জোড়া। 'কি!'

'জ্বী, স্যার।'

আক্রোশে মুখের চেহারাটা হিংস্র হয়ে উঠল পপকিনের। দশ সেকেন্ড লাগল চেহারাটা স্বাভাবিক হতে। 'ওকে নিয়ে এসো,' শান্ত গলায় নির্দেশ দিল সে, 'কড়া পাহারা দিয়ে নিয়ে এসো। দু'জন যেন কথা বলতে না পারে, সেদিকটাও দেখতে হবে।' রিসিভার রেখে দিয়ে কোগিনের দিকে তাকাল সে। 'আবার সেই টিপিক্যাল হিস্টিরিক্যাল সিম্পটম দেখা দিয়েছে রানার, শঙ্কায় জর্জরিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে তন্দ্রায়। ঘুমটা অবশ্য ইতিমধ্যে ভেঙেছে। আসছে ও।'

অদ্ভুত একটা খুশির ভাব ফুটে উঠেছে পপকিনের চেহারায়। এর অর্থটা বুঝতে পারল কোগিন। রানা এখনও তার অতীত স্মৃতি খুঁজছে, কিন্তু খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ছে, এটা বুঝতে পেরেই তার এই আনন্দ।

'মেয়েটাও আসছে, তাই না?' জানতে চাইল কোগিন।

'হ্যাঁ। ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে সে।'

'ও-ই দায়ী,' বলল কোগিন। 'নিশ্চয়ই বিপজ্জনক কিছু প্রশ্ন করে রানার মনে প্রচণ্ড একটা আলোড়ন তুলেছে সে।'

চুপচাপ বিশ মিনিট অপেক্ষা করল ওরা। ঘন ঘন টান দিয়ে চুরুটের অর্ধেকটা ছাই করে ফেলল পপকিন। কোগিন পা লম্বা করে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে, দৃষ্টি সিলিঙের দিকে। কপালে একসারি চিন্তার রেখা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এর মধ্যে জুনেস্কি। নিঃশব্দে পায়চারি করছে।

টোকা পড়ল দরজায়। সবাই সচকিত হয়ে উঠল। জুনেস্কি দরজা খুলে সরে দাঁড়াল একপাশে। প্রথমে রানা, তারপর লরেলি এবং সবশেষে কামরায় ঢুকল স্টকটন।

পপকিন একদৃষ্টিতে দেখছে রানাকে। 'পাশের কামরায় তোমার সাথে কোগিন কিছু কথা বলবেন, কিছু মনে করবে তুমি, রানা?'

'না,' শান্তভাবে বলল রানা। কোগিন চেয়ার ছেড়ে একটা দরজার দিকে এগোচ্ছে দেখে তার পিছু নিল ও।

ওদের পিছনে দরজা বন্ধ হতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পপকিন, লরেলিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মিস লরেলি, আমার নাম কার্ল পপকিন। ইসরায়েল সরকারের একজন স্পেশাল অফিসার। এরা আমার অধীনস্থ কর্মচারী, মি. জুনেস্কি, মি. ফেজ, মি. ম্যাক, এবং মি. স্টকটন।'

পপকিনের কথা শেষ হতেই কামরায় ঢুকল জুলি। তাকে দেখে মুখের চেহারা আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল লরেলির। পপকিন বলল, 'মিস জুলিকে তো আগে থাকতেই তুমি চেনো।'

'লোকটার শত্রু হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবে চিনতাম,' সাথে সাথে উত্তর দিয়ে জুলির দিক থেকে ঝট্ করে মুখ ফিরিয়ে নিল লরেলি। রানা যে কামরায় ঢুকেছে সেটার দিকে হাত লম্বা করে দিয়ে বলল, 'কে ওই লোক? আমার আব্বু কোথায়?'

'শান্ত হয়ে বসো,' বলল পপকিন। ইঙ্গিতে একটা চেয়ার এগিয়ে দিতে বলল জুনেস্কিকে।

জুনেস্কি একটা চেয়ার টেনে দিল লরেলির সামনে। কিন্তু লরেলি বসল না। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দিন,' বলল সে। 'কি চলছে এখানে, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। লোকটা বলল ওর নাম নাকি মাসুদ রানা, তারপর যে কাহিনী শোনাল তা অবিশ্বাস্য...'

'কিন্তু মিথ্যে নয়,' বলল পপকিন। 'তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বসলেই সব বুঝিয়ে দিতে পারি আমি।'

বসল তো না-ই, গলা চড়ে গেল লরেলির। 'আমার আব্বু কোথায়? আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন আগে।' ঋজু, দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। অনমনীয়, উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পপকিনের চোখের দিকে। এতগুলো বয়স্ক, বিশালদেহী পুরুষকে অতটুকুন মেয়েটা একেবারেই গ্রাহ্য করছে না।

'ছিঃ, লরেলি,' দ্রুত পায়ে লরেলির পাশে এসে দাঁড়াল জুলি, 'ভুল বুঝে এতটা উত্তেজিত হওয়া তোমার উচিত হচ্ছে না,' তার কাঁধে একটা হাত রাখল সে। 'বসো। সব বলা হবে তোমাকে। তোমার আব্বু সুস্থ আছেন, ভাল আছেন। যা কিছু ঘটছে, দেশেরই স্বার্থে ঘটছে। এবং এতে তোমার আব্বুর সম্মতি আছে পুরোপুরি।'

জুলির দিকে ঝট্ করে ফিরল লরেলি। 'কোথায় তিনি?'

'তেল আবিবে,' বলল পপকিন। 'কিছু সময় দাও, তার সাথে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগও তুমি পাবে।'

'তাহলে ওই লোক যা বলছে সব সত্যি?'

'ঠিক কি বলেছে ও তোমাকে?'

নিঃশব্দে শুনল ওরা। লরেলির কথা শেষ হতে উপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল পপকিন। রানার উপর খুশি হয়েছে সে, লরেলিকে ওর পিতামহের কাগজপত্র সম্পর্কে কিছুই বলেনি ও। 'হ্যাঁ, এই হলো প্রকৃত ঘটনা। সবই তুমি জেনেছ, এবং যা জেনেছ তা সবই সত্য। এখন, ভেবে দেখো, এই পরিস্থিতিতে তোমার কি উত্তেজিত হবার সঙ্গত কোন কারণ আছে?'

লরেলির চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পপকিন আরও কিছু বলবে, এই আশায় অপেক্ষা করছে।

'আচ্ছা, রানার পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর তুমি ওকে কিছু প্রশ্ন করেছ? ওর অতীত ইতিহাস জানতে চেয়েছ বা কিছু?'

'চেয়েছি। কিন্তু পুরোপুরি উত্তর দিতে পারেনি ও। কে ও?'

উত্তরটা এড়িয়ে গেল পপকিন। চেহারায় থমথমে একটা গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলল সে। 'কাজটা ভাল করোনি,' বলে একটু বিরতি নিল। ধীরে ধীরে বসল আবার চেয়ারে। প্যাকেট থেকে চুরুট বের করে ধরাল, 'অবশ্য অতীত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে ওর ক্ষতি হতে পারে তা তোমার জানা ছিল না। যাকগে, যা হবার হয়েছে। কিন্তু সাবধান, ভবিষ্যতে এমন মারাত্মক ভুল আর কখনও কোরো না। সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে ওর।'

দপ্ করে জ্বলে উঠল লরেলি। 'ও যা বলছে তার চার ভাগের একভাগও যদি সত্যি হয়, ওর সর্বনাশ করে ছেড়েছেন আপনারা। ক্ষতি হবে? সাংঘাতিক বিপদ হবে? ক্ষতি আর বিপদ হতে কিছু বাকি আছে ওর? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝেছি, এই মুহূর্তে ওকে কোন মেন্টাল হসপিটালে পাঠিয়ে দেয়া দরকার।'

'ডক্টর কোগিন একজন সাইকিয়াট্রিস্ট,' বলল পপকিন। 'তিনি ওর চিকিৎসা করছেন। ভাল কথা, হঠাৎ রানা সব কথা তোমাকে বলতে গেল কেন?'

'আমার ফাঁদে ধরা...'

'ফাঁদ?'

একটু নরম হলো লরেলি। ওর সন্দেহের কথাটা বলল, তারপর কিভাবে ফাঁদে ফেলেছে রানাকে তা-ও ব্যাখ্যা করল।

মৃদু হাসল পপকিন। 'একেই বলে বাপকা বেটি। সত্যি, দারুণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ। তবে, বেশিদিন ফাঁকি দিতে পারা যাবে না, তা আমরাও জানতাম। কিন্তু আশা করেছিলাম, অন্তত আরও একটা দিন সময় পাব। আগামীকাল তোমাদের দু'জনকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলার ইচ্ছা ছিল আমার।'

'আশ্চর্য!' আবার রাগে লাল হয়ে উঠল লরেলির মুখের চেহারা। 'কি ভেবেছেন আপনি? আমরা কি আপনার দাবার ঘুঁটি?'

হাসি হাসি মুখ করল পপকিন। 'লরেলি, একটা কথা তোমার জানা নেই। রানাকে জোর করে কিছু করাচ্ছি না আমরা। আমাদের কাজটা সম্পর্কে সব কথা জানার পর স্বেচ্ছায় ও রাজি হয়েছে সহযোগিতা করতে।'

'বাজে কথা! পাগল বানাবার পর সব কথা জানানো হয়েছে ওকে—এখন ওর একমাত্র আশ্রয় আপনারা, সহযোগিতা না করে উপায় কি ওর? ব্ল্যাকমেইলিং ছাড়া কি বলবেন আপনি একে?'

পপকিনের পিছনের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে এল কোগিন। সন্তর্পণে দরজাটা ভিজিয়ে দিচ্ছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে কোগিনকে একা দেখেই বলল পপকিন, 'স্টকটন, রানার কাছে যাও।'

'দরকার নেই,' বলল কোগিন, 'একটু পরই বেরিয়ে আসছে ও। চিন্তা করার কিছু খোরাক দিয়ে এসেছি ওকে আমি।'

'কেমন বুঝলেন?'

'সব ঠিক আছে,' সংক্ষেপে বলল কোগিন। ডেস্ক ঘুরে এসে পপকিনের সামনের একটা চেয়ারে বসল।

'লরেলিকে কি বলেছে না বলেছে সব মনে করতে পারছে?'

'তা পারছে,' কোগিন গম্ভীর। 'তবে ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মিস লরেলি কি জিজ্ঞেস করেছিল মনে করতে পারছে না।' পাশে দাঁড়ানো লরেলির দিকে তাকাল সে। 'কি জানতে চেয়েছিলে তুমি?'

'ওর পরিচয়।'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল কোগিন। 'এমন ভুল দ্বিতীয়বার কোরো না। এ ব্যাপারে তোমার সাথে কথা বলব আমি।'

'তার দরকার হবে না,' কড়া মেজাজের সাথে বলল পপকিন। 'তেল আবিবে, ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে।'

ঠাণ্ডা চোখে কোগিনকে লক্ষ করছে লরেলি। 'আপনি ডাক্তার?'

সিগারেট ধরাচ্ছে কোগিন। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'সার্টিফিকেটগুলো জাল নয় তো?' স্পষ্ট গলায় জানতে চাইল লরেলি। 'আমার তো সেইরকমই সন্দেহ হচ্ছে। তা নাহলে নিজের পেশেন্টকে কোন ডাক্তার জেনেশুনে এইরকম সর্বনাশের পথে পা বাড়াতে দেয়?' কোগিনের চেহারা লাল হয়ে উঠছে, কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই ঝট্ করে পপকিনের দিকে তাকাল লরেলি, বলল, 'আপনার কথার উত্তরে বলছি, তেল আবিব নয়, আমি এখান থেকে সোজা জেনেভায় যাচ্ছি। সমস্ত খবরের কাগজ, জাতিসংঘের মানবাধিকার সংরক্ষণ সমিতি এবং প্রত্যেক কলেজ আর ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের এখানে যা ঘটছে তা জানা দরকার। জানাবার দায়িত্বটা আমিই নিতে যাচ্ছি।'

'তোমার জায়গায় আমি হলে সে চেষ্টা করতাম না,' শান্তভাবে বলল পপকিন।

'কিন্তু আমি করব ' দৃঢ় চ্যালেঞ্জের সুরে বলল লরেলি। 'কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না।'

রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিল পপকিন। তাকাল জুনেস্কির দিকে। 'অবস্থা

দেখে মনে হচ্ছে এখান থেকে ওকে বেরুতে দেয়া উচিত হবে না, জুনেস্কি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে এক্ষুণি। হোটেলের বুকিং বাতিল করা, ইত্যাদি।'

'কিন্তু তারপর কি?' ডান হাত ছুঁড়ে জানতে চাইল লরেলি। 'ক'দিন এখানে আমাকে আটকে রাখবেন? জেনেভায় একদিন আমি যাবই। খবরের কাগজগুলো লুফে নেবে আমার কাহিনী।'

'মাই গড!' বলল জুনেস্কি। 'সর্বনাশ করে ছাড়বে দেখছি! সব জানাজানি হয়ে গেলে...'

'তুমি চুপ করো।' ধমক মারল পপকিন।

'তাহলে? তাহলে কি করবেন আমাকে নিয়ে? বলুন?' কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাইল লরেলি পপকিনের মুখের দিকে। 'খুন করবেন?'

'তোমাকে নিয়ে ওরা কিছুই করতে যাচ্ছে না,' পপকিনের পিছন থেকে শান্ত গলায় বলল রানা। দরজাটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'আমি যা বলব তাই হবে। তা নাহলে আমার বদলে অন্য লোক খুঁজতে হবে ওদের।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না পপকিন। বলল, 'একটা চেয়ার টেনে বসো, রানা। এর একটা সমাধান চাই আমরা।'

পপকিনের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসল রানা, 'গায়ের জোরে সমাধান আসবে না। আমাকে হারাতে হবে তাহলে।'

'বেশ,' বলল পপকিন। 'এবার না হয় যুক্তি দিয়ে চেষ্টা করা যাক। ঠিক কি চাও তুমি, লরেলি?'

হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়ল লরেলি। 'চাই...আমি চাই আপনারা ওর ওপর যে অন্যায়টা করছেন তা বন্ধ করুন।' কাঁপা একটা হাত তুলে দেখাল রানাকে।

'ওর ওপর কোন অন্যায় আমরা করছি না। এটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ও একজন স্বেচ্ছাসেবক। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখলেই তো পারো।'

'কি জিজ্ঞেস করব? নিজের পরিচয়ই যার জানা নেই, ভাল-মন্দ বোঝার কতটুকু ক্ষমতা রাখে সে? আইনের দৃষ্টিতে এটা একটা ক্রাইম।'

'সাবধান!' হঠাৎ বলল কোগিন, তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে রানাকে।

'ওর চিকিৎসা দরকার, আর দেরি না করে ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন,' আবেদনের সুরে বলল লরেলি।

'চিকিৎসা করা হচ্ছে,' কোগিনকে দেখিয়ে বলল পপকিন। 'কোগিন একজন বিখ্যাত সাইকিয়া...'

'ওর সম্পর্কে আমার ধারণা কি তা তো আমি আগেই জানিয়েছি!'

'আচ্ছা,' ভুরু কুঁচকে বলল পপকিন। 'রানার ব্যাপারে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন তুমি? এখন তো জেনেছ, সে তোমার বাবা নয়। একজন অপরিচিত লোক, তার বিষয়ে...'

মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকাল লরেলি। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'অপরিচিত বলছেন কেন?' মাথা তুলে পপকিনের চোখে চোখ রাখল। 'বাবাকে সারা জীবনে যতটুকু ভালবেসেছি, এই ক'দিন তার চেয়ে অনেক বেশি ভালবেসে ফেলেছি ওকে।

তাছাড়া,' তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলল লরেলি, 'অনাত্মীয় হলেই কি তার সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হবে? প্রতিটি মানুষের প্রতি প্রতিটি মানুষের একটা দায়িত্ব আছে, স্কুলে থাকতেই তো এ কথাটা শেখানো হয়েছে আপনাকে, ভুলে গেছেন সব?'

নিরাশ ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে হেলান দিল পপকিন। 'আমি হার মানছি। এবার তুমি চেষ্টা করে দেখো, রানা।'

ডেস্কের ওধারে দাঁড়ানো লরেলির দিকে তাকাল রানা। 'বসবে, লরেলি?' মৃদু কণ্ঠে বলল ও।

যন্ত্রচালিতের মত বসে পড়ল লরেলি চেয়ারে। রানার মুখের দিকে অদ্ভুত এক সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'কাজটা কি তা জানার পরই সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছি এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ—দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এর সাফল্যের ওপর।'

'কাজটা ভাল কি মন্দ, নিরাপদ কি বিপজ্জনক তা তুমি জানছ কিভাবে?' লরেলি ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ল। 'বিচার করে দেখার যোগ্য এখনও নও তুমি।'

'সব দিক থেকে যোগ্য ও,' বলল পপকিন। 'দুঃখিত, রানা। আর বাধা দেব না।'

'ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই, তোমার একথা ঠিক নয়, লরেলি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'নিজের পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানি না, তাও নয় ব্যাপারটা। তোমাকে তো জানিয়েছি, আমি মাসুদ রানা। ইসরায়েলের একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক। সরকারের একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি।'

'কিন্তু ওরা তোমাকে তোমার অজান্তে...'

'সেকথা ঠিক,' বলল রানা। 'অনুমতি নিয়ে বা আগে থাকতে কিছু জানিয়ে এর মধ্যে জড়ানো হয়নি আমাকে। কিন্তু কাজটা সম্পর্কে বিস্তারিত সব মি. পপকিনের মুখে শোনার পর তার সাথে একমত হয়েছি আমি। অপারেশনটাকে সফল করতে হলে ডক্টর ফিলাতভ হিসেবে তোমার বাবার অভিনয় করে যেতে হবে আমাকে। ইচ্ছে করলে মি. পপকিনকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম। কিন্তু করিনি। কারণ, দেশের ভালটা আমার কাছে সবচেয়ে বড়। কাজটার গুরুত্ব তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, এই অপারেশন যদি সফল হয় তাহলে পৃথিবীর বুকে স্বনির্ভর জাতি হিসেবে আমরা শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারব। একলাফে একশো ধাপ এগিয়ে যাব আমরা। এই একই উদ্দেশ্যে তোমার আব্বুও কাজ করছেন। আমিও আমার নগণ্য ক্ষমতা দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করছি। আমি চাই তুমিও সহযোগিতা করো। দেশ আমাদের সবার কাছে ঋণী থাকবে।'

চুপ হয়ে গেছে লরেলি। পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। আবার কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেল রানা। কেউ কথা বলছে না। চঞ্চল হয়ে উঠেছে জুলি কিছু একটা করার জন্যে, কিন্তু সে-ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। বিস্মিত চোখে চেয়ে আছে পপকিন। কামরায় পিন-পতন স্তব্ধতা। দু'গাল বেয়ে নেমে আসছে চোখের পানি চিবুকের কিনারা থেকে। টপ্ টপ্ করে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে লরেলির কোলে। 'আমাকে কেন এভাবে ঠকানো হলো?' রুদ্ধ গলায় জানতে চাইল সে। 'যে বাপের

কাছ থেকে কোনদিন একটা নরম আদরের কথা শুনিনি, শোনার আশা করিনি, কেন তা আমাকে শোনানো হলো? কেন আমাকে ভুল বোঝানো হলো?' পপকিনের বুকের দিকে তর্জনী তুলল সে। 'জবাব দিন! আব্বু বদলে গেছে ভেবে এই যে আমি তাকে এত ভালবাসলাম, তাকে নিয়ে এত স্বপ্ন দেখলাম—বাপ-মেয়ে একসাথে কত সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব—তার কি হবে?' ডেস্কের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠল লরেলি। অদম্য কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ঘাড়, পিঠ।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা। জুলি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে লরেলিকে, 'ওঠো, চলো লরেলি, পাশের কামরায় যাই।'

চোখে হাত রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠল লরেলি। জুলি তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দে ওদের পিছু নিল কোগিন। সবাই দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে ওদেরকে।

দরজাটা ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে যেতেও কথা বলল না কেউ। ধীরে ধীরে আবার চেয়ারে বসল রানা। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ও। বলল, 'মেয়েটার ওপর অন্যায় করা হয়েছে।'

'ফিলাতভ যে এতবড় পাষণ্ড, জানা ছিল না আমার,' রানার দিকে ফিরল পপকিন। দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়, শয়তানি মাখা হাসিটা চেপে রাখল সে, বলল, 'তোমার দায়িত্ব আরও বাড়ল, রানা। ডাইভারশন থেকে ফিরে ওকে কিছুদিন সঙ্গ দিলেই ধীরে ধীরে ওর মনটা হালকা হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ডক্টর ফিলাতভের সাথেও হয়তো তোমার আলাপ করা দরকার হতে পারে।'

'অবশ্যই,' গম্ভীরভাবে বলল রানা, 'কাজটা সেরে ফিরে আসি, তারপর লোকটাকে কড়া ভাষায় কিছু...'

একটা হাঁফ ছেড়ে পপকিন বলল, 'এবার তাহলে আমরা কাজের কথা শুরু করতে পারি।' পায়ের কাছ থেকে একটা ব্রীফকেস তুলে ডেস্কে রাখল সে। খুলল সেটা। 'জুনেস্কি, জুলিকে ডাকো। সব কথা ওরও জানা দরকার।'

উঠে দাঁড়াল জুনেস্কি, এগোল পাশের কামরার দিকে।

প্রতিবাদ করল রানা, 'বিপদ-আপদে মেয়ে মানুষকে না জড়ালেই নয়?'

'সবাই জানে ফিলাতভের বান্ধবী ও,' বলল পপকিন। 'ও সাথে থাকলে ব্যাপারটা স্বাভাবিক দেখাবে।' মুচকি হাসল সে। 'বিপদ-আপদ থাকলেই বা, ফিলাতভের ছদ্মবেশে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট তো সাথেই থাকছে, ওর ভয় কি?'

একটা গর্বের ভাব ফুটে উঠল রানার চেহারায়। 'ধন্যবাদ,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও।

পাশের কামরা থেকে জুনেস্কির পিছু পিছু বেরিয়ে এল জুলি। জানতে চাইল রানা, 'লরেলি শান্ত হয়েছে?'

'চিন্তা কোরো না,' জুনেস্কির পাশের চেয়ারে বসে বলল জুলি। 'ডক্টর কোগিন ওকে বোঝাচ্ছেন।'

কেশে উঠল পপকিন। অমনি সবাই চুপ হয়ে গেল। 'আমরা জানি,' শুরু করল সে, 'বেশ কয়েকটা দল ফিলাতভের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। এখন আমাদের লক্ষ্য হবে রানার আচরণ এবং গতিবিধি যাতে ওদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ

এবং কৌতূহলোদ্দীপক হয় তার আয়োজন করা।'

ফিনল্যান্ডের বড় একটা ম্যাপের ভাঁজ খুলে ডেস্কের উপর বিছাল সে। মুখ তুলে তাকাল ফেজ আর ম্যাকের দিকে। কামরায় ঢোকার পর থেকে ওরা একটাও কথা বলেনি কারও সাথে। 'রানা,' বলল পপকিন, 'এদের দু'জনের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ম্যালকম ফেজ, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সে তোমার সহকারী।' একটা বদ চরিত্রের সবরকম চিহ্ন, ভাব এবং লক্ষণ ফুটে আছে লোকটার চেহারায়। নিচের ঠোঁটটা মাঝখানে কাটা, প্রায় দু'ভাগ করা, মুখের চেহারায় কুৎসিত একটা কলঙ্ক। চোখ দুটো ছোট ছোট। নীচ স্বভাবের লোক, দেখেই বোঝা যায়। শরীরটা নাদুসনুদুস। 'আর ও হলো মাইকেল ম্যাকগ্রে, এ-ও তাই, তোমার সহকারী।' ছুঁচোর মত মুখ এর, প্রায় ছয় ফিট লম্বা, মস্ত দুই কাঁধ। এ লোক সাংঘাতিক নিষ্ঠুর, ঢুলু ঢুলু চোখ দুটো জাত খুনীর। 'মোট ছয়জন যাচ্ছ তোমরা…'

'কে কে?' জানতে চাইল্ রানা।

'স্টকটন, ফেজ, ম্যাক, ডন, জুলি এবং তুমি। ডন তোমাদের সাথে পরে যোগ দেবে।'

অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা। 'জুনেস্কি যাচ্ছে না?'

'না। ওকে অন্য কাজে পাঠাচ্ছি।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু কি ভেবে চুপ করে গেল।

'দলের নেতৃত্বে থাকছে স্টকটন…'

প্রতিবাদের সুরে বলল রানা, 'স্টকটন? কেন?'

রানার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে আছে পপকিন।

'মি. পপকিন, আপনিই বলেছেন আমি জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম দুর্ধর্ষ স্পাই,' বলল রানা। 'এখন আপনিই বলুন, স্টকটনের অধীনে কাজ করা কি আমার উচিত হবে?'

'কিন্তু শত্রুরা সে কথা জানে না,' বলল পপকিন। 'তাদের চোখে তুমি একজন গোবেচারা বিজ্ঞানী।'

'তাতে কি? নেতৃত্ব যদি আমাকে দেয়া হয়, সেটাও তারা জানছে না।' একটু বিরতি নিল রানা। 'এটা আমার প্রেসটিজের প্রশ্ন। আমি আপস করতে পারব না। দুঃখিত।'

জুনেস্কির সাথে দৃষ্টি বিনিময় হলো পপকিনের। সকলের অজ্ঞাতে মাথাটা একচুল নাড়ল জুনেস্কি।

'ঠিক আছে,' গম্ভীর হয়ে বলল পপকিন। 'তোমার দাবির মধ্যে যুক্তি আছে বুঝতে পেরে দলের নেতৃত্ব তোমার হাতেই তুলে দিচ্ছি। কিন্তু, সাবধান, দলের আর সকলের পরামর্শ ছাড়া তুমি কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে বোসো না। এবং লক্ষ রাখবে, সর্দারী ফলাতে গিয়ে শত্রুদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ো না যে তুমি বিজ্ঞানী নও, একজন স্পাই। তাহলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

একগাল হাসল রানা। 'পাগল হয়েছেন! এমন অভিনয় করব যে…'

'আগামীকাল প্লেনে নর্দার্ণ ল্যাপল্যান্ডের ইভালোয় চলে যাচ্ছে ম্যাক,' ম্যাপের

এক জায়গায় তর্জনী দিয়ে দেখাল পপকিন, 'এইখানে। ফিনল্যান্ডের এর চেয়ে উত্তরে প্লেন যায় না। ওখানে একটা গাড়ি অপেক্ষা করবে ওর জন্যে। সেটা নিয়ে আরও উত্তরে, নরওয়েজিয়ান বর্ডারের কাছে, কেভোন টুটকিমুসাসেমায় চলে যাবে ও। কেভো নেচার প্রিজার্ভ-এর অনুসন্ধান ঘাঁটি ওটা, ওখান থেকে একটা লাফ দিলেই আদিম, বুনো জগতে গিয়ে পড়বে।'

ম্যাকের দিকে তাকাল পপকিন। 'তোমার কাজ হবে বাইরে থেকে গোটা দলটাকে কাভার দেয়া। প্রথমেই কেভো ক্যাম্পটা চেক করে নেবে, অবাঞ্ছিত কেউ বা কোন দল আগে থাকতে গিয়ে ওত পেতে আছে কিনা। রানার অধীনে দলটা ওখানে যাবার পর থেকে মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি সরাবে না তুমি। কিন্তু, কোনরকম সিগন্যাল দেবে না বা যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে না, ওদেরকে তুমি যেন চেনোই না। বুঝেছ?'

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ বেরোল শুধু ম্যাকের গলার অনেক গভীর অঞ্চল থেকে।

'রানা, তুমি তোমার দল নিয়ে হেলসিঙ্কি থেকে রওনা হবে গাড়িতে। সম্ভবত পরশু দিন। কেভো ক্যাম্পে পৌঁছুতে তোমাদের দু'দিন লাগবে। ম্যাককে ওখানে পাবে তোমরা, কিন্তু ওকে না চেনার ভান করবে। তোমরা বিপদে পড়লে ও তোমাদেরকে রক্ষার চেষ্টা করবে বাইরে থেকে।' পপকিনের তর্জনী ম্যাপের সামান্য দক্ষিণ দিকে সরে গেল। 'এরপর তোমরা কেভো নেচার পার্ক এক্সপ্লোর করতে যাবে। বৈরী এলাকা ওটা তাঁবু ইত্যাদি দরকার হবে।' জুনেস্কির দিকে আঙুল তুলল সে। 'যা যা লাগে, সব জোগাড় করে ফেলো।'

'ওখানে যাবার উদ্দেশ্য কি আমাদের?' জানতে চাইল রানা। 'শত্রুপক্ষদের ঠিক কি বোঝাতে চাইছি?'

চেয়ারে হেলান দিল পপকিন। 'ফিলাতভের ডোশিয়ার থেকে যতটুকু জেনেছি, ন্যাচারাল হিস্ট্রি সম্পর্কে তার কোনই আগ্রহ ছিল না। ঠিক, জুলি?'

'সে একজন নির্ভেজাল টেকনোলজিস্ট, ন্যাচারাল হিস্ট্রি তার কাছে নীরস একটা ব্যাপার।'

'সুতরাং, এখন যদি ফিলাতভ এই সাবজেক্টের ওপর আগ্রহী হয়, লোকের চোখে সেটা বেখাপ্পা ঠেকবে। যারা ওর ওপর লক্ষ্য রাখছে তারা ঘাবড়ে যাবে, ভাববে, এর মধ্যে গভীর কোন রহস্য ও তাৎপর্য আছে। সেটাই আমি চাই।' রানার কাঁধে টোকা মারল পপকিন। 'সাধারণ কিছু ইন্সট্রুমেন্ট সাথে নেবে তুমি—থিয়োডলাইট ইত্যাদি এবং এমন আচরণ করবে, কি যেন খুঁজে বের করতে চাইছ। ঠিক কি বলছি, বুঝছ তো?'

'গুপ্তধন জাতীয় কিছু খুঁজছি।'

'ঠিক। কেভোতে একদিন থাকবে তোমরা। দক্ষিণ দিকে, সোমপিয়োর নেচার পার্কে যাবে। ওখানেও তুমি এই আচরণ করবে। অভিনয়টা চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না আমার ডাক পাও।'

'কিভাবে ডেকে পাঠাবেন আমাদের?' প্রশ্ন করল রানা।

'ভুয়োটসো নামে ওখানে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে,' বলল পপকিন। 'পোস্ট অফিসে মাঝে মাঝে খোঁজ নেবে তোমরা। এদিকের কাজ শেষ হলেই আমি একটা টেলিগ্রাম পাঠাব।'

'আর একটু পরিষ্কার বুঝতে চাই,' বলল রানা। 'ফিলাতভ কিছু একটা খুঁজছে, কিন্তু সেটা ঠিক কোন্ নেচার পার্কে আছে তা তার জানা নেই, এবং যা খুঁজছে তা মাটির নিচে পোঁতা আছে, সূত্র বলতে তার জানা আছে কিছু ল্যান্ডমার্ক, সেজন্যেই থিয়োডলাইটের সাহায্যে কোণ মাপামাপির চেষ্টা করছে সে—এই তো ব্যাপারটা?'

'হুবহু,' বলল পপকিন। 'কিন্তু আসলে ওই পার্কগুলোর নিচে কিছুই পোঁতা নেই। কিন্তু সেটা যেন তোমার আচরণে কোনমতে প্রকাশ না পায়। একটা নকশাও তৈরি করে রেখেছি আমি শত্রুদেরকে ভাঁওতা দেবার জন্যে।

'মাত্র একটা?' ভুরু কুঁচকে বলল রানা।

'তোমার কোন সাজেশন আছে?'

'যদি কারও হাতে ধরা পড়ি, নকশাটা ওরা চাইবে, তাই না?'

'প্রথমে রাজি হবে না, কিন্তু তারপর ওদের হুমকি শুনে ভয় পেয়ে দিয়ে দেবে।'

'কিন্তু দিলেও ওরা বলবে, এটা আসল নকশা নয়।'

'হুঁ,' বলল পপকিন। 'তাহলে একটু অদলবদল করে আরেকটা নকশা তৈরি করাতে হয়!'

'উঁহুঁ,' বলল রানা। 'আরও কয়েকটার দরকার। শত্রুপক্ষ তো আর একটা নয়। ভাল কথা, মোট ক'টা দল ওরা?'

'মার্কিন, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং কানাডিয়ান—এই পাঁচটা সম্পর্কে আমি শিওর, আরও গোটা কয়েক দল আছে। সব মিলিয়ে দশটাও হতে পারে। কিন্তু এতে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। তোমাকে ওরা...'

'ভয় পাচ্ছি তা কে বলল? তবে, কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমার।'

'গো অ্যাহেড।'

'ধরুন কোন দলের হাতে ধরা পড়েছি, নকশা পেয়েও ওরা সন্তুষ্ট হচ্ছে না, আমাকে সাথে নিয়ে মাটি খুঁড়তে চাইছে—কি করব তখন?'

'অগত্যা ওদের সাথে থাকবে।'

'তারপর?' বলল রানা। 'শেষ পর্যন্ত তো ওরা কিছুই পাবে না। না পেয়ে যদি...'

হাসল পপকিন। 'একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ, রানা। আমাদের কাছে তুমি মহামূল্যবান একটা রত্ন। কোন দল তোমাকে ছিনতাই করে বেশিক্ষণ রাখতে পারবে না। স্টকটনের নেতৃত্বে ওরা সবাই তোমাকে উদ্ধার করবে।'

খুশি হলো রানা। বলল, 'যাক, এদিকের দুশ্চিন্তা গেল। আরেকটা প্রশ্ন। ধরুন, হিসেবে ভুল হয়েছে আমাদের, ওরা আমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা না করে খুন করার চেষ্টা করছে—এই অবস্থায় কি করব আমি?'

অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে কয়েক সেকেন্ড রানাকে দেখল পপকিন। 'না, রানা। হিসেবে ভুল হতে পারে না। পৃথিবীর সব সোনার খনির যা দাম, তার চেয়েও বেশি

দাম ওদের কাছে ফিলাতভের। তাকে ওরা খুন করবে না।'

'তা জানি,' বলল রানা। 'কিন্তু ওরা ফিলাতভকে নয়, মাসুদ রানাকে যদি খুন করতে চায়?'

চোখ কপালে তুলে পপকিন বলল, 'বলতে চাইছ, তোমার পরিচয় যদি জেনে ফেলে...?'

'হ্যাঁ। ভুল তো মানুষেরই হয়, আমি তো আর ফেরেশতা নই।'

হাসল পপকিন। 'তোমার সাথে এত লোককে পাঠাচ্ছি তো সে কথা ভেবেই। যদি ভুল করো, তোমাকে ওরা রক্ষা করবে। আবার বলছি, তুমি আমাদের মহামূল্যবান একটা সম্পদ, রানা। তোমাকে হারাবার ঝুঁকি নিতে পারি না। যে-কোন হামলা থেকে ওরা তোমাকে রক্ষা করবে।'

'গুড,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল রানা। হঠাৎ খাদে নেমে গেল ওর কণ্ঠস্বর, পপকিনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। বলল, 'আরও কিছু গোপন প্রশ্ন আছে আমার। কারও সামনে সেসব আমি জিজ্ঞেস করতে চাই না।'

চোখের ইশারায় সকলকে চলে যেতে বলল পপকিন। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল সকলে। দরজা খুলে জুলি ছাড়া সবাই বেরিয়ে গেল করিডরে। পাশের কামরায় লরেলির কাছে গেল জুলি।

'কি, রানা?'

'আমার অভিনয়ের ওপর নির্ভর করছে গোটা অপারেশন,' বলল রানা। 'ডক্টর ফিলাতভ এবং আপনার নিরাপত্তাও, ঠিক কিনা?'

'নিশ্চয়।'

'শত্রুরা যদি জানতে পারে আমি ফিলাতভ নই, তাহলে আপনাদের দু'জনের নিরাপত্তা চুরমার হয়ে যাবে।'

'কিন্তু...'

'আমার সাথে যাদেরকে পাঠাচ্ছেন, তাদের মধ্যে কেউ যদি ডাবল ক্রস করে? শত্রুপক্ষরা যদি লোভ দেখিয়ে আসল কথাটা জেনে নেয় ওদের কারও কাছ থেকে...'

'রানা! তোমার কি মাথা খারাপ হলো?' আঁতকে উঠে বলল পপকিন। 'ম্যাক, ফেজ, ডন, জুলি—এরা জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের অনেক পুরানো এজেন্ট, এদেরকে অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। তুমি অহেতুক ভয় পাচ্ছ...'

'আপনাকে তো আগেই বলেছি, দেশের স্বার্থটা আমার কাছে সবচেয়ে বড়,' বলল রানা। 'সম্ভাব্য বিপদের কথাটা বললাম শুধু। ওরা বিশ্বস্ত না হলে এ কাজে ডাকতেন না, জানি, তবু সাবধানের মার নেই, তাই না? তেমন যদি কিছু টের পাই...'

'অসম্ভব!' বলল পপকিন। 'এদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক কেউ থাকতেই পারে না। এদের দেশপ্রেম তোমার চেয়ে কোন অংশে কম নয়, রানা। সন্দেহটা মন থেকে মুছে ফেলো। ভুলে যাও। ওরা সবাই দেশের জন্যে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে।'

হাসল রানা। 'ভেরি গুড! এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম আপনার মুখ থেকে। আর কোন দুশ্চিন্তা নেই আমার।'

'আর কোন প্রশ্ন?'

'আচ্ছা, আমরা তো চলে যাচ্ছি, এ সময়টা আপনি কি করবেন?'

পপকিনের মুখ দেখে রানার মনে হলো, প্রশ্নের উত্তরটা দিতে রাজি নয় সে। কিন্তু পপকিন সহজ গলায় বলল, 'ফিলাতভ এসে পৌছুলেই ওকে নিয়ে আমি রওনা হব সভেটোগোরস্কে। মাটি খুঁড়তে। বর্ডারের দিকে ইতিমধ্যে দু'জন লোককে পাঠিয়ে দিয়েছি, তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছে।'

'ফিলাতভ আর আপনি?' বিস্মিত দেখাল রানাকে। 'সাথে আর কেউ থাকবে না?'

'দরকার কি? কেউ জানছেই না আমরা কে, কোথায় যাচ্ছি।'

চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা।

''কি ভাবছ?'

'ফিলাতভ...ওর সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি, নিতান্তই ভীতু-প্রকৃতির, দুর্বল এক লোক। কতটুকু সাহায্য করতে পারবে আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়, ওর কাছ থেকে যা জানার জেনে নিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে গেলেই বোধহয় ভাল হত। এ ধরনের কাজের উপযুক্ত লোক বিজ্ঞানী ফিলাতভ নন। কেন যেন খুঁতখুঁত করছে মনটা। মনে হচ্ছে, দায়িত্বটা আমি নিলেই ভাল হত।'

'তাহলে ডাইভারশানে পাঠাব কাকে?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার চোখ দুটো। 'আরে, কথাটা তো মনেই পড়েনি আগে। আসল ফিলাতভকে ডাইভারশনে পাঠিয়ে দেয়া যাক। আপনার সাথে আমি যাই, কি বলেন?'

অবিশ্বাসভরা চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল পপকিন। এমন একটা প্রস্তাব দিয়ে হকচকিয়ে দেবে তাকে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি সে। ব্যাটার বুদ্ধির নাগাল পাওয়া সম্ভবই নয়, ভাবছে মনে মনে। 'ওয়াভারফুল আইডিয়া!' মনের রাগ মনে চেপে রেখে উৎফুল্ল ভাব দেখাল পপকিন। পরমুহূর্তে ঝাঁঝের সাথে বলল, 'কিন্তু কি জানো, পরিকল্পনাটা আমার নয়। হেডকোয়ার্টারে যারা আমার বস্, এটি তাদের কীর্তি। দেখা যাচ্ছে, তুমি তাদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিশুদ্ধি রাখো।' হাসল সে। 'ভবিষ্যদ্বাণী করছি, খুব দ্রুত আরও উন্নতি করবে তুমি।' সকৌতুকে চোখ মটকাল, 'একদিন হয়তো দেখা যাবে তুমিই আমার বস্ হয়ে বসেছ।'

'দোয়া করবেন,' সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল রানা।

দুই

কোথায় কান্না. কোথায় কি, রানার হাত ধরে সম্পূর্ণ অন্য এক মেয়ে হয়ে বেরিয়ে

এল থিয়েটার থেকে লরেলি। 'জানো, আব্বু,' রানার কাঁধে থুতনি রেখে আড়চোখে তাকাল ওর মুখের দিকে, 'তুমি সত্যি যদি আমার আব্বু হতে, বড় ভাল হত।'

মৃদু একটা চাঁটি মারল রানা লরেলির মাথার পিছনে। 'ফের?'

'না, মন খারাপ করে বলছি না,' লরেলি হাসছে। 'তোমাকে তো কথাই দিয়ে ফেলেছি, মন খারাপ করব না। বাপ, আমার যত যাই হোক, আফটার অল জন্মদাতা। যেটা সত্য তাকে আমার মেনে নিতেই হবে—তোমার এই কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। কিন্তু...'

'সবচেয়ে খুশি হব আমি তাহলে,' বলল রানা। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র ট্যাক্সির ড্রাইভারের উদ্দেশে হাত নাড়ল ও। জুনেস্কি আগেই জানিয়ে দিয়েছে ওকে, ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করবে ওদের জন্যেই।

হোটেলে ফিরল ওরা। এগারোটা বাজে। করিডর ধরে লবির দিকে যাচ্ছে। কয়েকটা দোকান এখনও খোলা, সম্ভবত সারারাতই খোলা থাকে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রানা। মুচকি হেসে জুয়েলারী শপের শো-কেসের দিকে আঙুল তুলল, 'ওটা, ওই যে হীরে বসানো আঙটিটা, কেমন মানাবে ভাবছি।'

'ও! ডুবে ডুবে পানি খাওয়া হচ্ছিল অ্যাদ্দিন!' লরেলি কপট রাগে চোখ পাকাল, দু'কোমরে হাত রাখল। 'দাঁড়াও, জুলিকে সামনে পেয়ে নিই...'

হাসিটা দমন করে লরেলির একটা হাত ধরে দোকানে ঢুকল রানা। লরেলি নিজেই সেলসম্যানকে ডেকে দেখতে চাইল আঙটিটা। হাতে নিয়ে কত ভাবেই না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরখ করছে। কিন্তু দাম শুনে মুখটা ম্লান হয়ে গেল, তাকাল রানার দিকে, 'এত দাম? নয়শো পাউন্ড!'

কথা না বলে ক্রেডিট কার্ড বের করে দাম চুকিয়ে দিল রানা। বাক্সটা নিল লরেলির হাত থেকে। খুলল। আঙটিটা বের করল। তারপর লরেলির বাঁ হাত ধরে অনামিকায় পরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তোমার জন্মদিনের উপহার।'

স্তম্ভিত হয়ে গেছে লরেলি। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে। অবিশ্বাসে চোখ দুটো বিস্ফারিত।

'আব্বু, তুমি...ঠাট্টা করছ?'

সেলসম্যানের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে থেকে টেনে সরিয়ে আনল রানা লরেলিকে। লবিতে পৌঁছল ওরা। হঠাৎ দাঁড়াল লরেলি। রানার দুই কাঁধে হাত রেখে পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে উঁচু হলো। চুমু খেল ওর কপালে। 'তোমার এই উপহার আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকবে, আব্বু!'

'আর কিছু বলে লজ্জা দিয়ো না,' এলিভেটরের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'চলো। তোমার কামরায় পৌঁছে দিয়ে আসি। কত রাত হয়েছে খেয়াল আছে? ঘুমুতে হবে না?'

লিফটের দিকে রানাকে নিয়ে এগোল লরেলি। আনন্দ উপচে পড়ছে চোখ মুখ থেকে। 'আহা! তুমি যেন বিশ্বাস করছ আজ আমার ঘুম আসবে!'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল রানা।

চারতলায় পৌঁছে এলিভেটর থেকে নামল ওরা। করিডর ধরে এগোল, বাঁক

নিল। তারপর থামল লরেলির কামরার সামনে। হাতব্যাগ খুলে চাবি বের করল লরেলি। তালা খুলল। কবাট খুলল। অন্ধকার কামরায় ঢুকে আলো জ্বালল। 'ঢুকবে না ভেতরে? আমার হাতের এক কাপ কফি খেতে চাও না?'

'ওটা কাল সকালের জন্যে পাওনা থাকুক, কেমন?' বলল রানা। 'আর হ্যাঁ, শোনো লরেলি, কাল সকালে যদি চোখের কোণে কালি দেখি, এমন রাগ করব...'

'আচ্ছা, আচ্ছা—এক্ষুণি ঘুমুতে যাচ্ছি আমি,' খুব জোর দিয়ে বলল লরেলি। রানা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেখে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিল দরজাটা সে।

থমকে দাঁড়াল রানা। ঘুরল। দু'পা এগিয়ে ফিরে এসে বন্ধ দরজার গায়ে কান ঠেকাল। দ্রুত ম্লান, গম্ভীর হয়ে উঠল ওর মুখের চেহারা। যা সন্দেহ করেছিল, তাই।

অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়েছে লরেলি। ফোঁপাচ্ছে।

আরও কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ভুরু কুঁচকে ভাবছে। কাঁধ ঝাঁকাল অসহায়ভাবে। ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল করিডর ধরে। বাঁক নেবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার পিছন ফিরে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। মেয়েটার জন্যে ব্যথায় টনটন করছে বুকটা। যদি সব দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারত স্নেহ-কাঙাল নিষ্পাপ মেয়েটার!

এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে ও। মেয়েটার কথা মন থেকে সরাতে পারছে না। এই ক'দিনের মধুর স্মৃতি ভবিষ্যৎ জীবনটাকে আরও দুর্বিষহ করে তুলবে বেচারার, কোন সন্দেহ নেই। আবার কাঁধ ঝাঁকাল রানা। কি করার আছে ওর! সবই মেয়েটার ভাগ্য! বোতাম টিপল এলিভেটরের।

একটু অন্যমনস্ক ছিল বলেই আধ সেকেন্ড দেরি হয়ে গেল ওর, এই সুযোগেই জিতে গেল গরিলাটা।

এলিভেটরের দরজা খুলে যাচ্ছে, এমন সময় মুখ তুলল রানা। রিভলভারের বাঁটটা বিদ্যুৎবেগে নেমে আসছে, দেখে মাথাটা সরিয়ে নিতে গিয়েও পারল না ও। প্রকাণ্ড লোকটাকে ও দেখতেই পায়নি।

চাঁদিতে পড়ল আঘাতটা। দরজা টপকে বেরিয়ে এসে খালি লোমশ হাতটা দিয়ে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল লোকটা। অচেতন রানাকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করল। রিভলভারটা দ্রুত পকেটে চালান করে দিয়ে করিডরের এদিক-ওদিক এবং সামনেটা দেখে নিল চট করে, তারপর দু'হাত দিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে কাঁধে তুলে নিল শরীরটা। নিঃশব্দ পায়ে দশ কদম এগোল, থামল একটা দরজার সামনে, হাঁটু ভাঁজ করে মৃদু ধাক্কা মারতেই দু'ফাঁক হয়ে গেল কবাট দুটো। অন্ধকার কামরায় ঢুকে পড়ল লোকটা রানাকে নিয়ে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল ভিতর থেকে।

রাত এগারোটা সাত মিনিট। ইসরায়েলী দূতাবাস। কার্ল পপকিনের সাউন্ড-প্রুফ চেম্বার। টপ্ সিক্রেট মীটিং চলছে।

'রানাকে নিয়ে স্টকটন রওনা হয়ে যাচ্ছে সম্ভবত আগামীকাল। ওদের সাথে জুলি, ডন এবং ফেজ থাকছে।' চুরুট থেকে মুখ তুলে জুনেস্কির দিকে তাকাল

পপকিন। 'তুমি এবং টিটো ওদেরকে অনুসরণ করবে। শত্রুরা তোমাদেরকে দেখবে, তোমাদের সম্পর্কে খোঁজ নেবে, জানবে তোমরাও একটা প্রতিদ্বন্দ্বী দল।' ব্রীফকেস খুলে কয়েকটা পাসপোর্ট, এবং পরিচয়পত্র বের করল সে। বাড়িয়ে দিল জুনেস্কির দিকে। 'তোমার আর টিটোর পাসপোর্ট। তোমরা অ্যারাবিয়ান ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট।'

গতকাল ছদ্মবেশ পরা অবস্থায় যে ফটো তোলা হয়েছে জুনেস্কি আর টিটোর, পাসপোর্টে সেই ফটোই রয়েছে। খুঁটিয়ে সব দেখল জুনেস্কি, তারপর সেগুলো ঠেলে দিল পাশে বসা টিটোর সামনে।

পাকানো দড়ির মত শরীর টিটোর, ছয় ফিটের মত লম্বা। ওর সবচেয়ে বড় কুখ্যাতি, দু'হাত চাপড়ে মশা মারার মত মানুষ মারতে ওস্তাদ। টেলিস্কোপ লাগানো রাইফেল হাতে থাকলে রেঞ্জের মধ্যে যে কোন টার্গেটের নির্দিষ্ট বিন্দু ফুটো করে দিতে পারে। বোকা বোকা চেহারা, সব সময় একটু হাসছে। আজ সকালেই এসে পৌঁছেচে তেল আবিব থেকে।

'খুনটা ঠিক কখন করব আমরা?' জানতে চাইল জুনেস্কি। 'আসল ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে কাজটা সারতে আপনার ক'দিন লাগবে?'

'তিন দিন,' বলল পপকিন। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই তিনটে দিন অপচয় করবে তোমরা। এর মধ্যে সুযোগ এবং পরিবেশ যদি পাও, কাজটা সেরে ফেলবে। তবে, এই সময় রানাকে শুধু খুন করলেই চলবে না, সেই সাথে শত্রুদের ক'টা দলকে কৌশলে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে হবে ফিলাতভ খুন হলো তাদেরই কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের হাতে।'

একটু বিরতি নিল পপকিন। চেহারাটা বদলে যাচ্ছে দ্রুত। চৌকো মুখে দয়াধর্মের কোন ছাপ নেই এখন। 'তিন দিনের মধ্যে সুযোগ যদি না পাও, তারপর আর পরিবেশের জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই, সোজাসুজি গুলি করে মেরে ফেলবে ওকে। তোমাদের হাতে ওকে খুন হয়ে যেতে দেখে কে কি ভাবল না ভাবল তাতে তখন আর আমাদের কিছু এসে যায় না। এই নির্দেশ স্টকটন, ডন এবং ফেজকেও দেয়া হয়েছে।'

'জুলিকে?'

'ওকে এসব কিছুই জানানো হয়নি,' বলল পপকিন। 'রানার সাথে ইমোশন্যালি ইনভলভড্ সে। তবে, ওকে বলে দেয়া হয়েছে, স্টকটনই আসলে দলনেতা। রানার নির্দেশ মানার ভান করবে সে, কিন্তু অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ করবে না।'

'স্টকটনের সাথে যোগাযোগ রাখব আমরা?' জানতে চাইল জুনেস্কি।

'খুব জরুরী প্রয়োজন ছাড়া যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে না ওর সাথে। তোমরা ম্যাকের মাধ্যমে খবর নেবে। ভীষণ চতুর রানা, তোমার সাথে খবর বিনিময় করতে গেলে ওর চোখে ধরা পড়ে যাবে স্টকটন।' বিরতি নিয়ে চুরুটে ঘন ঘন টান দিল পপকিন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'রওনা হবার তিন দিনের মধ্যেই পথে বা কেভো ক্যাম্পে পৌঁছুবার পর চারদিক থেকে ওদের দলটাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো, এদের আশেপাশে তোমরাও থাকবে। সবাই যখন

রানাকে কিডন্যাপ করার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে, তোমরাও যেন তাই করতে চাইছ, এই ভান করবে। প্রথম সুযোগেই টিটোকে দিয়ে গুলি করাবে। একটার বেশি গুলি যেন না হয়। শত্রুদের চোখে ব্যাপারটা এইভাবে ধরা চাই: তোমরা ফিলাতভের গার্ডকে আহত করতে চেয়েছিলে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গুলি লেগেছে ফিলাতভের মাথায়। ওদিকে, দলের ভেতর থেকে স্টকটন, ডন এবং ফেজ সন্দেহের উদ্রেক করবে না এমন পরিবেশ পেলে প্রথম সুযোগেই ঝামেলা চুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে। পরিষ্কার?'

'জ্বী,' বলল জুনেস্কি। উঠে দাঁড়াতে গেল সে, কিন্তু পপকিন হাত নেড়ে ক্ষান্ত করল তাকে।

'আমার কথা শেষ হয়নি এখনও,' চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে পপকিন। 'খুন তো হলো, তারপর?'

'তাই তো!' বলল জুনেস্কি। 'লাশের কি হবে?'

'রানা খুন হওয়া মাত্র অ্যারাবিয়ান পক্ষ অর্থাৎ তোমরা দ্রুত সরে আসবে এলাকা থেকে, বাতাসে মিলিয়ে যাবে,' শান্ত, স্থির কণ্ঠস্বর পপকিনের, যেন খোশ গল্প করছে। 'লোক দেখানো কান্নাকাটি, গোস্যা, শোক—এসব দেখাবার জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্টকটনকে। ওদের আসল কাজ শুরু এখান থেকেই। লাশটা ছিনতাই হবার সম্ভাবনা প্রচুর। যে-কোন মূল্যে তা ঠেকাতে হবে।'

'কিন্তু অতগুলো দলকে ঠেকিয়ে রাখা কি সম্ভব…?'

'সবাই লাশটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে তা মনে হয় না,' বলল পপকিন। অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল। 'খুনটার জন্যে ওরা দায়ী নয়, কর্তৃপক্ষের কাছে সেটা প্রমাণ করার জন্যে কেউ কেউ এ চেষ্টা করতেও পারে। করবেই, এমন কোন মানে নেই। আসল কথা, লাশটা আমাদের দরকার, তাই কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাই না।'

'দরকার?'

'তেল আবিব থেকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে,' বলল পপকিন, 'লাশটা হেডকোয়ার্টারে পাঠাতে হবে। যে কোন মূল্যে।'

'কিন্তু স্টকটন কিভাবে…'

'তোমার কাছ থেকে খবরের অপেক্ষায় থাকব আমরা,' বলল পপকিন। 'অকুস্থল থেকে সরে গিয়ে কাছে পিঠের যে-কোন শহর থেকে টেলিফোন করে খবরটা দিতে পারবে তুমি। লাশটা স্রেফ কড়া পাহারায় আগলে রাখতে হবে স্টকটনকে। সাথে ডন, ফেজ, জুলি থাকছে, বাইরে থাকছে ম্যাক, অসুবিধে হবে না। একটা হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দেয়া হবে লাশটা পিক করার জন্যে।'

থামল পপকিন। জুনেস্কি গোটা ব্যাপারটা ভেবে নিচ্ছে। একটু পর মুখ তুলল সে।

'তোমরা রানাকে অনুসরণ করবে,' বলল পপকিন। 'আমার মনে হয় আগামীকালই ওকে রওনা করে দেয়া ভাল।'

অন্ধকারে জ্ঞান ফিরল রানার। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা, কিছু ভাবতে পারছে না। মাথার

পিছনে নরম কিছু একটা রয়েছে। বালিশ? হতে পারে। মাথাটা এপাশ-ওপাশ করল। ধীরে ধীরে হালকা হচ্ছে মাথাটা। ব্যথা কমে আসছে।

একটা বিছানায় শুয়ে আছে ও। হাত দুটো নাড়তে গিয়ে ধাতব শব্দ পেল। ধক করে উঠল বুক। এক পলকে মনে পড়ে গেল সব কথা। লিফটের দরজা খুলে যাচ্ছিল, এমন সময় ভেতর থেকে কেউ আক্রমণ করেছিল ওকে। লোকটাকে দেখেনি ও।

হাত দুটো তলপেটের উপর পড়ে আছে। ডান হাতটা তুলতে যাচ্ছে, আবার সেই ধাতব শব্দ, সেই সাথে টান পড়ল বাঁ হাতের কব্জিতে। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গের। হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে রেখেছে কেউ।

নিঃসাড় হয়ে গেল রানা। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এটা একটা কামরা? কামরায় ও একা? কান পেতে কোন শব্দ পেল না। একটা কনুইয়ের উপর শরীরের উপরের অংশের ভর চাপিয়ে মাথাটা তুলল খানিকটা। হাঁটু ভাঁজ করে পা দুটো একটু তুলল। কোন শব্দ নেই। আবার সোজা করল পা দুটো। একটু একটু করে সরাচ্ছে। বিছানা থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিল, উঠে বসল ধীরে ধীরে। মাথার ব্যথাটা দপ্‌দপ্‌ করছে।

পা দুটো মুক্ত, সুতরাং অন্তত হাঁটতে কোন বাধা নেই ওর। কিন্তু হেঁটে ও যাবে কোথায়? সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সামনে। সমতল কি যেন ঠেকল আঙুলের মাথায়। জিনিসটা চৌকো। ছোট্ট একটা বেড সাইড টেবিল।

ধীরে ধীরে মেঝেতে দাঁড়াল ও। অন্ধের মত হাত বাড়াল সামনে। কিছুই ঠেকল না হাতে। এগোল রানা। তৃতীয়বার পা বাড়াতেই কিসের সাথে ধাক্কা খেল হাঁটুর খানিক নিচে। 'উফ্!' মুখ বিকৃত হয়ে গেল ব্যথায়। খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছিয়ে এল দ্রুত, বসল বিছানায়। চোট-খাওয়া জায়গাটা ডলছে হাত দিয়ে, হ্যান্ডকাফের সাথে লাগানো লোহার শিকলটা বাজছে টুং-টাং।

একটা কোণ থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ ভেসে এল। ঝট্ করে তাকাল রানা। ক্ষীণ একটা আলোর আভাস আরও ফুটতে গিয়েও না ফুটে অন্ধকারের গহ্বরে মুখ লুকাল। ঠিক এক সেকেন্ড পর ধারাল ছুরির মত চোখে এসে বিঁধল টর্চের তীব্র আলো। অন্ধ হয়ে গেল রানা। চোখ পিটপিট করছে। একটা কণ্ঠস্বর, বাঁকাচোরা ইংরেজি উচ্চারণ। 'ডক্টর ফিলাতভ তাহলে জেগেছেন!'

হাত দুটো তুলে চোখের উপর ছায়া ফেলল রানা।

তীক্ষ্ণ গলায় সাবধান করে দিল লোকটা, 'নড়বেন না। বিছানায় বসে থাকুন।' তারপর, অনেকটা সকৌতুকে জানতে চাইল, 'এবার বলুন, ডক্টর ফিলাতভ, এটা আমার হাতে কি দেখতে পাচ্ছেন?'

ছোট্ট টর্চের সামনে একটা লোমশ হাত দেখতে পাচ্ছে রানা। পিছনের অন্ধকারে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। মস্ত থাবায় নীলচে ইস্পাত চকচক করছে আলোয়। নলের ছোট্ট ফুটোটার ভিতর জমাট অন্ধকার। সামান্য একটু নাড়ল রিভলভারটা। 'কি এটা, ডক্টর ফিলাতভ?' রূঢ় কণ্ঠস্বর।

'কে তুমি?' নিজের কানেই অস্বাভাবিক শান্ত ঠেকল বলার ভঙ্গিটা রানার। 'কি

চাও? আমি একজন নিরীহ বিজ্ঞানী, রিভলভার দেখাবার কি মানে?'

মৃদু একটু হাসির শব্দ। গলাটা পরিচিত, কিন্তু ঠিক চিনতে পারছে না রানা। লোকটার উচ্চারণ ভঙ্গিটা কৃত্রিম, স্বরটা চিনতে দিতে চাইছে না। 'আপনার শরীরের বাঁ পাশে ক্ষত কেন, ডক্টর ফিলাতভ?'

'তোমার মতই কোন ম্যানিয়াকের কীর্তি ওটা,' বলল রানা। 'নরওয়েতে একদল আরব আমাকে আক্রমণ করেছিল। এখন দেখতে পাচ্ছি আমেরিকানরাও…'

'আমেরিকান? কে আমেরিকান?'

'তুমি। তোমার উচ্চারণ ভঙ্গি…'

'কে আমি?' চাপা কৌতূহলের সাথে প্রশ্ন করল লোকটা।

'চিনতে পারছি না,' সত্যি কথা বলল রানা। 'কিন্তু চেহারাটা লুকিয়ে রাখছ দেখে মনে হচ্ছে তোমাকে আমি চিনি।'

একটা নিঃশ্বাসের শব্দ পেল রানা, অনেকটা হাঁপ ছাড়ার মত। 'আপনার জন্যে দুঃখ হয়। পদে পদে বিপদে পড়ছেন। তা, হামলার পর খবর দিয়েছিলেন পুলিসে?'

কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল ও? স্টকটন, জুনেস্কি এরা সব করছে কি? ভাবনাটাকে চেপে রেখে বলল রানা, 'ইসরায়েলী দূতাবাসে দিয়েছিলাম খবর, কিন্তু এসব জেনে তোমার কি দরকার?'

'নরওয়ের ইসরায়েলী দূতাবাসে কার সাথে দেখা হলো আপনার?'

'জুনেস্কি নামে এক লোক পুলিস স্টেশন থেকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল…' হঠাৎ থামল রানা। 'যথেষ্ট বলেছি। তোমার আর একটা কথারও জবাব দিচ্ছি না আমি।'

রানার দু'চোখের মাঝখানে রিভলভার তাক করল লোকটা। 'জবাব দেবেন না?' হাসল সে। 'দেবেন, দেবেন। কার্ল পপকিন কি বলল আপনাকে?'

'কে?'

'কার্ল পপকিন। অস্বীকার করবেন না…'

'চিনি না।'

'মিথ্যে কথা বলছেন।'

'সত্যটা যদি জানাই থাকে, জিজ্ঞেস করছ কেন তাহলে? পপকিন নামে কাউকে আমি চিনি না।'

'ভুল করছেন আপনি,' বলল লোকটা। 'ওহ্ হো, বলাই হয়নি এখনও! ডক্টর ফিলাতভ, আপনার সবেধন নীলমণি কন্যা,' মাঝপথে ইচ্ছা করেই চুপ করে গেল লোকটা।

'লরেলি! কোথায় লরেলি? কি…?'

বিকৃত গলায় হাসল লোকটা। 'হ্যাঁ, আপনি যা সন্দেহ করছেন তাই। আপনার মেয়ে এখন আমাদের হাতে।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। পেশীগুলোয় টান পড়ল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বলল, 'প্রমাণ করো।'

'জো হুকুম।' উপহাসের সুরে বলল লোকটা। ধীরে ধীরে টর্চের সামনে থেকে নিজের দিকে টেনে নিল রিভলভারটা। 'টেপ করে রেখেছি কথাগুলো, শুনলেই

বুঝতে পারবেন।' একটা ক্লিক, তার পরই মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা গেল অন্ধকারে। একটা পুরুষের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর কানে ঢুকল রানার।

'এবার বলো, তোমার আব্বু ফিনল্যান্ডে কি করছেন?'

'ছুটি কাটাতে এসেছেন...' গলার স্বর লরেলির, পরিষ্কার বুঝল রানা। একটু যেন দূর থেকে আসছে তাই অস্পষ্ট, এই যা।

'তাই বলেছেন বুঝি তোমাকে?'

'বলবেন কেন, আমি জানি,' গলার আওয়াজেই বোঝা যাচ্ছে, কৌতুক বোধ করছে লরেলি।

'কিন্তু ছুটি কাটাতে এসে থাকলে প্রফেসর ক্যারিয়ানেনের কাছে গেলেন কেন তিনি?'

'আমার দাদু সম্পর্কে কিছু জানার ইচ্ছা ছিল, তাই

'কিছু কি?'

দীর্ঘ দশ সেকেন্ড আর কোন শব্দ নেই। তারপর আবার লোকটার কর্কশ যান্ত্রিক গলা কানে ঢুকল রানার, 'জবাব দাও, মিস লরেলি। চুপ করে থাকলে লাভ হবে না। তোমার আব্বুর অমঙ্গল হোক, নিশ্চয়ই তা তুমি চাও না? সব প্রশ্নের উত্তর দিলে তোমার বা তোমার আব্বুর কোন ক্ষতি আমরা করব না। কথা দিচ্ছি, তোমাদেরকে অক্ষত ছেড়ে দেয়া হবে।'

খুট্ করে শব্দের সাথে অচল হয়ে গেল টেপটা।

টর্চের পিছন থেকে বলল লোকটা, 'অক্ষত অবস্থায় আপনাদের ছেড়ে দেয়া হবে কিনা, তা এখন নির্ভর করছে আপনার ওপর। যা জিজ্ঞেস করব, সঠিক উত্তর দেবেন। কি কি কথাবার্তা হলো আপনার সাথে কার্ল পপকিনের?'

'অ্যাক্সিডেন্ট করায় ধমক দিল শুধু,' বলল রানা।

বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসল লোকটা। 'যাক, স্বীকার করছেন তাহলে।' একটু বিরতি নিয়ে চাপা গলায় হুমকি ছাড়ল সে। 'কিন্তু কচি মেয়েটার যদি সর্বনাশ দেখতে না চান গড় গড় করে বলে ফেলুন ফিনল্যান্ডে কেন এসেছেন।' রিভলভারটা টর্চের সামনে চলে এল আবার। 'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এমন কিছু নয় ব্যাপারটা। আমরা ফিনিশ সরকারের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'কি জন্যে?'

'একটা ডিফেন্স প্রোজেক্টের ব্যাপারে।'

'সরকারের কার সাথে?'

'ঠিক সরকারের কেউ নয় সে,' বলল রানা। মনের ভিতর অজানা একটা উৎস থেকে আপনাআপনি বেরিয়ে আসছে উত্তরগুলো। 'আর্মিতে চাকরি করে, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের লোক।'

'নাম?'

চুপ করে আছে রানা।

রিভলভারটা নড়ে উঠল। 'নামটা জানতে চাই, ডক্টর ফিলাতভ।'

রানার ঠোঁটের ডগা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল শব্দটা, 'সারিনেন।'
'সারিনেন? সে তো একজন বিখ্যাত আর্কিটেক্ট।'
'সে নয়, এ লোক একজন কর্নেল।'
'প্রোজেক্ট সম্পর্কে বলুন।'
একটু ইতস্তত করল রানা। তারপর বলল, 'ইলেকট্রোনিক-এসপিয়োনাজ—ইকুইপমেন্ট ফর মনিটারিং রাশিয়ান ব্রডকাস্টস, স্পেশিয়ালি অন মিলিটারি ওয়েভলেংথ্।'
দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল লোকটা, তারপর বলল, 'এ কাজ তো আগেই করা হয়ে গেছে। আপনার তা অজানা থাকার কথা নয়।'
'জানি। কিন্তু আমার পদ্ধতিটা অন্য রকম, আরও উন্নত।'
'হুঁ। আপনার পদ্ধতিটা কি শোনা যাক। আজেবাজে কিছু বলে বোঝাতে চেষ্টা করবেন না। ধোঁকা দিলে আপনার মেয়ের দাঁত ভাঙব।'
'একটা অটোমেটিক ডিকোডার আবিষ্কার করেছি আমি,' বলল রানা। কি এক যাদু বলে খুলে যাচ্ছে মাথাটা, অর্থ জানা নেই এমন সব কথা বেরিয়ে আসার জন্যে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিয়েছে মনের ভিতর। কেমন যেন আতঙ্কের একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে। গলা থেকে সড় সড় করে বুক বেয়ে নামছে ঘাম। হঠাৎ আবিষ্কার করল ও, গড় গড় করে বলে যাচ্ছে এমন সব কথা, যার অর্থ জানা নেই ওর নিজেরই। 'ইটস এ স্টোকাস্টিক প্রসেস। এ ডেভেলপমেন্ট অভ দ্য মন্টি কার্লো মেথড। দ্য রাশিয়ান আউটপুট ইজ রিপিটেডলি স্যাম্পল্ড অ্যান্ড পুট থ্রু এ সিরিজ অভ ট্র্যান্সফরমেশন অ্যাট র‍্যান্ডম। ইচ ট্র্যান্সফরমেশন ইজ কমপেয়ারড্ উইথ এ স্টোর হেল্ড ইন এ কমপিউটর মেমারি—ইফ এ ম্যাচ ইজ মেড এ ট্রি ব্রাঞ্চিং টেকস্ প্লেস লিডিং টু এ ফারদার সেট অব ট্র্যান্সফরমেশনস্। দেয়ার আর এ লট অভ ডেড এন্ডস্ অ্যান্ড ইট নিডস বিগ ফাস্ট কমপিউটর—ভেরি পাওয়ারফুল।'
ঘেমে গোসল হয়ে গেছে রানা। যা বলল মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেনি।
মৃদু বিস্ময় প্রকাশ পেল লোকটার সুরে, 'এটা আপনি আবিষ্কার করেছেন?'
'আমি সার্কিটগুলো নতুন করে সাজিয়েছি, প্রোগ্রাম তৈরি করার ব্যাপারে সাহায্য করেছি।'
'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝছি না। ফিনদের এটা দান করা হচ্ছে কেন?'
'কে বলল দান করছি?' বিরক্তির সাথে বলল রানা। 'ওরাই দিয়েছে আমাদেরকে। বেসিকগুলো ওরাই গড়েছে। এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার সুযোগ ওদের নেই, তাই দায়িত্বটা আমাকে দিয়েছিল।'
'এর মধ্যে প্রফেসর ক্যারিয়ানেন কিভাবে আসছেন? আপনি…'
'থামো,' বলল রানা। 'আমার মেয়ের গলাটা আরেকবার শোনাও আমাকে।'
'কেন?' আকাশ থেকে পড়ল লোকটা।
'আমার আদরের…' হঠাৎ থামল রানা, জেদের সুরে বলল, 'ওর কণ্ঠস্বর না শুনে আর একটা কথাও বলব না।'
কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থাকল লোকটা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, শুনুন

আবার।'

রিভলভারটা টর্চের পিছনে অন্ধকারে গায়েব হয়ে গেল. শোনা গেল ক্লিক শব্দটা। খানিকটা রি ওয়াইন্ড করে আবার চালু করে দিল টেপ।

'এবার বলো, তোমার আব্বু ফিনল্যান্ডে কি করছেন?'

'ছুটি কাটাতে এসেছেন...'

'তাই বলেছেন বুঝি তোমাকে?'

গভীর মনোযোগের সাথে টেপ করা কথাগুলো শুনছে রানা। কণ্ঠস্বরের উত্থান পতন দ্রুততা, ভাব এবং অস্পষ্টতা গিলছে যেন গোগ্রাসে। কোলের উপর পড়ে থাকা হাত দুটো তুলল ও, ধীরে ধীরে দু'দিকে সরিয়ে নিচ্ছে। হ্যান্ডকাফের শিকলটা টান টান হলো।

'আমার দাদু সম্পর্কে কিছু জানার ইচ্ছা ছিল, তাই।'

'কিছু কি?' দশ সেকেন্ডের বিরতি। 'জবাব দাও, মিস লরেলি। চুপ করে থাকলে লাভ হবে না। তোমার আব্বুর অমঙ্গল হোক, নিশ্চয়ই তা তুমি চাও না? সব প্রশ্নের উত্তর দিলে...'

খাটের নিচে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে পা দুটোর চারভাগের এক ভাগ মেঝেতে ঠেকিয়ে রেখেছে রানা। আঙুল আর পাতার উপর ভর দিয়ে, ঊরুর সবটুকু শক্তির সাহায্য নিয়ে লাফ দিল সে ক্যাঙারুর মত, বিদ্যুৎবেগে। দু'দিকে প্রসারিত দুই হাত, লোকটার দুই কান ধরতে চাইছে যেন। দুই হ্যান্ডকাফের মাঝখানের শিকলটা দু'দিকের টানে লোহার রডের মত শক্ত হয়ে আছে। লোকটার কণ্ঠনালীর ওপর রুলারের প্রচণ্ড একটা বাড়ির মত আঘাত পড়ল।

টেপ রেকর্ডার আর টর্চ, দুটোই পড়ে গেল মেঝেতে। টর্চটা গড়াচ্ছে, কামরার নানান দিকে কিম্ভূতকিমাকার ছায়া আর আলোর প্যাঁচ লেগে গেছে। মাথাটা পিছন দিকে সরে গেছে লোকটার। প্রকাণ্ড শরীর, দাঁড়িয়ে আছে এখনও নিজের জায়গায়। মুখে মুখোশ। তার দুই কানের উপর রানার দুটো হাত, ফুলে উঠেছে পেশীগুলো। লোকটার গলায় চেপে বসেছে শিকলটা। টর্চের আবছা আলোয় চকচকে রিভলভারের নলটা দেখতে পেল রানা। পকেট থেকে বের করে ফেলেছে, তুলে আনছে রানার মুখের দিকে।

রানার বাঁ দিকের চোয়ালে নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপতে যাবে লোকটা, উন্মত্ত দ্রুততার সাথে ওর কব্জিটা ধরে ফেলল রানা। মস্ত এক রাম ধাক্কা দিয়ে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল নিজের হাতটাকে, লোকটার ডান কানের উপর। রিভলভারটা এখনও ধরে আছে সে, নলটা নিজের মাথার পাশে ঠেকে আছে।

আঘাতটা এল অপ্রত্যাশিতভাবে। তলপেটে বাঁ-হাতি একটা ঘুসি খেল রানা। ঠিক এই সময় কানের পাশে গ্রেনেড ফাটার মত প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল, সেই সাথে চোখ ধাঁধানো অত্যুজ্জ্বল আলোর ঝলক।

রিভলভার ছেড়ে দিয়ে ছিটকে পড়ে গেল লোকটা। খুন হয়ে গেল নাকি? রিভলভারটার দিকে ডাইভ দিয়ে ভাবল রানা। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা, স্যাঁৎ করে এক পাশে খানিকটা সরে গিয়েই দরজা খুলে বেরিয়ে গেল

করিডরে।

রিভলভার নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে রানা, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। টেপ-রেকর্ডার থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসছে এখনও। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে করিডরে বেরোল রানা। থামল। কেউ নেই। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে একটা পায়ের আওয়াজ। এখুনি লোকজন ছুটে আসবে, কেটে পড়া উচিত, ভাবতে ভাবতে এলিভেটরের দিকে ছুটল ও। পিছন থেকে জুলির গলা পাচ্ছে ও, 'লরেলি, এ তোমার অন্যায় আচরণ! এসব কথা শুনলে কি বলবে আন্তন?'

শব্দগুলোই শুধু ঢুকল কানে, অর্থটা যে কি, তা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই রানার। এলিভেটরে ঢুকে বোতামে চাপ দিল ও। তিনতলায় নেমে বাইরে বেরোল। ফাঁকা করিডর। নিজের কামরায় ঢুকে একটা হাঁফ ছাড়ল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এগোল টেলিফোনের দিকে।

কপালে উঠে গেল পপকিনের চোখ। টেবিলে চাপড় মেরে সবিস্ময়ে বলল, 'অবিশ্বাস্য!'

'তাই ঘটেছে,' মৃদু গলায় বলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্টকটনের দিকে তাকাল, 'ওকে জিজ্ঞেস করুন, ডজনখানেক লোককে নিয়ে কি করছিল তখন, কোথায় ছিল?'

কটমট করে স্টকটনের দিকে তাকাল পপকিন।

'মিস লরেলিকে নিয়ে ডক্টর ফিলাতভ চারতলায় উঠে যান,' এতটুকু না ঘাবড়ে বলল স্টকটন, 'মেয়েকে পৌঁছে দিয়েই নেমে আসবেন মনে করে আমরা কেউ আর চারতলায় উঠিনি।'

'কিন্তু ওর নামতে দেরি হচ্ছে দেখেও হুঁশ হলো না তোমাদের?' রাগের মাথায় টেবিলে একটা ঘুসি মেরে বসল পপকিন। পরমুহূর্তে মুখ বিকৃত করল ব্যথায়।

'করার কিছু ছিল না আমাদের,' বলল স্টকটন। 'তিনতলায় তখন চারটে দলকে সামলাতে আমরা ব্যস্ত। সিঁড়ি, এলিভেটর, পানির পাইপ এবং চিমনি, এই চার চারটি পথ ধরে ডক্টর ফিলাতভের কামরার দিকে এগিয়ে আসছিল ওরা।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল পপকিন।

মুচকি হাসল স্টকটন। 'চিন্তার কিছু নেই। সব ক'টা লেজ তুলে পালিয়েছে।'

রানার দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনল পপকিন। 'ডিকোডার সম্পর্কে ঠিক কি বলেছ লোকটাকে রিপিট করতে পারবে তুমি, রানা?'

'ইটস এ স্টেকাস্টিক প্রসেস—এ ডেভেলপমেন্ট অভ দ্য মন্টি কার্লো মেথড। দ্য রাশিয়ান আউটপুট...' গড় গড় করে সবটা মুখস্থ আওড়ে গেল রানা।

চৌকো মুখটা ঝুলে পড়ল পপকিনের। কিছু বলতে গিয়ে থামল, ঢোক গিলল একটা। চেহারায় গাম্ভীর্য এনে বলল, 'হুঁ।'

'হুঁ মানে?' অসহায় ভঙ্গিতে বলল রানা। 'কোত্থেকে বেরুচ্ছে এসব কথা? স্টেকাস্টিক মানে কি তাই আমি জানি না।'

ধীরেসুস্থে একটা চুরুটে আগুন ধরাল পপকিন। 'মানে জানো না, বলছ?' মৃদু

হাসল সে। 'তাহলে ধরে নিতে হবে, তোমাকে মানে জানাবার দরকার আছে বলে মনে করেনি হেডকোয়ার্টার।'

'হেডকোয়ার্টার?'

'ওখানেই তোমাকে পোস্ট হিপনোটিক সাজেশন দেয়া হয়েছে,' বলল পপকিন। 'যাতে এ-ধরনের বিপদে পড়লে কথাগুলো আবৃত্তি করে শত্রুদেরকে ধোঁকা দিতে পারো। দেখা যাচ্ছে, কাজে লেগে গেছে কৌশলটা।'

একটু শান্ত হলো রানা। চেয়ারে হেলান দিল। 'আমি তো ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম...'

'ঘাবড়াবারই কথা,' বলল পপকিন। 'কিছুই জানা নেই অথচ গড় গড় করে বেরিয়ে আসছে টেকনিক্যাল সব কথাবার্তা মনের ভিতর থেকে...আর কেউ হলে বোধহয় জ্ঞান হারাত।' একটু বিরতি নিল সে, 'লোকটা তোমাকে ফিলাতভ বলেই মনে করেছে তাহলে?'

'কোন সন্দেহ প্রকাশ করেনি।'

'ঝাঁপিয়ে পড়লে কি মনে করে? একে-খালি হাত, তার ওপর হাতকড়া লাগানো। গুলি লাগবে এই ভয় হয়নি তোমার?'

'রিভলভারটা তখন ওর হাতে ছিল না,' বলল রানা। 'রেকর্ডারটা ছিল। হঠাৎ বুঝলাম, রেকর্ডিংটা খাঁটি নয়, জাল। শেষ দিকের হুমকিটার সুর অন্যরকম—এ ডেড সাউন্ড। কথাবার্তার বাকি অংশ সাদামাটা। স্বাভাবিক পরিবেশেও এটা টেপ করা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে হলো। খটকা লাগল, বুঝলাম, ওদের হাতে নেই লরেলি। এরপর চুপ করে বসে থাকার আর কোন মানে হয়?'

'হয় না,' গম্ভীরভাবে বলল পপকিন। 'তোমার যুক্তির সাথে আমি একমত।' রানার পাশে বসা জুনেস্কির দিকে তাকাল সে। জুনেস্কি চুপচাপ বসে পেপার ওয়েট নাড়াচাড়া করছে। এখন পর্যন্ত কোন কথা বলেনি সে। 'শুনছ তো, জুনেস্কি?' বলল পপকিন। 'রানার যোগ্যতা কতটুকু, বুঝে নাও। প্রতিটি কাজের পিছনে অখণ্ড যুক্তি রয়েছে ওর। প্রথমে বুদ্ধি দিয়ে আসল ব্যাপার জেনে নিচ্ছে নিখুঁত ভাবে, তারপর ঝুঁকি নিয়ে ঘোলাপানি খাওয়াচ্ছে অস্ত্রধারী শত্রুকে। ঝুঁকি বটে, কিন্তু তা নিচ্ছে সব দিক বিবেচনা করে।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল সে, 'আমি এত কথা বলছি শুধু একটি কারণে, দেখে অন্তত শিক্ষা গ্রহণ করো, সাবধান হও। তাহলে ব্যর্থতা এড়িয়ে যেতে পারবে।'

'জুলির গলাও পেয়েছি আমি টেপে,' বলল রানা। 'রাগ করছিল লরেলির ওপর।'

'এটা গতকালের ঘটনা। হোটেলের লাউঞ্জে ছিল লরেলি, এমন সময় ওর টেবিলে এক লোক এসে বসে। এটা সেটা নানান প্রশ্ন করছিল সে। টেপে তারই গলা শুনেছ তুমি। কাছেপিঠে ছিল জুলি, সে এসে পড়ায় লোকটা কেটে পড়ে। টেপ রেকর্ডারটা নিশ্চয়ই টেবিলেরই কোথাও লুকানো ছিল। কিন্তু লরেলি বা জুলি তা জানতে পারেনি। লোকটা পরে সেটা উদ্ধার করে জায়গা বুঝে ধমকের সুরে টেপ করেছে কিছু কথা। সবই বোঝা যাচ্ছে এখন। যাই হোক, জুলিকে দেখে লোকটা

কেটে পড়ার পর লরেলি ঝগড়া বাধিয়ে বসে জুলির সাথে। তোমার সাথে জুলির সম্পর্ক নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছিল সে। সে-প্রসঙ্গেই রাগ করে থাকবে জুলি। টেপ রেকর্ডারটা তখনও ছিল ওখানে কোথাও, ওদের ঝগড়াটাও তাই টেপ হয়ে গেছে।'

'যা ঘটেছে, লরেলি জানে।'

রিস্টওয়াচ দেখল পপকিন। 'সকাল ছ'টা। এখন ও ঘুমাচ্ছে। না, ওকে এসব জানাবার দরকার নেই। এবার, রানা, লোকটার চেহারার বর্ণনা।'

'জানি না। অন্ধকারে দেখার সুযোগ পাইনি। ঝাঁপিয়ে পড়ার পর অনুভব করলাম মুখে কাপড়ের মুখোশ পরে আছে। কিন্তু...' কণ্ঠস্বরে সন্দেহের ভাব, কথা শেষ না করে থেমে গেল রানা।

'থামলে কেন?' উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে বলল পপকিন, 'বলো।'

'গলার আওয়াজটা পরিচিত মনে হয়েছে,' বলল রানা। 'অন্য রকম করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ধরা পড়ে গেছে আমার কানে। উচ্চারণ ভঙ্গিটা আমেরিকান।'

এ-প্রসঙ্গ নিয়ে কয়েক ডজন প্রশ্ন করল পপকিন। শেষ পর্যন্ত রেগেমেগে বলল রানা, 'বাদ দিন। ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। লোকটাকে চিনতে পারিনি, ব্যস।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পপকিন। 'ঠিক আছে, লম্বা ঘুম দাও। তোমাদের রওনা হবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি আমি।'

রানাকে বিছানায় রেখে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। এলিভেটরে চড়ে পপকিন বলল, 'এ লোক ফিলাতভ নয়, তা আমরা জানি। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, এ লোক মাসুদ রানাও নয়।'

'কি!' জুনেস্কি বিষম খেল।

পপকিন গম্ভীর। 'আমার ধারণা, আসলে ও ক্লার্ক ফেন্ট।'

'অ্যাঁ!' গলার আওয়াজ বিকৃত জুনেস্কির। 'সে আবার কে?'

'সুপারম্যান।' বলল পপকিন।

তিন

বাঁকের কাছে ল্যান্ডরোভারের স্পীড কমাল রানা। পাশে বসা স্টকটনের দিকে তাকাল। বলল, 'সামনে বোধহয় মোড় নিতে হবে। ম্যাপটা চেক করো।'

উরুর উপর থেকে ম্যাপটা তুলল স্টকটন। 'হ্যাঁ। এইমাত্র আমরা কামানেন পেরিয়ে এসেছি। এই সাইড রোডের শেষ দিকে কেভোক্যাম্প। আশি কিলোমিটার।' রিস্টওয়াচ দেখল সে। 'রাত আটটা দশটার মধ্যে পৌঁছুবার কথা। পারব?'

বাঁক নিল গাড়ি। ঝাঁকি খাচ্ছে। হেলে পড়ছে এপাশে-ওপাশে। সামনে চোখ রানার। খানাখন্দ দেখে অনবরত হুইল ঘোরাচ্ছে। ক্রমশ উঠে গেছে রাস্তাটা তারপর আবার নেমে গেছে, কঠিন পাথুরে চড়াই-উৎরাইয়ের উপর দিয়ে সর্পিল

ভঙ্গিতে গোটা পথটা এগিয়ে গেছে। দু'পাশে কখনও লম্বা লেক, কখনও বনভূমি, কখনও শুধু নির্জন প্রান্তর। 'আজ আর পৌঁছুতে পারব না' বলল ও। 'এটা একটা রাস্তা নাকি!'

মাঝখানের সীট থেকে হাসল জুলি। বলল, 'নামেই পরিচয়।'

'কি রকম?'

'ম্যাপে রাস্তাটার নাম দেখোনি তুমি? কেলি রিকো।'

'মানে?' ঝটকা মেরে একধাপ গিয়ার নামাল রানা।

'বরফ গলে যাবার পর রাস্তার শোচনীয় অবস্থা,' ব্যাখ্যা করল জুলি।

সুমেরু বৃত্ত থেকে কয়েকশো মাইল উত্তরে রয়েছে ওরা। শীত শীত লাগছে। উজ্জ্বল নীল আকাশ। মেঘ নেই। পাখি নেই। সামনে চোখ রেখে ধুলোর উপর চাকার দাগ দেখছে রানা। 'তবু একটা ব্যাপারে খুশি আমি,' বলল ও।

'কি?'

'রাতের সূর্য। কার সাধ্য অন্ধকারে এই রাস্তায় গাড়ি চালায়!'

মাঝখানের সীটে জুলি একা, পিছনের সীটে ডন আর ফেজ বসেছে। গতকাল খুব ভোরে হেলসিঙ্কি থেকে রওনা হয়েছে ওরা। দক্ষিণ উপকূল-ঘেঁষা ঘনবসতিগুলোর ভিতর দিয়ে একটানা উত্তর দিকে এগিয়েছে। উর্বর ফার্মল্যান্ডগুলো পেরিয়ে এসেছে দ্রুত। প্রবেশ করেছে অদ্ভুত প্রশান্ত আর প্রায় নির্জন এলাকায়। প্রথম দিকে লেকগুলোর পানি ছিল স্বচ্ছ নীল, পাইন গাছগুলো ছিল আকাশ ছোঁয়া। তারপর যত এগিয়েছে, ধীরে ধীরে লেকের সংখ্যা কমেছে, পানিও এদিকে অগভীর, ঘোলাটে, শ্যাওলায় ঢাকা। একশো ফুট উঁচু পাইনগুলো পিছনে ফেলে এসেছে ওরা, এদিকের একটা পাইনও বিশ ফুট ছাড়ায়নি।

আউলোয় রাত কাটিয়েছে ওরা। আজ খুব ভোরে আবার রওনা হয়ে ইভালো পেরিয়ে এসেছে। সর্ব উত্তরের শেষ এরোড্রাম ওখানেই। ইভালো ছাড়িয়ে আসার পর নতুন এলাকার অধিবাসী ল্যাপদের সাক্ষাৎ পেয়েছে ওরা মাত্র একবার। বিশাল এলাকা, কিন্তু লোকসংখ্যা খুবই কম। কেভোর ওদিকে লোকজন একেবারে না থাকারই মত।

রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। গাড়ির তীব্র ঝাঁকুনি আর ধুলোর পাহাড় নাছোড়সঙ্গী হয়ে আছে ওদের।

বেশ কয়েকটা জলাশয় চোখে পড়েছে বটে, কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে কেউ সেদিকে পা বাড়াতে সাহস পায়নি রানার ভয়ে। ম্যাপে উল্লিখিত সতর্কবাণী সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছে রানা। এদিকের পানি বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ল্যাবরেটরি টেস্ট না করে ব্যবহার করলে বিপদের ঝুঁকি আছে। ফলে গোসল করার খায়েশ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে।

সকলের ভাল-মন্দ, সুবিধে-অসুবিধের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে রানা। নিজের আরামের দিকে কোন খেয়াল নেই। ফেজ এবং স্টকটনের কাজের ভার কমিয়ে দিয়েছে দু'বার একটানা আট ঘণ্টা করে গাড়ি চালিয়ে। 'শত্রুরা যখন চারদিক থেকে আমার ওপর নজর রাখবে তখন তো আর তোমাদের কাজগুলো আমি করে দিতে

পারব না,' যুক্তি দেখিয়ে বলেছে সে। 'যতটা পারো এখনই খাটিয়ে নাও আমাকে।'

লোকটা কাজ ভালবাসে, প্রথমে এটাই ধরে নিয়েছিল ওরা। কিন্তু সে ভুল ভাঙতেও দেরি হয়নি ওদের। ফেজ অসুস্থ বোধ করায় নিজের ভাগের পানিটুকু তাকে দিয়ে একটানা পুরো একটা বিকেল পিপাসার জ্বালা সহ্য করেছে। বার বার প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে কারও কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা। দলের মধ্যে সবচেয়ে বিশালকায় সদস্য ডন। তার খিদেটাও সাংঘাতিক। আর কেউ সেটা লক্ষ না করলেও, রানার চোখে ঠিকই ধরা পড়েছে ব্যাপারটা। দলের নেতা হিসেবে, এ ব্যাপারেও সে তার কর্তব্য পালনে ভুল করেনি। অন্যদের চেয়ে খাবারের ভাগ তাকে কিছু বেশি দিচ্ছে সে। নিজের ভাগ থেকে প্রতিবারই ডনকে কিছুটা দান করেছে হাসিমুখে।

মাথায় চুল নেই ডনের। কামানো। চোখ দুটো লাল আর আকারে গোল, বড় বড় কথা সে প্রায় বলেই না। চব্বিশ ঘণ্টা হয়েছে ওদের সাথে যোগ দিয়েছে সে, কিন্তু ইতোমধ্যেই তাকে নিয়ে সবাই অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে। তার সম্পর্কে কেউ কিছু বললে নিঃশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় শুধু, অমনি চমকে ওঠে পিলে। কিন্তু সবাই অবাক হয়েছে রানার আচরণে। ডনের পাঁজরে খোঁচা মেরে এটা করো, ওটা করো নির্দেশ দিয়েছে রানা। তাকে নিয়ে কৌতুক করতেও ছাড়েনি। ডন নিঃশব্দে পালন করেছে ওর প্রতিটি আদেশ। রক্ত চক্ষু মেলে কটমট করে তাকাবার অভ্যাসটি রানার বেলায় প্রকাশ পায়নি।

হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজবে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে রানা। এ ব্যাপারে জুলি ওর সহকারিণীর ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু প্রয়োজনে কড়া ধমক, তিরস্কার, গালাগাল করতেও ছাড়ছে না রানা। রাগ করে যা তা বলছে বটে, কিন্তু কেউ ওর উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হতে পারছে না। তার কারণ, বকাঝকা যা করছে ও, তা ওদেরই ভালর জন্যে।

প্রথম দিকে চুপচাপ, গম্ভীর হয়ে ছিল স্টকটন। রানার সাথে কথাই বলছিল না। সবাই ওর কৌতুকে হাসলেও, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকছিল সে। কিন্তু সকলের ভাল-মন্দের ব্যাপারে ওর টনটনে জ্ঞান, দেশের প্রতি অকৃত্রিম দরদ, বর্তমান অভিযান সম্পর্কে আন্তরিক উৎসাহ ইত্যাদি লক্ষ করে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেনি সে। ধীরে ধীরে গাম্ভীর্যের জায়গায় নিখাদ বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠেছে তার মুখের চেহারায়। অদ্ভুত লোক! মনে মনে ভাবছে সে। এমন নির্ভেজাল মানুষ চোখে পড়ে না। যোগ্যতার দিক থেকেও আমাদের চেয়ে অনেক বড়। আচরণ, ভঙ্গি, হাবভাব—সবই পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়, এ লোক বর্ন লীডার। নেতৃত্ব দেবার সমস্ত গুণ এর মধ্যে রয়েছে। অথচ আর কয়েক ঘণ্টা পর একে মেরে ফেলতে হবে। যদি একে কাজে লাগানো যেত…প্রতিবারই ভাবনার এই পর্যায়ে এসে থেমে গেছে স্টকটন। কাজে লাগানো সম্ভব নয়, জানে ও। সম্ভব হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সুযোগটা হাতছাড়া করতেন না। সুতরাং এ বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

বিশ মিনিট পর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করছে ল্যান্ডরোভার, ব্রেক

কষে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। স্টকটনকে বলল, 'বিনকিউলার নিয়ে যাও আর একবার। শালারা এখনও পিছু লেগে আছে কিনা দেখে এসো।'

ড্যাশ বোর্ডের খোপ থেকে বিনকিউলার নিয়ে নেমে যাচ্ছে স্টকটন, কি মনে করে পিছন দিকে তাকিয়ে দ্রুত চোখ টিপল ডনের উদ্দেশে বলল, 'কারও যদি পানি খরচ করার দরকার থাকে, এই সুযোগ।'

পিছনের দরজা দিয়ে নিচে নামল ডন। স্টকটন যোগ দিল ওর সাথে। ক্রমশ উঠে গেছে গাড়ির পিছনে রাস্তাটা, তারপর আবার নেমে গেছে। রাস্তা থেকে নেমে বড় বড় পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল দু'জন।

'রানাকে কেমন বুঝছ বলো তো?'

'শালা একেবারে খাঁটি ইসরায়েলী বনে গেছে,' বলল ডন। কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তা শেষ যখন করতেই হবে দেরি করছি কেন?'

'মঞ্চটা ঠিকমত সাজিয়ে নিতে হবে, ভুলে গেছ কথাটা?'

'ভুলব কেন? আমি বলতে চাইছি, রানাকে খুন করেও আমরা শত্রুদেরকে এই এলাকায় ধরে রাখতে পারি।'

'কিভাবে?'

'নকশা, মাপজোকের যন্ত্রপাতি তো আছেই, ওগুলো নিয়ে আমরাই মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করব।'

'তাই তো!' স্টকটন উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'দারুণ বুদ্ধি বাতলেছ!'

'আমার কথা হলো, ডিনামাইট তো, ওকে নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করা উচিত হবে না, ফাটিয়ে দেয়াই ভাল।'

'হুঁ,' ভাবছে স্টকটন। 'কিন্তু...'

'খুনটা হতে হবে সুপরিকল্পিত, এই কথা ভাবছ তো?'

'হ্যাঁ। শত্রুরা যেন মনে করে...'

'ম্যাককে সিগন্যাল পাঠাও। কোথায় সে এখন, জানো?'

'কেভো ক্যাম্পে।'

'ওকে বাদ দাও। জুনেস্কি?'

'পিছনে কোথাও আছে,' বলল স্টকটন।

হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে এল ওদের। রাস্তা থেকে একশো গজ সরে এসেছে ওরা। কয়েকটা বড় পাথরের পরই ফাঁকা এলাকা। বুনো ঝোপ টপকে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থামল। রাস্তাটা ওদের ডান পাশে দেখা যাচ্ছে। উঁচু-নিচু ঢেউ তুলে উপত্যকার মাঝখান দিয়ে দিগন্তরেখা পর্যন্ত চলে গেছে। বিনকিউলার চোখে তোলার দরকার হলো না, বহুদূরে ছোট্ট একটা ধুলোর মেঘ দেখেই বুঝল স্টকটন, জীপটা এদিকেই আসছে। গতকাল থেকে পিছু নিয়েছে ওটা। 'আসছে,' বলল সে। চোখে তুলল বিনকিউলার।

'প্রশ্ন হলো, ওরা কারা? জুনেস্কি আর টিটো নয় তো?'

'না। এটা মেটে রঙের, ওদেরটা সবুজ রঙের জীপ।' বিনকিউলার নামিয়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল স্টকটন। 'না, ডন। ম্যাক আর জুনেস্কি কাছেপিঠে না

থাকলে আমি সাহস পাচ্ছি না। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কাজে যদি একচুল ভুল হয়ে যায় সব ফাঁস হয়ে যাবে।' সব ফাঁস হয়ে গেলে কি শাস্তি নেমে আসবে ওদের মাথায় ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল সে।

'যাই বলো, আমি কিন্তু একমুহূর্ত দেরি করার পক্ষপাতী নই,' অসন্তুষ্ট হয়ে বলল ডন। 'কেমন যেন খারাপ লাগছে আমার। পরিবেশটা অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে ক্রমশ। ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না, কিন্তু আমি বলছি, দেখো, যত সময় নষ্ট করব, ততই কঠিন হয়ে উঠবে কাজটা।'

'একথা বলছ কেন?'

'ও মানুষ? নাকি মহামানব? সকলের জন্যে যা করছে, যতটুকু আন্তরিক দরদ দেখাচ্ছে, তুমি দলনেতা হয়ে তা পারছ দেখাতে? বুকে হাত দিয়ে বলো তো—কৃতজ্ঞ বোধ করছ না ওর প্রতি? তাছাড়া, ওর দেশপ্রেমের বহর, কী সাংঘাতিক ব্যাপার ভেবে দেখো! এসব যদি ওর অভিনয় হত…'

'তুমি ভাবাবেগে ভুগছ, ডন,' স্টকটন বিরক্তির সাথে বলল। 'ভুলে যাচ্ছ, লোকটা ইসরায়েলের ভয়ঙ্কর এক শত্রু! ওকে খুন করতে হাত কাঁপবে, এ তোমার দুর্বল মনের পরিচয়।'

'আগেই তো বলেছি, তোমাকে আমি ব্যাখ্যা করে বুঝাতে পারব না,' গম্ভীর হয়ে বলল ডন। 'চলো, ফেরা যাক। দেরি দেখে ইতিমধ্যেই হয়তো রওনা হয়ে গেছে আমাদের খোঁজে।'

ফেরার পথে স্টকটন জানতে চাইল, 'ঠিক কিভাবে কি করতে চাইছ তুমি?'

'সংক্ষেপে বলছি,' শুরু করল ডন। 'পিছনে একটা দল রয়েছে, এতে আরও সহজ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাজ। এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ, কাজে না লাগালে বোকামি হবে। কিভাবে করতে চাই কাজটা, শোনো। গাড়িটাকে খারাপ করে দিয়ে খোলা এবং উঁচু কোন জায়গায় আশ্রয় নেব আমরা। রাস্তা থেকে মেটে রঙের জীপের আরোহীরা দেখতে পাবে গাড়ি এবং আমাদেরকে। সাহায্য করার নাম করে ফিলাতভের কাছাকাছি পৌঁছুবার এই সুযোগটা ওরা হাতছাড়া করবে না, ঠিক?'

'বলে যাও।'

'তুমি ইতিমধ্যে গা ঢাকা দিয়ে সরে যাবে পিছনে,' দ্রুত বলছে ডন, 'আমার ধারণা যদি মিথ্যে না হয়, মেটে রঙের জীপটার পিছনেই কোথাও আছে জুনেস্কি। মোর্স সিগন্যাল পাঠিয়ে ওকে আমাদের উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দেবে। ওরা এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে এগোবে আমাদের দিকে। এরাও পাল্টা গুলি করবে নিশ্চয়ই। এই মহা গোলমালের মধ্যে একটা বুলেট আসল কাজটা সারবে।'

'কার বুলেট?'

'তোমার হতে পারে, আমার, টিটো বা জুনেস্কির হতে পারে। এমন কি, শত্রুদেরও বুলেট হতে পারে। কে জানে কার গুলি খেয়ে মরেছে শালা?'

'কিন্তু মেটে রঙের জীপে যারাই থাকুক, তারা জানে সংখ্যায় আমরা পাঁচজন।

আমাকে দেখতে না…'

'বলব, সাহায্য আনতে গেছ তুমি।'

'রানাকে কি বলবে?'

'বলব, আমাদেরকে যারা অনুসরণ করছে তারা ইসরায়েলের জন্মশত্রু ওদেরকে একটু শিক্ষা দিতে চাই।'

'যদি রাজি না হয়? শিক্ষা দেয়ার এই ব্যবস্থার মধ্যে যদি খুঁত বের করে? এ ব্যাপারে তো ওর জুড়ি নেই। যে যাই বলুক, ভুলগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।'

'রাজি হলে ভাল, তা নাহলে পরে আবার অন্য প্ল্যান করা যাবে,' বলল ডন। 'তবে, এখনই চেষ্টা করা সব দিক থেকে ভাল।'

'কিন্তু, আমি যে সিগন্যাল পাঠাবার জন্যে সরে যাব, তার কি ব্যাখ্যা দেবে রানাকে?'

'যে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে…'

রাজি হয়ে গেল স্টকটন। 'ঠিক বলেছ। সুযোগটা ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না। সুযোগ পেলেই ফেজকে আভাস দিতে হবে।'

'হ্যাঁ!'

কিন্তু ফিরে এসে ওরা দেখল গাড়িতে রানা নেই।

'তোমরা চলে যেতেই গাড়ি থেকে নেমে গেছে রানা,' বলল ফেজ।

'কোন্ দিকে?'

আঙুল দিয়ে রাস্তার ডান পাশটা দেখাল ফেজ। ওরা দু'জন ওদিক থেকেই এসেছে এইমাত্র। নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকাল দু'জন। ফেজকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল ডন।

গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। কয়েক মিনিট পর দেখা গেল রানাকে। সামনের রাস্তা ধরে হন হন করে এগিয়ে আসছে ও। গলায় ঝুলছে একটা বিনকিউলার। মুখটা গম্ভীর। ওদের সামনে এসে থামল।

'মি. রানা…'

দপ্ করে জ্বলে উঠল রানার চোখ দুটো, পর মুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। পটকা ফাটার শব্দ হলো চটাস করে। গালে হাত বুলাচ্ছে স্টকটন। চারটে আঙুলের ছাপ ফুটে উঠেছে সেখানে। পানি বেরিয়ে পড়েছে চোখের কোণে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করার চেষ্টা করছে ব্যথাটা।

'এক কথা কতবার বলব?' শান্ত গলায় বলল রানা, যেন কিছুই হয়নি। 'এই শেষবার বলছি, আমি ডক্টর ফিলাতভ, মাসুদ রানা নই।' স্টকটন, ডন এবং গাড়ির ভিতর থেকে গলা বাড়িয়ে যারা তাকিয়ে আছে তাদের প্রত্যেকের দিকে একবার করে তাকাল রানা। 'এই ভুল ফের যদি কেউ করে, জিভ কেটে নেব তার। আমাদের এই অভিযানের উপর নির্ভর করছে গোটা জাতির ভবিষ্যৎ, কেউ যদি এটাকে হালকাভাবে নেয় উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে তাকে,' স্টকটনের দিকে তাকাল ও। 'হেডকোয়ার্টারে ফিরে তোমার বস্ মি. পপকিনের নামে অভিযোগ

করব আমি। প্রতিটি কাজে যে এত ভুল করে, তাকে সে দলের নেতা করতে চেয়েছিল!' স্টকটনের পাশে দাঁড়ানো গম্ভীর ডনের দিকে তাকাল রানা। 'কি দেখেছ, বলো।'

'পিছু পিছু আসছে জীপটা।'

'ওটার পিছনে আর কোন গাড়ি দেখোনি?'

চোখ দুটো চুল-পরিমাণ বড় হলো ডনের। 'না। কেন?'

'ওই জীপের পিছনেও অন্য দল আছে,' বলল রানা। 'আমাদের সামনে আছে একটা দল, কোন সন্দেহ নেই, পেছনে আছে কয়েকটা।'

'আমাদের সামনেও আছে নাকি শত্রুরা?' গাড়ির ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে জানতে চাইল জুলি।

সামনের রাস্তাটা আঙুল দিয়ে দেখাল রানা। 'চোখ থাকলে এ প্রশ্ন করতে না।'

'ওটা ম্যাকের গাড়ির দাগও হতে পারে,' বলল ডন।

'অসম্ভব,' বলল রানা। 'কেভো ক্যাম্পের দিকে এই রাস্তা দিয়ে একদিন আগে গেছে ম্যাক। কিন্তু ধুলোর ওপর এই দাগ বড়জোর কয়েক ঘণ্টা আগের। যাই হোক, দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই ওরা, এই যা রক্ষে। আমি একটা জরুরী কাজ করতে যাচ্ছি...' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল ও, 'গাড়িতে ওঠো, কুইক!'

নিঃশব্দে রানাকে অনুসরণ করে সামনের সীটে উঠে বসল স্টকটন। মুখটা লাল হয়ে আছে। পিছনের দরজা বন্ধ হবার শব্দ হতেই স্টার্ট দিয়ে ল্যান্ডরোভার ছেড়ে দিল রানা। হুইল থেকে একটা হাত তুলে রাখল স্টকটনের কাঁধে। 'ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগতভাবে নিয়ো না,' মৃদু গলায় বলল ও। 'জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট তুমি, তোমার কাছ থেকে এ ধরনের ভুল আমি আশা করিনি। এ ধরনের ভুল যদি আমি করি, একটা চড় নাহয় লাগিয়ে দিয়ো আমার গালে। যাই হোক, ব্যাপারটা ভুলে যাও। কত দূরে জীপটা?'

'রাস্তার যা হাল, ধীরে ধীরে চালাচ্ছে। এখানে যদি থামি, দশ মিনিটে ধরে ফেলবে আমাদেরকে ওরা।'

পিছনের সীটে বসে সবজান্তার ভঙ্গিতে গম্ভীরভাবে উপর-নিচে একবার মাথা নাড়ল ডন। সে ভাবছে, স্টকটন এখন নিশ্চয়ই টের পাচ্ছে তার কথার মধ্যে কতটা যুক্তি ছিল। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠার আগেই লোকটাকে শেষ করে ফেলা দরকার।

স্টকটন দ্রুত সামলে নিয়েছে নিজেকে। রাগ চেপে বহু কষ্টে চিকন একফালি হাসি ফোটাল ঠোঁটে। ভাবছে, দাঁড়াও, এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিচ্ছি! মুখে বলল, 'জরুরী কি একটা কাজের কথা যেন বলছিলেন, ডক্টর ফিলাতভ?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'শত্রুরা নিশ্চিন্তে অনুসরণ করছে আমাদের। অথচ আমরা ওদেরকে খসাবার জন্যে কোন চেষ্টা করছি না। যেন, বেড়াতে বেরিয়েছি আমরা, আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এটা মোটেই উচিত কাজ হচ্ছে না, তাই না?'

একটু ইতস্তত করে স্টকটন বলল, 'ঠিক।'

'সুতরাং, কিছু একটা করা দরকার।'

'কি?'

'সবুর করো, একটু পরই দেখতে পাবে।'

স্টকটন এবং ডন উত্তেজিত হয়ে উঠল, রক্ত চলাচল বেড়ে গেল ওদের শরীরে। কি করতে যাচ্ছে রানা? ঠিক যা করবে বলে ভেবেছিল ওরা? তাই যদি হয় এই সুবর্ণ সুযোগে একটা বুলেট অনায়াসেই সারতে পারে আসল কাজটা।

আড়চোখে তাকাল রানার দিকে স্টকটন। গাড়ি চালাতে মগ্ন রানা, কিছু একটা ভাবছে গভীরভাবে। এই সুযোগে চট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করল ডন এবং ফেজের সাথে। দু'জনই বুঝল, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে তখন।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামছে ল্যান্ডরোভার। রানার বাঁ দিকে লেক। পাড়টা ক্রমশ নেমে গেছে অনেক নিচে। কচুরিপানা আর শ্যাওলায় ঢাকা পড়ে আছে লেকের পানি। ঢাল বেয়ে সমতল রাস্তায় নেমে এল গাড়ি। লেকের উঁচু পাড় ধরে, কিনারা ঘেঁষে এগিয়ে গেছে রাস্তাটা। লেকের সাথেই ধনুকের মত বাঁক নিয়ে বড় বড় পাথরের বিশাল স্তূপ, বুনো ঝোপঝাড় আর পাইন গাছের আড়ালে হারিয়ে গেছে।

দুশো গজ এগিয়ে দ্রুত বাঁক নিয়েছে আবার রাস্তাটা। তীক্ষ্ণ নজর না রাখলে হঠাৎ বোঝার কোন উপায় নেই। লেকের পাড় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ দূরে থাকতেই এই বাঁক, রাস্তাটা সারি সারি পাথুরে টিলার মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে, দৃষ্টিসীমার বাইরে। পাথর মেশানো মাটির উপর দিয়ে যানবাহন চলাচল করায় রঙটা একটু লালচে হয়ে আছে। এটুকু দেখেই রাস্তা চিনে নিতে হবে। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে কাঠের একটা পোল বহুকাল আগে ছিল। সেটা ভেঙে গেছে, বাতাসের ধাক্কা খেয়ে সরে গেছে এক পাশে। বেপরোয়া গতিতে কোন গাড়ি এলে দুর্ঘটনা এড়াবার কোন উপায় নেই।

বাঁকের মুখে ল্যান্ডরোভার থামাল রানা। 'ব্যাগ ব্যাগেজ সাথে নিয়ে নামো সবাই! কুইক!' পাশের দরজাটা খুলে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ও।

একটা অস্বস্তি নিয়ে নামল সবাই। স্টকটনের দিকে তাকিয়ে আছে ডন, ফেজ। জুলিও।

দরজার ভিতর মাথা গলিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সীটের নিচে থেকে দুটো ব্যাগ টেনে নামাচ্ছে রানা। রাস্তার পাশে রাখল ওগুলো, সিধে হয়ে দাঁড়াল। সবাই এখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল ওর চেহারায়। 'কি ব্যাপার?'

এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল স্টকটন। 'ডক্টর ফিলাতভ, ঠিক কি করতে চাইছেন…?'

স্টকটনের বুকের দিকে তর্জনী তুলে দ্রুত সকলের দিকে তাকিয়ে বলল রানা. 'ইডিয়ট। এই গবেট আমাদেরকে ডোবাবে। যা করতে যাচ্ছি তার সাফল্য নির্ভর করছে টাইমিঙের ওপর অথচ…' মাঝপথে থেমে ডনের দিকে তাকাল রানা 'ফায়ার আর্মসের বাক্সটা বের করো। কুইক! আমি তো ছাই জানিও না ওটায় কি আছে না আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল স্টকটন। বুঝে নিয়েছে সে, এই লোকের কথায় নাচতে হবে তাকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশে চুল-পরিমাণ মাথা নাড়ল সে। অনুমতি পেয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই রানার কথামত গাড়ি থেকে ব্যাগ ব্যাগেজ ইত্যাদি নামাবার কাজে।

এরপর রানার কোন কথার কোন প্রতিবাদ করল না কেউ। বাক্স খুলে প্রত্যেককে একটা করে রিভলভার দিল রানা। নিজেও নিল একটা। প্রত্যেককে ছয়টা করে বুলেট দিল ও।

দ্রুত নির্দেশ দিল রানা। 'জুলি, অ্যামুনিশনের বাক্সটা নিয়ে ওই পাথরগুলোর আড়ালে চলে যাও। ডন, তুমি রাস্তা পেরিয়ে বোল্ডারের আড়ালে লুকাও, সাথে ফেজকে নাও। স্টকটন, বাঁক নিয়ে একশো গজ এগিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকো। যাবার সময় তোমাকে আমরা তুলে নেব।'

থামল রানা। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই ওর মুখের দিকে। 'উঁকি মেরে দেখার ঝুঁকি কেউ নিয়ো না। শত্রুপক্ষ যেন বুঝতে না পারে আমরা সবাই এখানে লুকিয়ে আছি। আমি...'

'কিন্তু খাড়িটা দেখে ওরা...'

'চুপ! ব্যাখ্যা দেবার সময় এটা নয়,' দ্রুত বলল রানা। রিস্টওয়াচ দেখল। 'তিন মিনিট পেরিয়ে গেছে। যে যার বোঝা নিয়ে ছুট দাও।'

খুশি মনে ছুটল স্টকটন। বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল দ্রুত। বাকি সবাই যে যার জায়গার দিকে এগোচ্ছে।

সবাই অদৃশ্য হয়ে যেতে গাড়িতে চড়ল রানা। স্টার্ট দিল। নিষেধ করা সত্ত্বেও উঁকি মেরে দেখছে ডন, ফেজ, জুলি। গাড়িটা পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রানা।

সবাই স্তম্ভিত। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না রানার উদ্দেশ্য। প্রায় পঞ্চাশ গজ পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে ল্যান্ডরোভার দাঁড় করাল রানা। গিয়ার বদল করে রাস্তার উপর দিয়ে সামনে আনছে গাড়িটাকে। দ্রুত বাড়ছে স্পীড। আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই জায়গাটা ঝড়ের বেগে পেরিয়ে গেল ল্যান্ডরোভার।

আঁতকে উঠল জুলি। স্রেফ মরতে যাচ্ছে রানা। হায় হায় করে উঠল সে।

বাঁক না নিয়ে নুড়ি ছড়ানো উঁচু নিচু পাথুরে মাটির উপর দিয়ে সোজা ছুটে যাচ্ছে ল্যান্ডরোভার। রাস্তা থেকে নেমে গেছে গাড়ি। ত্রিশ গজ সামনে কিনারা, ঝপ্ করে নেমে গেছে খাদ, চল্লিশ গজ নিচে লেকের পানি।

'আন্তন!' একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল জুলির গলা চিরে।

ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, সেটাকে ফিরিয়ে নেবার আর কোন উপায় নেই। আর মাত্র দুই সেকেন্ড, মৃত্যু গহ্বরে নেমে যাচ্ছে ল্যান্ডরোভারটা। কিনারা থেকে ছয় সাত গজ দূরে এখন গাড়ি, ব্রেক করলেও শেষ রক্ষা হবে না।

শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল রানা? আড়াল থেকে বেরিয়ে উন্মাদিনীর মত ছুটতে ছুটতে ভাবছে জুলি।

ল্যান্ডরোভার ডাইভ দিয়ে পড়ল শূন্যে। সামনেটা নিচু হয়ে যাচ্ছে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল নিচের দিকে, কয়েক সেকেন্ড পর এল পতনের ভারী

আওয়াজ।

রানাকে দেখতেই পায়নি জুলি। গাড়িটা কিনারায় পৌঁছবার আগেই দরজা খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ও। মাটিতে গড়ান খেয়ে দ্রুত উঠে একছুটে কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাল করে দেখার জন্যে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ও। গলা বাড়িয়ে নিচেটা দেখছে। লেকের পানিতে ডুবে গেছে ল্যান্ডরোভার। চারটে চাকা উপর দিকে, এখনও ঘুরছে বনবন করে। পায়ের আওয়াজ শুনে উঠে দাঁড়াল রানা। ঘুরে দাঁড়াল।

'আন্তন!' ছুটে এসে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জুলি।

খপ্ করে জুলির একটা হাত ধরল রানা, কথা না বলে দৌড়াতে শুরু করল।

'উফ্! আস্তে! ভেঙে যাবে হাত!' ব্যথায় চিৎকার করে উঠল জুলি।

'হাত, পা, মাথা সব ভেঙে দেব তোমার আমি,' রাগের মাথায় বলল রানা। 'আড়াল থেকে বেরুতে নিষেধ করিনি?'

'গাড়িটা ফেলে দিলে কেন?' হাঁপাচ্ছে জুলি। রানার সাথে দৌড়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না সে। 'এখন কি হবে?'

'কি হবে তা তোমাকে ভাবতে হবে না,' জুলি যেখানে লুকিয়ে ছিল সেই জায়গায় পৌঁছে থামল রানা। জুলির মাথায় মৃদু চাটি মেরে বলল, 'বসে পড়ো! খবরদার, টুঁ শব্দ করবে না বা উঁকি ঝুঁকি মারবে না। এখুনি আসছি আমি।' বলেই পাথরের স্তূপগুলোর দিকে ছুটল ও।

এক মিনিটের মধ্যে ফেজ এবং ডনের সাথে দেখা করে জুলির কাছে আবার ফিরে এল রানা। কখন কি করতে হবে জানিয়ে এসেছে দু'জনকে, কিন্তু ওদের কারও কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।

হিসেবে ভুল করেছিল স্টকটন, পিছনের দলটা এল ঠিক এগারো মিনিটের মাথায়। জীপের ড্রাইভিং সীটে বসা লোকটাকে দেখে বিস্ময়ে প্রায় আঁতকে উঠে রানার দিকে তাকাল জুলি। মৃদু হেসে ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রানা, কথা বলতে নিষেধ করল।

বাঁকটা দেখতে ভুল করেনি জ্যাক জাস্টিস। জীপের স্পীড কমিয়ে ফেলেছে এরই মধ্যে। ছ্যাঁত্ করে উঠল বুকটা রানার। বাঁক নিয়ে চলেই যাবে নাকি? হুইল ঘোরাতে শুরু করার ঠিক আগের মুহূর্তে সামনের নুড়ি ছড়ানো উঁচু-নিচু পাথুরে মাটির উপর চাকার দাগ চোখে পড়ল জ্যাকের। দ্রুত ব্রেক কষল সে। তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বাঁকের মুখে জীপ। কর্কশ গলা শোনা গেল জ্যাকের, কিন্তু কথাটা পরিষ্কার বোঝা গেল না। লাফ দিয়ে নামল সে। ছুটল নাক বরাবর।

নিঃশব্দে হাসছে রানা। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে জুলি।

জীপের পিছন থেকে আরও দু'জন লোক নামল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর। জ্যাক জাস্টিস! সেই ওকে হেলসিঙ্কি হোটেলের এলিভেটর থেকে কিডন্যাপ করে একটা কামরায় নিয়ে গিয়েছিল! কণ্ঠস্বরটা তখন ও চিনতে পারেনি, তার কারণ, স্বাভাবিক মার্কিন উচ্চারণটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করেছিল সে।

জ্যাককে অনুসরণ করছে তার সহকর্মীরা। পঁয়ত্রিশ গজ ছুটে গিয়ে কিনারায়

দাঁড়াল ওরা। উঁকি মেরে দেখছে নিচের লেকটা।

জুলির হাত ধরে উঠে দাঁড়াল রানা। বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। ছুটতে শুরু করল। ইতোমধ্যে যে যার আড়াল থেকে ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। প্রায় পৌঁছে গেছে জীপের কাছে।

লাফ দিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল ডন। তার পাশে ফেজ। পিছনের সীটে জুলিকে তুলে দিল রানা। স্টার্ট দেয়াই ছিল, ডন ছেড়ে দিল জীপ। পিছু পিছু ছুটছে রানা। তারপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে।

বাঁক নিচ্ছে ডন। কিন্তু তাকিয়ে আছে বাঁদিকে। জ্যাক জাস্টিস আর তার সঙ্গীরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, এদিকে মুখ করে। ঠিক যেন তিনটে পাথরের মূর্তি। পরমুহূর্তে মূর্তি তিনটে শূন্যে কিল-ঘুসি ছুঁড়তে শুরু করল। সেই সাথে ছুটছে। বাইরে মুখ বের করে ওদের দিকে তাকাল রানা। হাত নাড়ল, বিদায়ের ভঙ্গিতে।

হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে পকেট থেকে রিভলভার বের করল জ্যাক জাস্টিস। দেখাদেখি তার সঙ্গীরাও।

গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল।

ওদিকে অস্থিরতার চরমে পৌঁছে গেছে স্টকটন। রানার নির্দেশ মত একশো গজ নয়, বাঁক থেকে মাত্র বিশ গজ দূরের একটা উঁচু ঝোপের আড়ালে ওৎ পেতে বসে আছে সে। কান দুটো খাড়া। শক্ত হাতে ধরে আছে লোডেড রিভলভারটা। ঝোপের আড়াল থেকে গলা বাড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে বাঁকের দিকে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাইছে মনে মনে : গুলি হোক, হাঙ্গামা হোক, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছুটোছুটি শুরু করবে শালা, সেই সুযোগে ওর মগজে ঢুকিয়ে দিই একটা বুলেট!

ঠিক কি করতে যাচ্ছে রানা, অনুমানে বুঝে নিয়েছে স্টকটন। ল্যান্ডরোভার লেকে ফেলে দেবার একমাত্র উদ্দেশ্য অনুসরণরত মেটে রঙের জীপটাকে হাইজ্যাক করে আরোহীদেরকে রাস্তার মাঝখানে অসহায়ভাবে ফেলে যাওয়া। ব্যাপারটা শেষ মুহূর্তে টের পাবে জীপের আরোহীরা। এবং টের পাওয়া মাত্র গুলি ছুঁড়বে। চাকা ফুটো করে দিয়ে জীপটাকে থামাতে চাইবে তারা। থামাতে পারলে ভাল তা নাহলে স্টকটন গুলি করে থামাবে ওটাকে। থামাতে পারলেই পনেরো আনা কাজ শেষ। বাকি এক আনা কাজও পানির মত সহজ। গাড়ি অচল হয়ে গেছে দেখে প্রাণ রক্ষার জন্যে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে যে যেদিকে পারে সরে যাবার চেষ্টা করবে। রানাও তাই করবে, সন্দেহ নেই। এ সময় চারদিক থেকে গোলাগুলি ছুটবে। ফেজ এবং ডন ওর গায়ের কাছে আছে, সুযোগ পেলে তারা হাতছাড়া করবে না। আর আড়াল থেকে সে তো লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করবেই। ভেতো-বঙ্গসন্তান, চু-চু-চু, তোমার কোন আশাই নেই হে!

হঠাৎ তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। প্রথমে একটা রিভলভারের নিঃসঙ্গ আওয়াজ, পরমুহূর্তে স্টেনগানের তীক্ষ্ণ গর্জন চারদিকের নিস্তব্ধ পাহাড়ী এলাকাটাকে কাঁপিয়ে দিল। রক্তে খুশির নাচন শুরু হয়ে গেল স্টকটনের।

গুলি যে হবে, জানত রানা। সবাইকে সাবধান করে দিতেও ভোলেনি সে। জ্যাক জাস্টিসের হাতে রিভলভারটা গর্জে উঠতেই উরুর উপর থেকে স্টেনটা তুলে

নিল সে, ব্রাশ করল জ্যাক এবং তার সঙ্গীদের পায়ের দিকে। স্টেনটা সফল হাইজ্যাকিঙের পুরস্কার স্বরূপ জীপ থেকে পেয়েছে ওরা, তার সাথে আরও নানান অস্ত্র এবং গোলা-বারুদও। ঠাস ঠাস গুলি বেরিয়ে যাচ্ছে জুলি আর ফেজের রিভলভার থেকে।

বাঁক নিচ্ছে জীপ। স্টেনের ব্রাশ বা রিভলভারের বুলেটগুলোকে গ্রাহ্য করছে না জ্যাক জাস্টিস। সঙ্গীদের নিয়ে তীর বেগে ছুটে আসছে তারা।

জীপের স্পীড আরও কমে যাচ্ছে। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। ডন একহাতে স্টিয়ারিঙ ধরে পিছন দিকে তাকিয়ে আছে, হাতের রিভলভারটা থেকে আগুনের হলকা ছুটল পর পর দু'বার। রানার মাথার একটু উপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট দুটো। হেসে ফেলল রানা। 'দূর বোকা, ওদেরকে ঠেকাতে আমরাই যথেষ্ট, তোমার কাজ তুমি করো।'

হাতের রিভলভারটা এক ইঞ্চির পাঁচ ভাগের এক ভাগ নামিয়ে রানার কপালের মাঝখানটা ফুটো করে দেবার অদম্য ইচ্ছাটা চাপতে চেষ্টা করছে ডন। ঝড় বয়ে যাচ্ছে মনের ভিতর। এক সেকেন্ডের মধ্যে কত বিচিত্র চিন্তা খেলে যাচ্ছে ওর মাথায়। ট্রিগারটা টিপে দিলেই সব ঝামেলার অবসান হয়। হেডকোয়ার্টার থেকে প্রশংসা আসবে। সেই সাথে পদোন্নতির সন্দেশ। কিন্তু…।

ডনের মত কোন দ্বন্দ্বে ভুগছে না ফেজ। একটা কাজ কখন কিভাবে করবে তা সে আগেভাগেই ঠিক করে নেয়। মনে মনে তার ঠিক করে রাখা সময়টা না এলে যত সুবর্ণ সুযোগই আসুক, গ্রহণ করে না সে। রানার হাতের স্টেনগান নীরব, লক্ষ করলেও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না সে। রিভলভারে এখনও তিনটে বুলেট রয়েছে তার। সে ঠিক করেছে রানার কপাল ফুটো করার জন্যে শেষ বুলেটটাকে কাজে লাগাবে। রানার চোখে চোখ রেখে গুলি করার মধ্যে একটা পুলক থাকবে, তা থেকেও নিজেকে সে বঞ্চিত করতে চায় না।

বাঁক থেকে বিশ গজ দূরে চলে এসেছে গাড়ি। পিছু পিছু ছুটে আসছে প্রতিপক্ষরা, সবার আগে জ্যাক জাস্টিস। পিছন থেকে জীপের চাকায় গুলি করছে তারা, টার্গেট ছোট, তার উপর গাড়িটা চলন্ত, লক্ষ্যভেদ হচ্ছে না কোনমতেই।

ব্যাপারটা ঝোপের আড়াল থেকে বুঝতে পারল স্টকটন। জীপটা তার দশ গজ সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এক পাশের দুটো টায়ারের সবটুকুই ওর টার্গেট। লক্ষ্য স্থির করল সে।

অতিরিক্ত বুলেট দুটো বের করে দেবার জন্যে জ্যাককে লক্ষ্য করে গুলি করছে ফেজ। প্রথম গুলিটা জ্যাকের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। ঠিক এই সময় বাঁ পাশে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ধরা পড়ল চোখের কোণে। ঝট্ করে তাকাল সেদিকে। পরিষ্কার দেখতে পেল স্টকটনকে। বোকা বোকা চেহারা হয়েছে স্টকটনের। গুলি করেছিল, চাকায় লাগেনি। আবার লক্ষ্যস্থির করছে সে। এবার জীপের পিছনের চাকায় গুলি করবে।

দ্বিতীয়বার গুলি করল ফেজ। জ্যাকের একজন সঙ্গী দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল, হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার। হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাস্তার উপর। গুলিটা লেগেছে ঠিক

হাঁটুতে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে জ্যাক জাস্টিস। কিন্তু আহত সঙ্গীর দিকে কোন খেয়ালই নেই তার। খেয়াল তার এখন জীপের দিকেও নয়।

কেমন যেন খটকা লাগল ফেজের। কিন্তু ব্যাপারটা বোঝার জন্যে সময় দেয়া এখন তার পক্ষে সম্ভব নয়। রিভলভারে একটাই বুলেট আছে এখন। সময় হয়েছে।

ঝট্ করে ফিরল ফেজ। শরীরটা ঘুরে গেল খানিকটা সেই সাথে রিভলভার ধরা হাতটা। রিভলভারের নল রানার বুকের দিকে, মাত্র আধ হাত তফাতে। ডনের চোখে চোখ রাখল সে। চোখে চোখে কথা হলো।

'বুলেট শেষ বুঝি?' ঝট্ করে ফেজের দিকে ফিরল রানা। 'আমার রিভলভারটা ব্যবহার করো।' দু'পায়ের মাঝখানে গাড়ির মেঝেতে পড়ে থাকা রিভলভারটা তোলার জন্যে মাথা নিচু করল ও।

গর্জে উঠল ফেজের হাতের রিভলভার। কান ফাটানো শব্দ হলো জীপের ভিতর। চমকে উঠে মুখ তুলল রানা। এক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ফেজ। পিন দিয়ে কেউ যেন আটকে রেখেছে চোখটার দুটো পাতা। আতঙ্কে বিস্ফারিত। অপর চোখটা নেই। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে চোখের জায়গায় সদ্য তৈরি গর্তটা থেকে। দ্রুত একপাশে সরে বসল রানা, আর একটু হলে রক্তে ভিজে যেত ওর কাঁধ। পাশের ক্যানভাসটা রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। 'ডন, গুলি খেয়েছে ফেজ!' স্টেনটা উরুর উপর থেকে ঝট্ করে তুলে নিয়ে চিৎকার করে বলল রানা। তাকাল জীপের পিছন দিকে।

'ও মাই গড!' কণ্ঠস্বরে একটা হাহাকার ফুটে উঠল রানার।

চারদিক হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, জীপের পিছু পিছু এখন আর দৌড়াচ্ছে না জ্যাক জাস্টিস বা তার সঙ্গী। ডুকরে কেঁদে উঠল জুলি। পিছন ফিরে রানার মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে ডন স্টকটনের দিকে। বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে চোখ দুটো বিস্ফারিত।

ঝোপের আড়াল থেকে গড়াতে গড়াতে বেরিয়ে আসছে স্টকটন। দু'হাত দিয়ে বাঁ দিকে বুকের কাছে চেপে রেখেছে। আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসছে তরল রক্ত।

দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা, 'এর প্রতিশোধ নিতে হবে!' স্টেনগান গর্জে উঠল ওর হাতে।

প্রথম সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেছে, বুঝতে পেরে দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে জীপের স্পীড বাড়িয়ে দিল ডন। স্টিয়ারিঙ ধরা হাত দুটো থর থর করে কাঁপছে তার। দুর্ভাগ্য! ভাবছে সে। দুর্ভাগ্য ছাড়া কিই বা বলা যায় একে! গোটা দৃশ্যটা চোখের সামনে এখনও ভাসছে তার। এক সেকেন্ডের এদিক-ওদিকে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। কাউকে দোষ দেয়া যায় না। স্টকটন জীপের চাকা লক্ষ্য করেই গুলি করেছিল। কিন্তু তার প্রথম গুলিটার আওয়াজ কানে ঢোকে জ্যাক জাস্টিসের। আওয়াজ শুনে সে মনে করেছে রাস্তার পাশ থেকেও তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। আত্মরক্ষার জন্যে ঝোপের দিকে গুলি করে সে। বুলেটের ধাক্কায়

নড়ে যায় স্টকটনের হাত, চাকায় না লেগে সোজা এসে গুলি ঢোকে ফেজের চোখে। ফেজের হাতও নড়ে গেল, ফলে রানার মাথায় না লেগে তার বুলেটটা বেরিয়ে গেল ক্যানভাস ফুটো করে। দুর্ভাগ্য ছাড়া কি বলা যায় একে! গোলাগুলি হঠাৎ বন্ধ হয়ে না গেলে শেষ সুযোগটা নিতে পারত সে। কিন্তু এখন আর কোন সুযোগ নেই।

'আমাদের এই ক্ষতি কোনদিন পূরণ হবে না,' সীটের উপর ঢলে পড়া ফেজের শরীরটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে সিধে হয়ে বসল রানা। আবেগে বুজে এল ওর গলার স্বর। 'ফেজ আর স্টকটন আমাদের মাঝে আর কোনদিন ফিরে আসবে না, ভাবতে গিয়ে বুকটা ফেটে যাচ্ছে আমার!'

দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছে জুলি। রানার পিছনে, ক্যানভাসের ফুটোটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'আর একটু হলে তুমিও...'

পিছন ফিরে জুলির দিকে না তাকিয়েও ডন বুঝল, ক্যানভাসের গায়ে ফুটোটা দেখে কথাটা বলছে জুলি। একটুর জন্যে বেঁচে গেছে, ঠিক, কিন্তু বারবার কি বাঁচবে? আপন মনে ভাবছে সে। আর বত্রিশ ঘণ্টা পর তিনদিন পূর্ণ হবে। কোন বাধাই তখন থাকবে না। সুযোগের অপেক্ষায় থাকার দরকার হবে না। সে, জুনেস্কি, টিটো এবং ম্যাক—চারজনের মধ্যে যার সুযোগ হবে সে-ই গুলি করে গুঁড়িয়ে দেবে ওর মাথার খুলি।

রাস্তা থেকে চ্যাংদোলা করে তুলে নুড়ি পাথরের স্তূপের পাশে নিয়ে এসে নামানো হয়েছে স্টকটনকে। চোখ দুটো বন্ধ তার, মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাসে। ছড়িয়ে আছে হাত-পাগুলো নিশ্চল। ক্ষতের মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছে জ্যাক জাস্টিস, রক্তপড়া বন্ধ হয়েছে তাতে। তার বুকের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে আছে সে। ঝুঁকে পড়েছে মৃত্যুপথযাত্রীর মুখের উপর। দুই হাত দিয়ে তার কাঁধ খামচে ধরল। কানের কাছে মুখ নামিয়ে চিৎকার করছে, 'কথা বলো, কথা বলো, কথা বলো! কোথায় যাচ্ছেন ডক্টর ফিলাতভ? এদিকে কেন, কি উদ্দেশ্যে এসেছেন তিনি? নকশা-টকশা...'

স্টকটন ধীরে ধীরে চোখ মেলছে দেখে থেমে গেল জ্যাক জাস্টিস। পিছন থেকে তার সঙ্গীর কাতরানির আওয়াজ ভেসে আসছে। অপর সঙ্গীটি শুশ্রূষা করছে তার।

জ্ঞান হারায়নি স্টকটন, আশপাশে কি ঘটছে, কে কি বলছে সবই বুঝতে পারছে সে।

'বাঁচবে তুমি,' জোর গলায় আশ্বাস দিল জ্যাক জাস্টিস। 'হার্টের কোন ক্ষতি করেনি বুলেট। রক্ত পড়া বন্ধ করে দিয়েছি। চিকিৎসা করলেই বাঁচবে তুমি। করব চিকিৎসা। ভয়ের কিছু নেই। ডক্টর ফিলাতভের কথা বলো। কি উদ্দেশ্যে...'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছে স্টকটন।

'কি? ভয় হচ্ছে, মারা যাবে?'

জ্যাক জাস্টিসের চোখে চোখ রেখে আবার এদিক-ওদিক মাথা নাড়তে শুরু করল স্টকটন। ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ। দু'হাত দিয়ে চেপে রেখেছে বুকের

ক্ষতটা। 'জানি। চিকিৎসা হলে...'

'হ্যাঁ, বাঁচবে। এবং তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা করছি।' ব্যগ্র হয়ে বলল জ্যাক জাস্টিস। 'কিন্তু তার আগে...'

দীপ নিভু নিভু, তবু মুহূর্তের জন্যে ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা স্টকটনের।

'কি! মুখ খুলবে না?' অবিশ্বাসভরে স্টকটনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জ্যাক জাস্টিস। 'তুমি বাঁচতে চাও না?'

নিভে গেল স্টকটনের হাসি। চোখ বুজে গেছে। দীপ নিভে যায় যায়। জ্যাক জাস্টিস তার কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আই স্যালুট ইউ, স্টকটন। তোমার দেশপ্রেমের প্রশংসা করি। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের এত সুনামের কারণ কি, আজ বুঝলাম।'

জ্যাক জাস্টিসের কথাও শেষ হলো, অমনি একপাশে ঢলে পড়ল স্টকটনের মাথা। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে উঠে দাঁড়াল জ্যাক জাস্টিস। সঙ্গীদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল কিছু। ভাষাটা ইংরেজি নয়, রাশান। সংক্ষিপ্ত উত্তরটাও তাই।

হিংস্র আক্রোশে ফুঁসছে ডন, কিন্তু তার কোন প্রকাশ নেই। অন্তত মুখে কিছু বলছে না সে। খানাখন্দ দেখে জীপটাকে তুমুল ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে, এদিক-ওদিক অনবরত ঘুরছে তার হাতের স্টিয়ারিঙ হুইল। একটা ভুল ধারণা ভেঙে গেছে তার। সে ভেবেছিল সমগ্র অভিযানে বাইরে থেকে তেমন বিপদের ঝুঁকি নেই। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। জ্যাক জাস্টিসের জীপে টাইম বোমা, গ্রেনেড থেকে শুরু করে টেলিস্কোপ লাগানো রাইফেল, স্টেনগান ইত্যাদি দেখে চোখ খুলে গেছে তার। যে-কোন মূল্যে ডক্টর ফিলাতভকে কেড়ে নেবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে ওরা। শুধু ওরা নয়, সবগুলো দলই নিশ্চয়ই একই উদ্দেশ্যে তৈরি হয়ে এসেছে। ডক্টর ফিলাতভকে কব্জা করার জন্যে দু'একটা মানুষ খুন তো মামুলি ব্যাপার, দরকার হলে ওরা ম্যাসাকার করবে। তার ক্ষোভ আর দুঃখের কারণ হলো, প্রতিপক্ষের এই বেপরোয়া যুদ্ধ প্রস্তুতির পরিণতিতে এতটুকু বিপদের ভয় নেই ডক্টর ফিলাতভ, ওরফে রানার। তার গায়ে কেউ আঁচড়টি পর্যন্ত কাটবে না। সমস্ত ঝড়-ঝাপটা যাবে তাদের উপর দিয়ে। প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহ। জুলি গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু না জানলেও, তাদের দু'জনের জীবনই বিপন্ন। টিটো, জুনেস্কি এবং ম্যাকের বিপদও কম নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো পরস্পরকে ঘায়েল করার চেষ্টা করবে, সবাই চাইবে সবার আগে ডক্টর ফিলাতভকে মুঠোয় ভরতে, তাতে সংঘর্ষ অনিবার্য। বুদ্ধি এবং শক্তি যাদের বেশি, তারাই জিতবে। তাই যদি হয় ব্যাপারটা, টিটো-জুনেস্কি থই পাবে না। একজন লোককে খুন করার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছে ওরা, কয়েকটা দলের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিয়ে নয়। যুদ্ধ শুরু হলে পরাজয় বরণ করতে হবে, প্রাণ দিতে হবে।

অপর দিকে, ভাবছে ডন, রানা সম্পর্কে যে ভয়টা সে করেছিল, তা যথার্থই। যত দেরি হবে, ওকে খুন করা ততই কঠিন হয়ে উঠবে। যেমন অসম্ভব ক্ষুরধার বুদ্ধি, সেই রকম দুর্ধর্ষ। একে সামলানো ছয় জনের একটা দলের পক্ষে কিভাবে সম্ভব?

কার্ল পপকিনের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করতে শুরু করল সে। দূরদৃষ্টি থাকলে বিনা প্রস্তুতিতে এ ধরনের বিপজ্জনক একটা অভিযানে পাঠাত না সে।

মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করল ডন। তিন দিন গত হওয়া মাত্র ঘড়ির কাঁটা দেখে খতম করবে সে রানাকে। কাজটা দশটা দলের সামনে সারতেও দ্বিধা করবে না।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। 'আমার নিরাপত্তার দিকটা দেখতে গিয়েই মরতে হলো স্টকটনকে,' মৃদু গলায় বলল ও। 'ওকে একশো গজ দূরে সরে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মাত্র বিশ গজ দূরে লুকিয়ে ছিল সে।' বিষণ্ন মুখে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছে ও। 'কেন রে, পাগল, এই অতিরিক্ত কর্তব্যবোধ দেখাতে গেলি তুই!'

'হ্যাঁ,' বলল জুলি, 'ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে তাকে। ইস্, ও যদি তোমার নির্দেশ শুনত, ফেজকেও এভাবে মরতে হত না। খুবই ভাগ্যের জোর, বেঁচে গেছ তুমি।'

ম্যাপ দেখছে রানা। মাঝে মাঝে মুখ তুলে রাস্তার দু'পাশে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। হঠাৎ বলল, 'ডন, গাড়ি থামাও।'

ব্রেক কষে জীপ দাঁড় করাল ডন। 'কি ব্যাপার?'

সামনের রাস্তাটা যেখানে চওড়া হয়ে গেছে তার বাঁ দিকের সমতল জায়গাটার উপর দিয়ে প্রায় সিকি মাইল দূরে চলে গেছে রানার দৃষ্টি। পাইন গাছের ভিড় ওদিকে। আঙুল তুলল রানা, 'ওখানে যেতে চাই।'

'কেন?' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করল ডন। 'আবার কিছু করার কথা ভেবেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। স্টকটনের ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই,' বলল রানা, 'ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু ফেজকে আমরা যথাযোগ্য সম্মানের সাথে সমাহিত করব। তাছাড়া, কেভো ক্যাম্পে পরে গেলেও চলবে, তার আগে বিশ্রাম দরকার আমাদের।' একটু বিরতি নিল রানা। 'কিন্তু স্মৃতি হারাবার ফলে ধর্মীয় নিয়ম কানুন কিছুই তো আমার মনে নেই—আমরা লাশ পোড়াই, না মাটি দিই?'

'চিন্তা কোরো না,' বলল ডন। 'আমরা তো জানি সব।'

'আরও একটা উদ্দেশ্য আছে আমার। শত্রুপক্ষদের গতিবিধি সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে চাই ওখান থেকে।' অনেকক্ষণ পর পাইপে টোবাকো ভরতে দেখছে জুলি রানাকে। 'আমি ঠিক করেছি,' বলল রানা, 'যারা আমাদেরকে অনুসরণ করছে প্রত্যেকের বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। প্রতিশোধ নিতে না পারলে কি করে মুখ দেখাব মি. পপকিনকে?'

হেলসিঙ্কি। ইসরায়েলী দূতাবাস।

অফিসরুমে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে পপকিন, কোথাও কোন সন্দেহ নেই, অনুভব করছে সে, একটা মস্ত গোলমাল বেধে গেছে। কিন্তু গোলমালটা কি হতে পারে, গত তিন দিন থেকে হাজারো মাথা ঘামিয়েও বের করতে পারছে না।

রানাকে নিয়ে স্টকটন রওনা হয়ে গেছে গতকাল। তার আগের দিনই অয়্যারলেসে মেসেজ পাঠিয়েছে সে হেডকোয়ার্টারে। মেসেজে পরিষ্কার জানিয়েছে, বারো ঘণ্টার মধ্যে ডক্টর ফিলাতভকে পাঠিয়ে দিতে হবে। তার পরিকল্পনা ছিল, রানাকে পাঠিয়ে দিয়ে এক ঘণ্টা পরই সে রওনা হয়ে যাবে ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে।

হ্যাঁ-না কোন উত্তর আসেনি বারো ঘণ্টা পর। ডক্টর ফিলাতভও এসে পৌছায়নি। গতকাল আবার মেসেজ পাঠিয়েছে সে। ভেবেছিল রাত্রের মধ্যে পৌছে যাবে ডক্টর। কিন্তু এবারও নিরাশ হতে হয়েছে তাকে। তিন এবং চার নম্বর মেসেজ আজ সকাল এবং দুপুরে পাঠিয়েছে—কোন সাড়া নেই হেডকোয়ার্টারের। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এর আগে এমন কখনও ঘটেনি। অবস্থা এমন বিদঘুটে, উদ্ভট সব চিন্তা ঢুকছে তার মাথায়। ইসরায়েল নামক দেশটা কর্পূর হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়নি তো?

কিন্তু এসব আজেবাজে কথা ভেবে চুপ করে বসে থাকতে পারছে না পপকিন। গতকালই ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে রওনা হয়ে যাবার কথা ছিল তার।

পায়চারি থামিয়ে ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসল সে। রাইটিং প্যাড টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল মেসেজ। 'রাতের ফ্লাইটে আমি আসছি...'

চার

পাইন গাছের আড়ালে আধখানা সূর্য, মাটিতে রৌদ্রছায়ার চঞ্চল আলপনা। পরনে সাদা কালো ডোরা কাটা ঢিলেঢালা স্লিপিং গাউন রানার, বাতাসভরা রাবারের নরম বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বালিশ বুকে দিয়ে। চোখে বিনকিউলার। তাকিয়ে আছে রাস্তার দূর প্রান্তে। ওর দিকে ফিরে কাত হয়ে শুয়ে আছে জুলি, স্বচ্ছ নাইলনের ফ্রকের নিচে সাদা অন্তর্বাস এবং ব্রা। গালে একটা হাত রেখে রানার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। ভাঁজ পড়া বয়স্ক মুখটার জায়গায় হয়তো রানার আসল চেহারাটা কল্পনা করেছে।

রাস্তা থেকে ওদের ক্যাম্প তিনশো গজ দূরে। দু'দিকে উঁচু পাথুরে মাটির ঢিবি, আরেক দিকে পাইন গাছের বেড়া। সামনের রাস্তা ধরে কেভো ক্যাম্পের দিকে যারাই যাক, পরিষ্কার দেখতে পাবে ওদেরকে। এখান থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক পিছনের রাস্তা দেখতে পাওয়া যায়।

আধঘণ্টা আগে তাঁবু গেড়েছে ওরা। জ্যাক জাস্টিসের জীপে প্রচুর রেডিমেড খাবার আবিষ্কৃত হওয়ায় রান্না-বান্নার ঝামেলা থেকে বেঁচে গেছে জুলি। এখন রাত দশটা। ঠিক হয়েছে একটা পর্যন্ত ঘুমাবে ডন। তারপর রানা ঘুমাতে যাবে। জুলিরও এখন ঘুমাবার পালা। কিন্তু একটু আগে তাঁবু থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে সে। হাতে বালিশ। বলেছে, 'মেশিনগান চালাচ্ছে লোকটা। বিশ্বাস না হয়, যাও, শুনে এসো নিজের কানে। এর নাম যদি নাক ডাকা হয়...' কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে

বিছানার একপাশে সরিয়ে দিয়েছে রানাকে, তারপর শুয়ে পড়েছে গা ঘেঁষে। রানাকে হেসে উঠতে দেখে ঠোঁট উল্টে বলেছে, 'যতই হাসো, ওসব আমি কেয়ার করি না। কিছু ওষুধ থাকলে দাও, তা নাহলে ঘুম আসবে না আমার।'

জ্যাক জাস্টিসের জীপ থেকে স্টেন ছাড়াও ছয়টা গ্রেনেড, ছয়টা টাইম বম্ব, টেলিস্কোপ লাগানো রাইফেল এবং বিস্তর গোলাবারুদ পাওয়া গেছে। ডনকে দিয়ে অস্ত্রগুলো চেক করিয়ে নিয়েছে রানা। সমস্ত অস্ত্র এবং গোলাবারুদের দায়িত্ব ডনের উপরই ছেড়ে দিয়েছে ও, নিজের সাথে রেখেছে একটা রিভলভার আর স্টেন। স্টেনটা পড়ে আছে বিছানার পাশে। রিভলভারটা বালিশের তলায়।

এখানে পৌঁছেই তাড়াহুড়ো করে ব্যবস্থা করা হয়েছে লাশের। শোক প্রস্তাবটার উদ্যোক্তা ছিল দলনেতা রানা। এক মিনিট নীরবতা পালন করে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে ম্যালকম ফেজের অমর আত্মার প্রতি।

পাশ থেকে দেখছে জুলি, চোখের কোণ একটু কুঁচকে উঠল রানার। 'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' জানতে চাইল সে।

'হুঁ,' দূর-প্রান্তসীমায়, রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়ে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেখানে ধুলোর ক্ষীণ একটা মেঘের আভাস দেখতে পাচ্ছে রানা। 'এখনও পরিষ্কার নয়। জীপ বলে মনে হচ্ছে না।'

'আমার ধারণা, জ্যাক জাস্টিস আসছে,' বলল জুলি।

'কারও গাড়ি যদি ছিনতাই করতে পেরে থাকে।'

'আমাদেরকে তো দেখতে পাবে, প্রতিক্রিয়াটা কি হবে তাই ভাবছি!'

'ওর স্টেন এখন আমাদের কাছে। সে যে স্টকটনকে খুন করেছে তা আমরা দেখেছি জানে। আমার ধারণা, অন্য কোন উপায়ে আমাদের খবর রাখবে সে, কাছে পিঠে সহজে ঘেঁষবে না আর।'

আরও খানিক পর চকচকে বাদামী গাড়িটা স্পষ্ট হলো। 'ওরেব্বাবা! মার্সিডিস চালিয়ে আসে, এটা আবার কোন্ দল!'

'তাই নাকি?' হাসল জুলি। 'এরা হয়তো আমাদের প্রতিপক্ষ কেউ নয়। বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী, প্রফেসার, এদেরই তো খোরাক কেভো ক্যাম্প।' রানা বিনকিউলার চোখ থেকে নামাচ্ছে না দেখে অধৈর্য হয়ে উঠছে জুলি।

খানাখন্দে পড়ে ঝাঁকুনি খাচ্ছে গাড়িটা। এখনও অনেক দূরে, ছোট্ট খেলনার মত দেখাচ্ছে।

'লোকটাকে দেখতে পাচ্ছ?' বিছানার উপর উঠে বসল জুলি।

কথা বলছে না রানা।

'বিনকিউলারটা একবার দেবে?'

আরও এক মিনিট পর চোখ থেকে সেটা নামাল রানা। 'নাও,' জুলির দিকে বাড়িয়ে ধরল, 'নয়ন সার্থক করো।'

'ওমা!' বিনকিউলার চোখে তুলেই বিস্ময়ে প্রায় আঁতকে উঠল জুলি। 'আকাশ থেকে পরী...এত রূপ হয় কোন মেয়ের! রীতিমত ঈর্ষা হচ্ছে আমার। মেয়েটার পাশে...মাই গড!' দ্রুত চলতি ধারা-বিবরণী প্রচার করে যাচ্ছে সে, 'কি বিশাল

বুকের ছাতি! পুরুষ বটে একটা। কিন্তু যাই বলো, ছোকরার বয়স এক্কেবারে কম, ওর পক্ষে এই স্বর্গীয় রূপের মর্যাদা দেয়া কক্ষনো সম্ভব নয়, সামলাতেই পারবে না…'

'আরও একজন আছে,' স্মরণ করিয়ে দিল রানা, ওর প্রতি অবিচার করছ কেন?'

'ঠিক,' বলল জুলি। 'কিন্তু বলবটা কি, বলো? বয়সের দিক থেকে মেয়েটার উপযুক্ত, কিন্তু একটা হাত যে নেই। নাহ্, কানাখোঁড়ার সাথে এ মেয়েকে আমি জুটি বাঁধতে কোন মতেই দেব না, জান থাকতে নয়…' নিজের কথায় নিজেই খিলখিল করে হেসে উঠল জুলি। চোখ থেকে বিনকিউলারটা নামিয়ে ফেলল। খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে এখন পরিষ্কার। 'আসল ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছ? সামনের সীটে ওরা দু জন ছাত্র-ছাত্রী, পিছনের নুলো ভদ্রলোক ওদের প্রফেসার। দেখছ! তিনজনই তাকিয়ে আছে এদিকে।'

সামনের রাস্তা দিয়ে দ্রুত বেগে চলে যাচ্ছে মার্সিডিস। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে রানা। 'সম্ভবত এটাই একমাত্র দল,' বলল রানা, 'যাদের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই। ছাত্র-ছাত্রী? উঁহু, আমার তা মনে হয় না। বিয়ে করা বৌকে নিয়ে হানিমুনে যাচ্ছে ছোকরা। অচেনা জায়গা, তাই হয়তো গাইড বা বডিগার্ড হিসেবে নিয়ে এসেছে পিছনের লোকটাকে।'

'হতেই পারে না!' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল জুলি। 'দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এ মেয়ের বিয়ে হয়নি। আর, যার একটা হাত নেই, তাকে তুমি বডিগার্ড ভাবছ কিভাবে?'

হাসল রানা। 'এমন যার সুন্দরী বউ, দু'হাতওয়ালা স্বাস্থ্যবান বডিগার্ড কোন্ সাহসে আনতে যাবে সে, বলো?'

হাতজোড় করল জুলি। 'মাফ চাই, তর্কে তোমার সাথে আমি পারব না।'

বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মার্সিডিস। চোখ কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে আছে রানা।

রানার দিকে তাকিয়ে আছে জুলি, 'ঠাট্টা করছি না,' বলল সে। 'তোমার আসল চেহারার পাশে খুব সম্ভব মেয়েটাকে দারুণ মানাবে।'

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল রানা। উত্তেজিত দেখাচ্ছে ওকে। ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল রাস্তার দিকে। কিন্তু গাড়িটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। জুলির দিকে ফিরল ও। 'ইস্।' চোখেমুখে নৈরাশ্য ফুটিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'আগে বললে না কেন!'

পরমুহূর্তে হোঃ হোঃ করে হেসে ফেলল দু'জনেই।

জুলির হাত থেকে বিনকিউলারটা নিল রানা। চোখে তুলেই বলল, 'আরেক দল আসছে। এরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপক্ষ কেউ।'

দু'মিনিট পর সবুজ রঙের জীপ এবং আরোহী দু'জনকে পরিষ্কার দেখা গেল। রানার কাছ থেকে বিনকিউলারটা চেয়ে নিয়ে দেখছে জুলি। আলখাল্লার মত আপাদমস্তক ঢাকা সউদী অ্যারাবিয়ান পোশাক পরা দু'জন আরোহী। ড্রাইভিং সীটের পাশে বসা লোকটা মুখ ভেঙচে আছে। ভুলটা আরও একটু পর ভাঙল

জুলির। গুলি খেয়েছে বাহুতে, তাই ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখটা। ব্যান্ডেজের গায়ে রক্তের ছোপ। 'শুধু প্রতিপক্ষ নয়, জাত দুশমন,' বলল জুলি, 'গুলি খেল কিভাবে বলো তো?'

'পথে কাঁটা পুঁতে রেখে এসেছি আমরা,' বলল রানা।

'মানে?'

'জ্যাক জাস্টিস,' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা।

পরবর্তী দেড় ঘণ্টার মধ্যে একের পর এক সাতটা গাড়ি দেখা গেল সামনের রাস্তায়। তৃতীয় দলটাকে দেখে বিস্মিত হলো রানা। গন্ধ শুঁকে শুঁকে এত দূরে চলে এসেছে চীনারাও! কিন্তু মি. পপকিন আর সবার কথা বললেও, এদের কথা তো বলেনি।

'চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস!' বলল জুলি। 'আমাদেরকে দু'চোখে দেখতে পারে না। হাত দুটো নিশপিশ করছে আমার।'

'মন খারাপ কোরো না,' আশ্বাস দিয়ে বলল রানা। 'সুযোগের সন্ধানে আছি, পেলে এদের সবাইকেই এত পরিশ্রমের জন্যে উপযুক্ত পুরস্কার দেব।'

চীনাদের পর এল কানাডিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ব্রিটিশ-সুইডিশ দল, বাকি একটা দলকে চিনতে পারা গেল না। যাবার পথে সবগুলো দলই ওদেরকে দেখে গেছে, কিন্তু শেষ দলটা ছাড়া কোন দলই গাড়ি থামায়নি। অপরিচিত দলটার ল্যান্ডরোভার দাঁড়িয়ে ছিল বটে, কিন্তু স্টেন নিয়ে জুলিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে গাড়ি থেকে নামতে সাহস পায়নি কেউ। স্টার্ট নিয়ে কেটে পড়েছে তাড়াতাড়ি।

চোখে রোদ লাগছে, একটু সরে বসল জুলি। খুক্ করে কাশল একবার। 'আন্তন?'

'বলো,' চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রানা। চোখ দুটো বন্ধ।

গলার সুর শুনে মনে হলো মহা এক সমস্যায় পড়েছে জুলি। 'একটা কথা বলার ইচ্ছে ছিল তোমাকে।'

চোখ খুলে গেল রানার। ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'কি কথা?'

মুখে হাসি নেই জুলির। সিরিয়াস দেখাচ্ছে তাকে। 'খুব গোপন একটা কথা!'

'গোপন কথা?' উঠে বসল রানা। জুলির একটা হাত ধরল। 'কি গোপন কথা?'

'ভেবেছিলাম চাঁদ-টাঁদ উঠলে বলব,' নৈরাশ্যে মুখের চেহারা বিষণ্ণ করে তুলল জুলি। 'কিন্তু এমন জায়গায় এসে পড়েছি যে ডুবতেই চায় না সূর্যটা। হ্যাঁ গো, এদিকের আকাশে চাঁদ ওঠে না?'

'ওঠে। কিন্তু আজ উঠবে না। এক আকাশে দুটো চাঁদ ওঠে কখনও?'

'মানে?' রানার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল জুলির মুখের চেহারা।

দু'হাত দিয়ে জুলির মুখটা ধরল রানা। ঠোঁট নামিয়ে আলতো চুমু খেল। বলল, 'তুমি রয়েছ দেখে লজ্জায় উঠছে না আজ।'

চেঁচিয়ে উঠল জুলি, 'কি সাংঘাতিক চালু লোকরে, বাবা…

জুলির কথা চাপা পড়ে গেল। আবার নেমে এসেছে রানার ঠোঁট জোড়া, মৃদু ধস্তাধস্তি করছে জুলি। রানার হাত থেকে ছুটবার চেষ্টা করছে। মুখটা সরিয়ে নিয়ে

চাপা গলায় বলল, 'অ্যাই··· কি হচ্ছে! সব দেখে ফেলবে ডন!'

'দেখবে কি করে? বেঘোরে ঘুমাচ্ছে—আওয়াজ পাচ্ছ না মেশিনগানের?' বিছানায় গড়িয়ে পড়ল রানা বুকের সাথে চেপে ধরা জুলিকে নিয়ে। হাসল, 'আর দেখে যদি ফেলেই, বলব আন্তন ফিলাতভের ভূমিকায় অভিনয় করছিলাম।'

হেসে উঠল জুলি। তারপর মৃদু কিল দিল রানার বুকে। 'অ্যাই না ছাড়ো প্লীজ! এই খোলা মাঠে···'

ততক্ষণে নাইলনের স্কার্ট সরে গেছে শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গা থেকে, খুলে গেছে ব্রা-র হুক।

'ঘুমের ওষুধ চেয়েছিলে না?' মৃদু গলায় জানতে চাইল রানা।

'দাও!' রানার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে অস্ফুট স্বরে চাইল জুলি।

পাহাড়ের উপর থেকেই দিগন্তবিস্তৃত বিশাল উপত্যকাটা দেখতে পেল ওরা। ঢাল বেয়ে নেমে গেছে রাস্তাটা। উপত্যকার মাঝখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে রাস্তা। বামদিকে পনেরো মাইল সোজা এগিয়ে গেলে কেভো ক্যাম্প। ডানদিকের রাস্তাটা সোমপিয়োর দিকে চলে গেছে।

গাড়ি চালাচ্ছে ডন। পাশের সীটে রানা। পিছনে জুলি।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। পশ্চিম দিকে তাকাল। আর পনেরো মিনিট পর অস্ত যাবে সূর্য। চোখ ফিরিয়ে নিতে যাবে, হঠাৎ কি যেন ঝিক্ করে উঠল ডান পাশের পাহাড়ে।

'ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, আন্তন,' পিছনের সীট থেকে বলল জুলি। 'উত্তরের পাইন গাছগুলোর কাছে।'

'দেখেছি,' বলল রানা। 'আরও বাঁ দিকে তাকাও। চোখে পড়ছে কিছু?'

'তাই তো। তাঁবু।'

'হ্যাঁ। সবাই অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। চোখে বিনকিউলার এঁটে দেখছে,' বলল রানা। 'আরও উত্তরে নাকি সোমপিয়োর দিকে যাব, জানতে চায়।'

'কি করবেন বলে ঠিক করেছেন?' জিজ্ঞেস করল ডন।

'ম্যাক এখানেই কোথাও আছে,' বলল রানা। 'দুঃসংবাদটা জানানো দরকার তাকে। তাছাড়া, আমার ওপর মি. পপকিনের নির্দেশ আছে, এই কেভো ক্যাম্পেই নকশা বের করে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু করতে হবে।'

উপত্যকায় নেমে এসেছে জীপ। সমতল রাস্তা। স্পীড বাড়িয়ে দিল ডন।

'দু'মিনিট এগিয়ে থামো,' বলল রানা। চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল। 'ম্যাকের টু-সীটের ফিয়াট দেখতে পেয়েছি আমি।' বরফের মুকুট পরা পাহাড়টার দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'ওটার একশো ফুট ওপরে।'

'ঠিক দেখেছ? গাড়ি নিয়ে চড়ল কিভাবে?' জানতে চাইল জুলি।

'গবেষকদের কথা ভেবে নিশ্চয়ই পাহাড়ে চড়ার রাস্তা তৈরি করা আছে,' বলল ডন।

লেকের পাশে পাইন গাছের ভিড়ে জীপ থামল ওদের। রাস্তার বাঁকটার কাছ

থেকে খুব বেশি দূরে নয়। তিনজনই ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। দ্রুত খাটানো হলো তাঁবু। হালকা কিছু নাস্তা তৈরি করল জুলি। তিন মিনিট পর টুপ করে ডুবে গেল দিগন্তরেখার অপরদিকে প্রকাণ্ড সূর্যটা। 'ঠিক দু'ঘণ্টা পর ছয়টার সময় আবার উদয় হবে,' বলল ডন। শুয়ে আছে সে। তাঁবুর খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে।

রাইফেলটা তুলে নিল জুলি। 'তোমরা ঘুমাও, আমি...'

'গার্ড দেবার কোন দরকার নেই,' নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে হাসল রানা। 'আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কি তা না জেনে কেউ চড়াও হবে না। দিব্যি ঘুমানো যেতে পারে সকাল আটটা পর্যন্ত।'

'শুনেছি কেভোয় পাহাড়ী নেকড়ে আছে...'

হাসল রানা। 'আছেই তো। কিন্তু ধারে কাছে ঘেঁষতেই পারবে না। তাড়াবার জন্যে সব ক'টা দল জেগে পাহারা দিচ্ছে। ডক্টর ফিলাতভের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে দেবে না ওরা।'

রাইফেল রেখে দিল জুলি। শেষ প্রান্তে নিজের বিছানায় গিয়ে বসল। 'ডন, ঘুমালে নাকি?' ভিতরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে।

জেগেই আছে ডন। কিন্তু ঘুমের ভান করে থাকল। কথা বলার প্রবৃত্তি নেই তার। তাকিয়ে আছে বাইরে। সূর্য ডুবে গেছে কিন্তু ঠিক যাকে অন্ধকার বলে তার কোন নাম নিশানা নেই এখনও কোথাও। গাঢ় ছায়া ঢেকে রেখেছে চারদিক। ক্রমশ আরও গভীরতর হচ্ছে।

ভিতরটা কেঁপে গেছে ডনের। রানাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তার। তার আশঙ্কাই যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। যত দেরি করা হবে ততই লোকটাকে খুন করা কঠিন হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে ওর প্রতিটি কাজে যে আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে, রীতিমত ভয়ই করছে তার। ছয় জনের ছোট একটা দলের ঘাড়ে এমন দুর্ধর্ষ আর বুদ্ধিমান লোককে খুন করার দায়িত্ব দেয়া উচিত হয়নি মি. পপকিনের। ছয় জনের মধ্যে দু'জন এরই মধ্যে খসে গেছে। টিটো, জুনেস্কি আশপাশেই আছে, রানার মুখে গত রাতের বর্ণনা শুনে বুঝে নিয়েছে সে। খবরটা পেয়ে স্বস্তি অনুভব করছে, একটু বেড়েছে আত্মবিশ্বাস। নিজেকে অতটা একা একা লাগছে না এখন আর। কিন্তু ভরসা পাচ্ছে না। কাছাকাছি ম্যাকও রয়েছে, জুলির অবশ্য থাকা না থাকা সমান। কিন্তু ওরা চারজনই বা কি করতে পারবে? তিন দিন পূর্ণ হয়নি এখনও, সুতরাং হাত পা বাঁধা ওদের। কখন পরিবেশ আসবে, যদি আসে তবে...এর কোন মানে হয়?

তবু, শেষ পর্যন্ত একটা সময় আসবে, যখন আর পরিবেশের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না। এখন সাড়ে চারটে। আগামীকাল ঠিক এই সময়, ভোর সাড়ে চারটের সময় পূর্ণ হবে মি. পপকিনের দেয়া তিনটে দিন। তখন আর কোন বাধাই থাকবে না। কিন্তু, দুরু দুরু করছে বুকটা তার এই ভেবে যে, তার আগে কি না কি ঘটিয়ে বসে রানা। ওর সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই বলা যায় না। নিজের পরিচয়, আমাদের সাথে শত্রুতার সম্পর্ক, হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র—এসব ব্যাপারে কিছুই ও

জানে না, যা কিছু করছে আমাদের সাহায্য করার জন্যেই, এতেই ওকে সামলানো অসম্ভব মনে হচ্ছে, সব জানলে না জানি কি হত! শিউরে উঠল ডন। লোকটার কাছাকাছি এলেই গা ছমছম করে। কিন্তু উপায় নেই, আরও চব্বিশটা ঘণ্টা কাটাতে হবে তাকে এই জলজ্যান্ত আতঙ্কটার সাথে।

রোদ ঝলমলে সকাল। দূর-পাহাড়ের সারির মাথায় বরফের ঝুঁটি সোনালী রোদ লেগে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা বিকিরণ করছে। বরফছোঁয়া বাতাসে হিমেল আমেজ। রোদ পোহাচ্ছে রানা আর ডন। তাঁবুর সামনে বসে কফি খাচ্ছে ওরা। সাথে সারাক্ষণ অস্ত্র রাখার দরকার নেই হালকা ভাবে দু'একবার কথাটা বলেছে রানা, কিন্তু কান দেয়নি ডন। তার পাশেই পড়ে আছে একটা রাইফেল। শোল্ডার হোলস্টারে লোডেড রিভলভারটা তো আছেই।

দু'হাতে মুখের সামনে তুলে ধরা একটা বই পড়ছে রানা। আর কোনদিকে খেয়াল নেই।

দ্রুত নানান কথা ভাবছে ডন। জুনেস্কি শালা চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে নাকি? এখন যদি সে গুলি করে মেরে ফেলে রানাকে, ক্ষতিটা কোথায়? সেইরকম নির্দেশই তো দিয়েছেন মি. পপকিন। পরে যদি ব্যাখ্যা দিতেই হয়, বললেই হবে যে গার্ডকে গুলি করে আহত করতে চেয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশত গুলি লেগেছে ডক্টর ফিলাতভের মাথায়। এই সহজ ব্যাপারটা মগজে ঢুকছে না জুনেস্কির? কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে সে? উপত্যকার যেখানেই সে থাকুক, তাঁবুর বাইরে খোলা জায়গায় বসে আছে রানা। এর চেয়ে ভাল টার্গেট আর কি হতে পারে!…নাকি সাহস পাচ্ছে না? স্টকটন এবং ফেজকে দেখতে না পেয়ে দ্বিধা ঢুকে গেছে মনে? ঘাবড়ে গেছে?

হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল ডনের শরীরে। গুলির আওয়াজ। রাইফেলটা তুলে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। রানার দিকে তাকাল। বইটা পাশে নামিয়ে রাখছে রানা।

'গুলির শব্দ হলো, না?'

'হ্যাঁ,' উত্তেজিত ভাবে বলল ডন। 'ঘাবড়াবার কিছু নেই, ডক্টর ফিলাতভ। এদিকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়নি গুলিটা।'

'তা হবেও না, জানি,' বলল রানা। 'কিন্তু কে কাকে গুলি করল আঁচ করতে পারছ কিছু?'

উপত্যকার চারদিকে তাকাল ডন। দূরে দূরে দুটো তাঁবুর মাথা, একটা গাড়ির নাক, আরও দূরে একটু ধোঁয়ার রেশ ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এতটুকু চাঞ্চল্য নেই চারদিকের কোথাও। গুলির শব্দটা যেন কানের ভুল। গোটা উপত্যকাটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

'ভুল করে কারও ট্রিগারে চাপ পড়ে গিয়েছিল সম্ভবত…'

বইটা তুলে নিয়ে পড়ায় মন দিল আবার রানা। 'তাই হবে,' অন্যমনস্ক ভাবে বলল ও।

দাঁড়িয়েই আছে ডন। চোখেমুখে আশার উজ্জ্বল আলো। ধরেই নিয়েছে সে

জুনেস্কিরা গুলি করছে। কিন্তু বুলেটটা এদিকে আসেনি। প্রথম গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই পারে। দ্বিতীয় গুলিটার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। এক দুই করে সেকেন্ডগুলো বয়ে যাচ্ছে। এক মিনিট কাটল। এত দেরি করছে কেন? ধীরে ধীরে নিরাশায় ছেয়ে গেল মনটা। দু'মিনিট পর মুখ কালো করে বসে পড়ল সে।

দশ মিনিট পর কাছের পাহাড় থেকে নেমে এল জুলি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে লেকে সাঁতার কেটেছে কিছুক্ষণ সে। টাইটফিটিং জিন্সের নীল ট্রাউজারের সাথে মেরুন রঙের ফুলহাতা শার্ট পরে, পায়ে ফিল্ড বুট গলিয়ে ঘণ্টাখানেক আগে পাহাড়ে চড়তে গিয়েছিল। কাছে এসে বিছানার কিনারায় বসল সে। গলায় ঝুলানো বিনকিউলারটা নামিয়ে রাখল পাশে।

মুখ তুলে তাকাল রানা। 'হাসছ কেন?'

'ডক্টর ফিলাতভের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে দেবে না ওরা,' বলল জুলি, 'তোমার এই কথাটা হানড্রেড পার্সেন্ট ঠিক।'

'কি রকম?' দ্রুত জানতে চাইল ডন।

'আমাদের অ্যারাবিয়ান প্রতিপক্ষ সম্ভবত টেলিস্কোপটা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে বা স্রেফ খেয়ালবশত আমাদের তাঁবুর দিকে রাইফেল তুলেছিল। ব্যস আর যায় কোথায়? বিনকিউলার চোখে ছিল আমার, চারদিকে তাকিয়ে দেখি সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার! একজন তো আরবটার দিকে লক্ষ্য করে গুলিই করে বসল।'

'লেগেছে?' ব্যগ্রতার সাথে জানতে চাইল ডন।

'গায়ে মারলে হয়তো লাগত, কিন্তু গায়ে মারেনি। রাইফেলটা ছিটকে পড়ে যেতে দেখেছি। মাথা নিচু করে নিয়ে দু'জনেই দৌড়ে পালাল তাঁবুর ভিতর। তারপর, ওমা, চারদিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় সব ক'টা দল থেকেই একাধিক লোক আরবদের দিকে রাইফেল তাক করে রেখেছে।'

'ঠিক আছে,' একটু বিরক্তির সাথে বলল রানা। 'এসব গল্প পরে শুনলেও চলবে। ম্যাকের সাথে কি কথা হলো বলো।'

'দুঃসংবাদটা পেয়ে দুই মিনিট পাথর হয়ে ছিল সে,' বলল জুলি। 'আমার মেসেজ বোধহয় বিশ্বাসই করতে পারছিল না। বলল, ডনের সাথে কথা বলতে চায়।'

'তুমি কি বললে?'

'তুমি যা বলতে বলেছ। বললাম, আন্তন বা ডন মুখের সামনে আয়না তুললে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে, এবং তুমি তা হতে দিতে চাও না। তোমার ওপর ওকে খুব অসন্তুষ্ট মনে হলো। জ্যাক জাস্টিসের কাছ থেকে গাড়ি হাইজ্যাক করার চেষ্টা না করলে স্টকটন এবং ফেজকে হারাতে হত না, এ-কথা বলে ঘটনাটার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী করতে চেয়েছিল সে তোমাকে।'

'হুঁ,' বলল রানা, 'কিন্তু স্টকটন যদি আমার নির্দেশ মানত তাহলে তাকে ওভাবে মরতে হত না, মরতে হত না ফেজকেও, একথা তাকে বলোনি?'

'বলিনি আবার!' জুলি বলল। 'শেষ পর্যন্ত অবশ্য স্বীকার করেছে কথাটা।'

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। উঠে দাঁড়াল। 'ডন, থাকো। জুলিকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। মাপজোক শুরু করা দরকার এবার।'

তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল ওরা। খাপ থেকে থিয়োডোলাইট বের করল রানা। হালকা তেপায়াটা তুলে নিল জুলি। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল উঠে দাঁড়িয়েছে ডন, চোখে বিনকিউলার, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

'এত নার্ভাস ফিল করার কিছু নেই,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'শান্ত হয়ে বসে থাকো। বলেছি তো, কেউ আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না।'

কেন যেন থতমত খেয়ে গিয়ে দ্রুত বসে পড়ল ডন। সে নার্ভাস ফিল করছে, জানল কিভাবে লোকটা? ভাবছে সে। চলে যাচ্ছে ওরা লেকের পাশে কাছের পাহাড়টার দিকে। রানার মাথার পিছনে চোখ রেখে বসে আছে সে। হাতটা ঘামছে, নিশপিশ করছে—রাইফেলটা তুলে নিয়ে…না! হঠাৎ খেয়াল হলো তার, চারদিক থেকে কয়েক জোড়া সর্তক দৃষ্টি লক্ষ্য রাখছে রানার উপর। ওর দিকে রাইফেল তোলার ফল কি, জুলির কথা শুনে তা জানতে বাকি নেই। প্রতিপক্ষরা ডক্টর ফিলাতভের নিরাপত্তার কথা ভেবে এবার হয়তো রাইফেল নয়, সরাসরি মাথা লক্ষ্য করে গুলি করবে।

বিদ্যুৎচমকের মত দুর্বুদ্ধিটা চেপেছিল মাথায়, ধীরে ধীরে সেটার প্রভাব থেকে মুক্ত হলো ডন। ভাবছে, পরিস্থিতি দ্রুত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সকাল দশটা এখন। আঠারো ঘণ্টা বাকি আর। কিন্তু আঠারো ঘণ্টা পরই বা লোকটাকে তারা মারবে কিভাবে?

সমস্যার প্রকৃত চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ডন। রানা এখন একা নয়। ওর পক্ষে আট দশটা দলের পঁচিশ-ত্রিশজন সশস্ত্র লোক রয়েছে, যে-কোন মূল্যে রানাকে তারা রক্ষা করার চেষ্টা করবে। দিনের বেলায় ওদের চোখে ধুলো দিয়ে কাজটা করা এককথায় অসম্ভব। তাহলে উপায়?

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ডনের। চোখে অন্ধকার দেখছে সে। তার একার বুদ্ধিতে কুলাচ্ছে না। জুনেস্কির সাথে পরামর্শ করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সে সুযোগই বা কোথায়? পরমুহূর্তে ভাবল, পরামর্শ করেই বা কি লাভ? পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, মি. পপকিনকে ডেকে আনলেও এখন এর কোন সুরাহা হবে না। অনুভব করছে, খোদ হেডকোয়ার্টারের সাহায্য দরকার এই মুহূর্তে।

কিন্তু সেই সাথে এও উপলব্ধি করল, আকাশকুসুম কল্পনা করছে সে। চাইলেও এখন বাইরে থেকে কোন সাহায্য পাবার উপায় নেই। অথচ গোটা ব্যাপারটা কেঁচে যেতে বসেছে। রানাকে খুন করার মতলবটা দ্রুত বুমেরাঙে পরিণত হচ্ছে…।

পাহাড়ের উপর চড়েছে ওরা। হাঁটু সমান উঁচু একটা পাঁচিলের সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল রানা। থিয়োডোলাইটটা বসাল শক্ত করে। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে কাগজের একটা টুকরো বের করল। সামনের দৃশ্যটা পরখ করার আগে ভাঁজ খুলে কাগজটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে। এটার সাথে আরও তিনটে নকশা দিয়েছে ওকে কার্ল পপকিন। উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে বল পয়েন্ট ছিল না, তাই বিশেষজ্ঞের সাহায্যে চওড়া নিবের কলম দিয়ে নকশাগুলো তৈরি করিয়েছে পপকিন। সাথে

একটাই নকশা রেখেছে রানা, বাকি তিনটে লুকানো আছে তাঁবুর তিন জায়গায়।

আনকোরা নতুন কাগজের উপর আঁকা হলেও, কৃত্রিম উপায়ে ভাঁজ খাইয়ে পুরানো করা হয়েছে জিনিসটাকে। নকশার মাথার উপর একটা মাত্র শব্দ: Luonnonpuisto. নিচে একটা বিন্দু থেকে ঘড়ির কাঁটার মত তিনটে রেখা বেরিয়েছে, প্রতিটি কোণের মাপ ডিগ্রীর হিসেবে লেখা হয়েছে সতর্কভাবে। প্রত্যেক রেখার শেষ মাথায় একটি করে শব্দ লেখা: jarvi, kukkula এবং Aukio—অর্থাৎ লেক, পাহাড় এবং ফাঁক।

মুখ তুলে চারদিকে তাকাল রানা। নিচে চিকন রেখার মত ছোট একটা নালা, এটাই বছরের নির্দিষ্ট একটা সময়ে বরফ গলা পানি পেয়ে খরস্রোতা নদী হয়ে ওঠে। নাম, কেভোজোকি। বহু দূরে উপত্যকার একপাশে নীল পানিতে টইটুম্বুর একটা লেক। কোমর বাঁকা করে নিচু হলো রানা। থিয়োডোলাইটের মাধ্যমে লেকের একটা প্রান্তের দিকে তাকাল।

একটু পর মাথা তুলে ইলেজের রীডিং চেক করল। তারপর আবার মাথা নিচু করে উপত্যকার দূরতম পাহাড়টা দেখল। আরেকটা রীডিং চেক করছে এখন।

পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে লেক আর পাহাড়ের কৌণিক দূরত্ব স্থির করল হিসেব কষে। দিগন্তরেখার উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে সম্ভাব্য ফাঁক আবিষ্কারের চেষ্টা করছে।

গুন গুন করে সুর ভাঁজছে জুলি। রানাকে বিরক্ত করা হবে না ভেবে একটু দূরে সরে গেছে সে। কিনারায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে নিচেটা দেখছে, কখনও বিনকিউলার চোখে তুলে দূরে তাকাচ্ছে। কোথাও কোনরকম ব্যস্ততা বা চাঞ্চল্যের নমুনা দেখতে পাচ্ছে না সে। আরবদের ক্যাম্পটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। রানার দিকে নজর রেখেছে কিন্তু দু'জনের হাতই খালি, রাইফেল নেই। ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়, ভাবল সে।

আর সব দলও তাই করছে। রানার প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য করছে তারা। এবং সেই সাথে, পরস্পরের আচরণের উপরও রেখেছে তীক্ষ্ণ নজর। কার মনে কি আছে, কেউই জানে না ভাল করে। বিশেষ করে আরবদের সম্পর্কে তারা ভীষণ সন্দিহান। পরিষ্কার বুঝতে পারছে জুলি, ডক্টর ফিলাতভের নিরাপত্তার ব্যাপারে সব ক'টা দল সাংঘাতিক সতর্ক হয়ে আছে।

এ-কারণেই পরিবেশে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে, ভাবল জুলি। যে-কোন মুহূর্তে তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লেই সব ক'টা দল অ্যাকশন শুরু করে দেবে। ছোট্ট একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলেও তুমুল যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সবাই সন্দেহ করছে সবাইকে।

পুব-পাহাড় ঘেঁষে পাইনগাছের দাঁড়ানো সারির উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে জুলি। একটা তাঁবু দেখা যাচ্ছে। ল্যান্ডরোভারটা পিছনে। ওটা ব্রিটিশ-সুইডিশদের যৌথ দলের ক্যাম্প। কেউ নেই তাঁবুর বাইরে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে, এমন সময় বেরিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল এক দীর্ঘকায় লোক। দেখামাত্র বিস্ময়ে প্রায়

আঁতকে উঠল জুলি।

ঝাড়া সাড়ে ছয় ফুট লম্বা লোকটা। ব্যাকব্রাশ করা একমাথা সোনালী চুল। শরীরের কোথাও বাড়তি মেদ নেই। চোয়াল দুটো চওড়া। কপাল থেকে নেমে এসেছে ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া পাঁচিলের মত নাকটা। একবার তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না, এমন একটা আভিজাত্য আছে লোকটার চেহারায়। ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। বহুদূরে চলে গেছে ধারাল চোখের দৃষ্টি। কিছু দেখছে কিনা বলা মুশকিল। বোধহয়, গভীর ভাবে কিছু ভাবছে। বিশ-বাইশ বছরের একটা চটপটে মেয়ে ত্রস্ত পায়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল। ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সসম্ভ্রমে কিছু বলছে সে। লোকটার ঠোঁট দুটো নড়ল শুধু। দ্রুত আবার তাঁবুর ভিতর ফিরে গেল মেয়েটা।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল জুলি। কপালে চিন্তার রেখা। দেখল, যন্ত্রপাতি তুলে নিচ্ছে রানা। কাছে গিয়ে বলল, 'আসুন, এইমাত্র একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম।'

মুখ ফেরাল রানা। হাসল। 'আচ্ছা!'

'ঠাট্টা নয়,' জুলি হাসল না। 'ব্রিটিশরা কাকে পাঠিয়েছে জানো?'

'কাকে?'

'লেমন।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'কে সে?'

'হায়-হায়, লেমনের কথা তোমার তো মনেই নেই,' উত্তেজিতভাবে বলল জুলি। 'লেমন, লেমন! জ্যাক লেমন, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সেকেন্ড ম্যান!'

'তাই নাকি?' তেমন অবাক হলো না রানা, বলল, 'চলো, দেখি।' আগের জায়গায় ফিরে এল জুলি। ইঙ্গিতে দেখাল পাইন গাছগুলো। চোখে বিনকিউলার তুলল রানা। 'হুঁ,' লেমনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল ও। 'তা অদ্ভুত ভাবছ কেন? গুরুত্ব বুঝে ঠিক লোককেই পাঠিয়েছে ওরা। নিকোলাই ফিলাতভ যা আবিষ্কার করেছেন, তাকে তুমি কি মনে করো? ফর্মুলাটা পাবার জন্যে ইসরায়েলের এই সব বন্ধু প্রয়োজনে ম্যাসাকার করবে, জুলি। যুদ্ধ-বিজ্ঞানে গত দুই শতাব্দী ধরে যত কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে, সবগুলোকে ম্লান করে দেবে এই এক্স-রে-র প্রতিফলন।'

'এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না…'

'মি. পপকিন তোমাকে সব কথা জানাবার প্রয়োজন বোধ করেননি,' বলল রানা। 'সে যাক। এখানকার কাজ শেষ করেছি। মাইল দশেক উত্তরে যেতে চাই আরও। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ি এসো।'

উত্তরে এসে মাপজোক শেষ করে ডনকে কাজে লাগাল রানা। কয়েক গজ দূরে দূরে তিনটে জায়গা দেখিয়ে তাকে বলল, 'কোদাল দিয়ে মাটি কেটে খিদেটা বাড়িয়ে নাও। এক বর্গগজ এলাকা নিয়ে দুই হাত গভীর হওয়া চাই প্রতিটা গর্ত।' জুলির বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে কফির কাপ-পিরিচ নিল ও। চুমুক দিল ধূমায়িত কাপে। রিস্টওয়াচ দেখল। বেলা বারোটা।

'সবাই এসেছে পিছু পিছু,' বলল জুলি। 'কেউ কেউ তাঁবু রেখে শুধু গাড়ি নিয়ে এসেছে। পরিবেশটা খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে, আন্তন।'

'নতুন করে এ-কথা বলছ কেন?'

'প্রতিটি দল বেপরোয়া হয়ে উঠছে। আগে নিজেদের লুকিয়ে রাখার জন্যে চেষ্টা করছিল, এখন প্রায় প্রকাশ্যেই নজর রাখছে আমাদের ওপর।'

'দূর থেকে হলেও নকশাটা দেখতে পেয়েছে কিনা। যাই হোক, ঘাবড়াবার কিছু নেই। যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে আমরাও তৈরি।' উঠে দাঁড়াল রানা।

গায়ের শার্ট খুলে রেখে কোদালের কোপ মেরে চলেছে ডন শক্ত মাটিতে। ধীর ভঙ্গিতে মাথার উপর তুলছে কোদাল, বিদ্যুৎবেগে সেটা নামিয়ে এনে কোপ মারার আগের মুহূর্তে হোৎ করে আওয়াজটা ছাড়ছে মুখ দিয়ে। শক্ত মাটি, তাই সুবিধে করতে পারছে না। ধীর গতিতে এগোচ্ছে কাজ। সেদিকে অবশ্য মনোযোগ নেই রানার। ডনের পেশীবহুল বিশাল শরীরটা টেনে রেখেছে ওর দৃষ্টি। ভাবছে, অসুরের শক্তি রাখে এই লোক। জুলি ওকে লক্ষ করছে, অনুভব করল রানা। একটু গর্বের সাথে হাসল ও। 'ডন একাই একশো, তাই না?'

'একটু আগে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলছিল,' বলল জুলি, 'ওর নাকি ভীষণ ভয় করছে।'

'ঠাট্টা করছিল তোমার সাথে।'

'গেলাম,' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে তাঁবুর দিকে হাঁটা ধরল জুলি। 'খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করিগে।'

কফি শেষ করে পাইপ ধরাল রানা। জঙ্গলের মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি রয়েছে। একা একা সেই নিরিবিলি পরিবেশে হারিয়ে যেতে কি ভালই না লাগে ওর। ভুরু কুঁচকে ডনের দিকে তাকাল ও। মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ছে, কোদালের কোপ খেয়ে কেঁপে উঠছে মাটি।

ঘাসের বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল রানা। চারদিকটা দেখে নিল একবার। তারপর ঘাসের উপর দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগোল সামনের দিকে।

পায়ে চলা সরু পথটা ধরে বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছে রানা। ডনের মাটি কাটার শব্দ নেই এখানে। কিচিরমিচির করছে পাখিরা। ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালার ফাঁকে ছোট্ট একটা লেকের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। টলমল করছে নীল ' 'নি। সেদিকে যাবার উপায় খুঁজছে রানা, এমন সময় চোখের কোণে রঙিন কি যে ধরা পড়ল। স্যাত করে পথ থেকে সরে একটা ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিল ও।

আওয়াজ আসছে। দু'জন লোকের চাপা গলা। একটা কণ্ঠস্বর চেনা চেনা। উঁকি দিল রানা। জ্যাক জাস্টিস! এ ব্যাটা আবার জুটেছে এসে! সাথের লোকটাকে দেখে আরও অবাক হলো রানা। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সেকেন্ড ম্যান। ওদের কথায় মনোযোগ দিল ও। ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল ওর। রাস্তা ধরে রানার তিনহাত সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। মুচকি একটু হাসল রানা। ভাবল, 'হাউ!' করে ভয় দেখালে কেমন হয়।

পাঁচ

রাত ন'টা।

সকালে যেখান থেকে রওনা হয়েছিল ওরা, ঠিক সেখানে এসে থামল ওদের জীপ। উপত্যকার মাঝখানে বাঁক নিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে সোমপিয়োর দিকে, বাঁকটার কাছাকাছি আবারও ওদের তাঁবু ফেলা হবে। লাফ দিয়ে নিচে নামল জুলি। গাড়ির পিছন দিকে তাকাল সে। বিশাল এক সমতল এলাকার উপর তিনটে গাড়ি দেখা যাচ্ছে। চীনাদের মাইক্রোবাসটা সর্ব দক্ষিণে। মাঝখানে দুশো গজ ব্যবধান রেখে ব্রিটিশ-সুইডিশদের জীপ। বাঁয়ে আরও একটা জীপ, দলের পরিচয় জানা নেই। হাততালি দিয়ে উঠল জুলি। 'একেই বলে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো। সবাই ফিরে আসছে আবার।'

কটমট করে জুলির দিকে তাকাল ডন। সারাটা দিন গাধার খাটুনি গেছে আজ তার। কম করে হলেও তিন চার টন মাটি কাটতে হয়েছে। শরীরের অবস্থা এমনিতেই কাহিল। তার উপর, ভয় এবং দুশ্চিন্তায় পাগল হতে যা বাকি আছে। কোন খবর নেই ম্যাকের, জুনেস্কিদেরও কোন সাড়া-শব্দ নেই। প্রতিপক্ষরাই এখন সবচেয়ে উৎকট বাধা। তারা পিছু ছাড়েনি দেখে জুলি হাততালি দিয়ে ওঠায় সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেল ডনের। কড়া ধমকের সুরে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে রাখল সে। মাথা গরম করা উচিত নয় এখন। যে-কোন মুহূর্তে গোলযোগ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা, প্রথম সুযোগেই সারতে হবে কাজটা। ধৈর্য ধরে, শান্তভাবে সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে তাকে।

ড্রাইভিং সীট থেকে নামল রানা। 'দাঁড়িয়ে থেকো না, ডন। হাত লাগাও কাজে। তাঁবু গাড়ো তাড়াতাড়ি। খেয়ে-দেয়ে ঘুমাতে হবে না?'

মুখ তুলে তাকাতে গিয়েও তাকাল না ডন। এই সাংঘাতিক ব্যারামটা তাকে আজ সকাল থেকে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে, চোখ তুলে তাকাতে পারছে না রানার চোখে। তাকালেই গা ছম-ছম করছে তার। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, তার মনের সব কথা গড় গড় করে পড়ে ফেলছে রানার চোখ দুটো। সারাটা দিন রানার চোখ দুটোকে এড়াবার জন্যে নিজের সাথে সংগ্রাম করতে হয়েছে তার। আকস্মিক ভাবে দু'একবার চোখাচোখি যে হয়নি তা নয়। প্রতিবারই দ্রুত দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে সে। আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেছে শরীরের শিরায় শিরায়।

মাথা নিচু করে ঘুরে দাঁড়াল ডন। গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল।

'জুলি...' গাড়ির পিছন দিকে তাকিয়ে আছে জুলি, সেই হাসিটা নেই মুখে, দেখেই থেমে গেল রানা। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে জুলির দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল।

আর লুকোচুরি নয়, খোলা জায়গায় থামছে প্রতিপক্ষরা। সবচেয়ে কাছে থেমেছে চীনারা। পঞ্চাশ গজ দূরে। তাদের ডান এবং বাঁয়ে যথাক্রমে ব্রিটিশ-সুইডিশ

এবং এখন চিনতে পারছে রানা, অ্যারাবিয়ান দল—খুব বেশি হলে সত্তর পঁচাত্তর গজ দূরে তারা। লোকজন নামছে, ক্যাম্প তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে।

দূরে চলে গেল রানার দৃষ্টি। আরও ক'টা দল আসছে। ওরাও আড়ালে আবডালে তাঁবু গাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। 'আতঙ্কিত হবার কিছু নেই,' মৃদু গলায় বলল ও। 'ভয় পেয়েছি বুঝতে পারলে সাহস বেড়ে যাবে ওদের। চেপে ধরতে আসবে। হয়েছে, হাত লাগাও কাজে। ভীষণ ঘুম পেয়েছে আমার।'

হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে ডনের। রানার কথা শুনে আরেকটা বিস্ময়ের ধাক্কা খেল সে বলে কি লোকটা! আট-দশটা সশস্ত্র বিরুদ্ধ পক্ষ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে, কখন আক্রমণ করে বসে তার নেই ঠিক, আর এই লোক বলছে কিনা ঘুমাবে!

আধঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতিটা আরও গুরুতর এবং বিপজ্জনক হয়ে উঠল। ওদের চারদিকে প্রতিপক্ষের তাঁবু পড়েছে, কোনটাই একশো গজের বেশি দূরে নয়। প্রতিটি ক্যাম্পের সামনে ব্যারিকেড তৈরি করাও হয়ে গেছে। গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে সবাই। শুধু মানুষের মাথা আর আগ্নেয়াস্ত্রের চকচকে কালো ব্যারেলগুলো দেখা যাচ্ছে ব্যারিকেডের উপরে। কোনটা রানাদের তাঁবুর দিকে তাক করে ধরা, কোনটা আর কোন দলের দিকে।

অথচ কোথাও কোন শব্দ নেই। গোটা উপত্যকা জুড়ে বিরাজ করছে অটুট নিস্তব্ধতা। থমথম করছে পরিবেশ।

এরই মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে, দিব্যি শুয়ে পড়ল রানা নিজের বিছানায়। এবং নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েও পড়ল। ওকে ঘুমাতে দেখে সাংঘাতিক খুশি হবার কথা ডনের। এখন যদি গুলি করে সে, রানা তাকে বাধা দিতে যাচ্ছে না। কিন্তু, সম্ভাবনাটা ডনের মাথায় পাঁচ সেকেন্ডের বেশি পাত্তাই পেল না। গুলি করার এটা একটা মোক্ষম সুযোগ বটে, ভাবল সে, কিন্তু সেই সাথে প্রতিপক্ষদের হাতে নিজের প্রাণটাও দান করতে হবে। ডক্টর ফিলাতভকে খুন করলে এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন আশাই নেই। খুশি তো হলোই না, বরং ভয়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল তার। যে লোক এইরকম বিপদের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারে, তাকে খুন করা কেন যেন একেবারেই অসম্ভব। বারবার এই কথাই শুধু মনে হচ্ছে তার।

'ডন?' তাঁবুর দরজার কাছ থেকে ডাকল জুলি। রানার এভাবে ঘুমিয়ে পড়াটা তারও বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে।

'বলো,' বেসুরো গলায় উত্তর দিল ডন।

'আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে,' আশঙ্কায় কেঁপে গেল একটু জুলির গলার স্বর।

কান খাড়া হয়ে উঠল ডনের। 'কিসের সন্দেহ?'

'এতক্ষণ ধরে ভাবছি,' ঘন ঘন ঢোক গিলছে জুলি। উঠে বসল বিছানার উপর। 'মনে পড়ছিল না। এখন আমি পরিষ্কার মনে করতে পারছি।'

জুলির ভয় ভয় ভাবটা সংক্রমিত হয়েছে ডনের মধ্যে। উত্তেজনা বোধ করছে সে। 'কি মনে করতে পারছ?' অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সে। 'খুলে বলো।'

'সারাদিনে অন্তত দু'বার তাঁবু খালি রেখে বাইরে ছিলাম আমরা সবাই,'

ফিসফিস করে বলল জুলি। 'আন্তন এভাবে ঘুমাচ্ছে দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে কেউ বিষ মিশিয়ে...

বিদ্যুৎচমকের মত দ্রুত একটা সম্ভাবনার কথা কল্পনা করল ডন। জুলির কথা সত্যি হতেও পারে। জুনেস্কিরা বা ম্যাক হয়তো...কিন্তু, পরমুহূর্তে নৈরাশ্যে ছেয়ে গেল তার মন। বলল, 'দূর! খাবারে কেউ বিষ মেশালে আমরা এখনও জেগে আছি কিভাবে!'

'বোকা কোথাকার!' চাপা রাগের সাথে বলল জুলি, 'ডক্টর ফিলাতভ ছাড়া এখানে আমরা কেউ মদ খাই না, এই তথ্য জানা এমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়।'

'তাই তো।' বিদ্যুৎ খেলে গেল ডনের শরীরে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'তাহলে তো দেখা দরকার।'

'দরকার নেই। শুয়ে পড়ো এখন। ঘুমাবার চেষ্টা করো। ভোর বেলা উঠে আবার সারাদিন মাটি কাটতে হবে তোমাকে।' মৃদু গলায় কথাগুলো বলে পাশ ফিরে শুলো রানা।

ঝাড়া এক মিনিট নড়তে পারল না ডন। এক সময় কথা বলতে চেষ্টা করল সে, 'আ-আপনি...'

'মর জ্বালা!' চরম বিরক্তির সুরে বলল রানা। 'নিজেও ঘুমাবে না, আমাকেও ঘুমাতে দেবে না?'

এরপর আর কথা বলেনি ডন। নিঃশব্দে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুমায়নি। শক্ত কাঠ হয়ে পড়ে আছে বিছানায়।

ভোর চারটে ষোলো মিনিটের মাথায় সোনালী চাদর গুটিয়ে নিয়ে পশ্চিম দিগন্তরেখার উপর থেকে টুপ্ করে ডুবে গেল সূর্য। ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল পাহাড়, প্রান্তর, বনভূমি। সাথে সাথে দিনের উজ্জ্বলতায় বিশেষ তারতম্য না ঘটলেও, ছায়া ক্রমশ গাঢ় হতে থাকল, কালিমার পরিমাণ তাতে দ্রুত বাড়ছে। আধ ঘণ্টা পর মুক্ত আকাশে কয়েকটা তারা ফুটল। নিঃশব্দ পায়ে চুপি চুপি হাজির হয়েছে সুমেরু বৃত্তের রাত।

ঠিক হলো সূর্য ওঠার সাথে সাথে রওনা হবে আবার ওরা। গন্তব্য সোমপিয়োর নেচার প্রিজার্ভ পার্ক। শীত শীত করছে রানার। আরেক কাপ কফি খেতে ইচ্ছে করছে ওর, জুলি যদি দয়া করে...রানার বক্তব্য শেষ হবার আগেই জুলি বলল, 'থাক, থাক। তেল মালিশের দরকার নেই, দিচ্ছি করে।'

প্রাণ খুলে ধন্যবাদ জানাল জুলিকে রানা। 'বুড়ো মানুষের এই যে অক্লান্ত সেবা করছ এর জন্যে তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি...তুমি যেন এক স্কোয়াড্রন সুপারসোনিক জঙ্গী বিমানের জন্ম দাও...'

মারমুখো ভঙ্গিতে দুই কোমরে হাত রাখল জুলি, 'কি বললে?'

'ভুল হয়ে গেছে,' দাঁতে জিভ কাটল রানা। 'বলতে চাইছি, জঙ্গী বিমানের পাইলটের জন্ম দাও।'

হাঁ হয়ে গেছে ডন। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে রানার দিকে। রসিকতা

করার মনোবল এখনও রয়েছে ওর, কানে শুনে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না যেন।

আয়েশ করে কফির কাপে চুমুক দিয়ে পাইপে আগুন ধরাল রানা। 'ওহে, ডন, তুমি এমন চুপচাপ কেন? যা ভাবছ, ভুলে যাও। কোন চান্স নেই তোমার।'

ছ্যাঁৎ করে উঠল ডনের বুক। কি বলতে চাইছে? ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল বেগে ভাবছে সে। মনের কথা বুঝে ফেলেছে? তোতলাতে শুরু করল সে, 'কি-কি ভা-ভাবছি আমি?'

'নিজেকেই জিজ্ঞেস করে দেখো,' বলল রানা। হাসছে ও। 'ভাবছ তুমুল গোলাগুলি শুরু হবে, সেই সুযোগে ডক্টর ফিলাতভকে রক্ষা করতে গিয়ে হাতের টিপ কেমন নিখুঁত তার প্রমাণ দিয়ে বাহাদুরি লুটবে, তাই না?' হঠাৎ গম্ভীর হলো রানা। 'আমার ধারণা গোলাগুলি শেষ পর্যন্ত হবেই না, সুতরাং তোমার কোন চান্স নেই। তবু, তেমন কিছু যদি ঘটেও, তোমাকে আমি অর্ডার দিয়ে রাখছি, একটাও গুলি করবে না। অকারণ খুনখারাবি আমি পছন্দ করি না।'

দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছে ডন। রানা ওর মনের সবটা কথা ধরতে পারেনি বুঝতে পেরে স্বস্তি ফিরে পেল। ভাবছে, কিন্তু গোলাগুলি শুরু হবার অপেক্ষায় আছে সে, একথাই-বা বুঝল কিভাবে? এতটা যে ধরতে পারে, বাকি সামান্য একটু ধরে ফেলতেই বা কতক্ষণ?

'বাইরেটা একবার দেখা দরকার—যাব?' রানার কাছ থেকে পালাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে ডন। এ লোক অলৌকিক ক্ষমতা রাখে, এর সান্নিধ্যে থাকলে গা ছমছম করে, ভাবছে সে।

শেষ চুমুক দিয়ে কফির কাপটা নামিয়ে রাখল রানা। 'তোমাকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' বলল রানা। উঠে দাঁড়াল। 'এমন নার্ভাস হয়ে আছ, ভয় করছি, ইঁদুরের লেজ নড়তে দেখলেও গুলি করে বসবে তুমি। না, বাবা, ঝুঁকি নিয়ে দরকার নেই। বাইরেটা বরং আমিই দেখে আসি।'

আনন্দের একটা ঢেউ বয়ে গেল ডনের শরীরে। মি. পপকিনের নির্দিষ্ট করে দেয়া তিনটে দিন পুরো হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। এই কয়েক মিনিটের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। কোনরকম ভণিতা বা ভান না করে এখনই গুলি করা যেতে পারে। এই মুহূর্তে অবশ্য সে-ও গুলি করতে পারে, কিন্তু কাছ থেকে রানাকে গুলি করতে যাওয়া সাংঘাতিক কঠিন, ঠিক আগের মুহূর্তে টের পেয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে...তার চেয়ে, সুযোগটা বরং টিটো-জুনেস্কিই নিক।

'বেশ,' কণ্ঠস্বরে একটু নিরাশার ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল ডন। 'আপনিই যান।'

স্টেন, রাইফেল বা রিভলভার কিছুই নিল না রানা। পাইপটা টানতে টানতে তাঁবুর দরজার দিকে এগোল।

বাধা দিল জুলি, ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল। 'আস্তন, এতটা দুঃসাহস দেখানো কি উচিত হচ্ছে?'

'দুঃসাহস?' অবাক হলো রানা।

'পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করো। চারদিক থেকে সবাই ঘিরে ফেলেছে

আমাদেরকে, তোমাকে দেখামাত্র যদি...'

'কেন?' অত্যন্ত শান্ত গলায় জানতে চাইল রানা। 'ডক্টর ফিলাতভ ওদের কার কি ক্ষতি করেছে? আমাকে মেরে কিছু লাভ হবে ওদের! আমার নিরাপত্তার জন্যে ওরা কতটা সচেতন, প্রমাণ পাওনি?'

ইতস্তত করছে জুলি। 'তা পেয়েছি, কিন্তু...ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না।'

'দূর, বোকা!' জুলিকে পাশ কাটাল রানা। 'অকারণে ভয় পাচ্ছ তুমি।' মাথা নিচু করে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ও। তাঁবুর গায়ে দাঁড় করানো রাইফেলটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ঝট করে ঘুরল জুলি, রানার পিছু পিছু দ্রুত বেরিয়ে এল সে-ও। দরজা থেকে সাত আট গজ এগিয়ে রানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

আরও কিছু তারা ফুটেছে আকাশে। উপত্যকার পুরোটা এখন আর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। গাঢ় ছায়া কোথাও কালো পর্দার মত, দৃষ্টি চলে না। একশো গজ দূরের জিনিস মোটামুটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু পরিষ্কার নয়। ছায়ার মধ্যে ঘন ছায়ার আকার-আকৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছে কোন্‌টা গাড়ি, কোন্‌টা তাঁবু, কোন্‌টা মানুষের কাঠামো।

নিস্তব্ধ চরাচর। কোথাও কেউ নড়ছে না। দক্ষিণে আগুনের একটা ফুলকি দেখল রানা, তাঁবুর সামনে ব্যারিকেডের পিছনে দাঁড়িয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল কেউ। জেগে আছে সবাই। ওদের তাঁবুর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে।

'কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা?' ফিসফিস করে বলল জুলি।

'ওরা নিজেরাও জানে না,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আমাদের আচরণে ওরা স্রেফ বুদ্ধু বনে গেছে।'

'কিন্তু এভাবে কতক্ষণ? এক সময় মরিয়া হয়ে...'

'সেই সময় আসার আগেই...' মাঝপথে থেমে গেল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। তাঁবুর ভিতরটা অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। 'ডন কি করছে দেখে এসো তো,' জুলির দিকে ফিরে বলল ও। 'সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে, কাঁদছে কিনা...'

'কার সম্পর্কে বলছ তুমি?' প্রতিবাদের সুরে বলল জুলি। 'সব যদি মনে করতে পারতে, এসব কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুত না। ডন আমাদের শ্রেষ্ঠ এজেন্টদের একজন মানুষ খুন করার লাইসেন্সটা সবচেয়ে বেশিবার সদ্ব্যবহার করেছে ও গত বছর...'

'আহা! শুনতে আমার ভুলও তো হতে পারে,' জুলিকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'হয়তো কাঁদছে না, হাসছে। গিয়ে দেখে আসতে ক্ষতি কি?'

একটা পাথরের গায়ে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখল জুলি, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁবুর দিকে এগোল।

এক মিনিট কাটল। বাঁ দিকের একটা তাঁবুর কাছ থেকে ক্রল করে এগিয়ে আসছে কেউ। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না রানা। মাটির কালো রঙের সাথে চলমান বস্তুটার রঙ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। শুধু নড়াচড়াটা ধরতে পারছে ও। এদিকেই আসছে।

'হল্ট!' নিস্তব্ধ প্রান্তর কেঁপে উঠল হঠাৎ। পরমুহূর্তে রাইফেল কক্ করার অস্পষ্ট শব্দ কানে এল রানার।

চলমান বস্তুটা স্থির হয়ে গেছে।

বাঁ দিকেরই একটা তাঁবু থেকে আবার সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর হুকুমের সুরে বলল, 'ভাল চাও তো নিজের জায়গায় ব্যাক করো। কুইক!'

কয়েক সেকেন্ড নড়ল না বস্তুটা। থমথম করছে পরিবেশ। যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তারপর হাঁপ ছাড়ল রানা, দেখল, আবার ক্রল করে নিজেদের তাঁবুর দিকে ফেরত যাচ্ছে ঘন ছায়ার লম্বা মূর্তিটা।

'আসুন,' তাঁবুর ভিতর থেকে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা গলায় ডাকল রানাকে জুলি। 'এদিকে একটু আসবে?'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। কিছু একটা ঘটেছে, ভাবতে ভাবতে দ্রুতপায়ে এগোল দরজা টপকে তাঁবুর ভিতর ঢোকা মাত্র চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওর। কে যেন ওর মুখের ওপর তীব্র আলো ফেলেছে টর্চের।

'ডক্টর ফিলাতভ, প্লীজ, দয়া করে হাত দুটো মাথার ওপর তুলবেন?' চৈনিক উচ্চারণ, ভাষাটা ইংরেজি, ভাঙাভাঙা।

চোখের সামনে একটা হাত তুলে আলো ঠেকাল রানা। দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে বুঝে নিল পরিস্থিতিটা। তাঁবুর পিছনে ক্যানভাস ছুরি দিয়ে কেটে পথ তৈরি করা হয়েছে। হাত দুটো পিছমোড়া করে ইতোমধ্যে বাঁধা হয়েছে ডনের, একজন মোটা ফ্রেমের চশমা পরা বেঁটে চীনা পা দুটো বাঁধা শেষ করে উঠে দাঁড়াচ্ছে। হাত দুটো মাথার উপর তুলে একধারে দাঁড়িয়ে আছে জুলি। টর্চধারীর দিকে ফিরল রানা। মস্ত একটা সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তল তার হাতে। ওর বুকের দিকে তাক করে ধরা।

'কি চাও তোমরা?' রাগতস্বরে জানতে চাইল রানা।

'নকশা।'

'ও,' যেন বুঝতে পেরেছে, এই ভঙ্গিতে উপর নিচে মাথা নাড়ল রানা, 'তা কোন্ নকশাটা দেব তোমাদের? প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, নাকি শেষটা?'

'মানে?' বিস্মিত হয়েছে চৈনিক স্পাই।

বিস্মিত জুলি এবং ডনও কম হয়নি। সবগুলো নকশার কথা কি ভেবে ফাঁস করে দিল রানা, বুঝতে পারছে না তারা।

'একটা করে নকশা পাই আমি, সেটার কাজ শেষ করি, তারপর আরেকটা পাই, এইভাবে চারটে পেয়েছি এ পর্যন্ত। আরও কত পাব জানি না। কোন্টা নেবে তোমরা?'

'চারটেই,' চীনা নেতা বলল। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে সে রানার দিকে।

'কি করবে নিয়ে?' সকৌতুকে জানতে চাইল রানা। 'ছোট ছোট চারটে কাগজের টুকরো, পুড়িয়ে যে চা গরম করবে, তাও তো সম্ভব নয়।'

'নিশ্চয়ই ওগুলোর কোন না কোন গুরুত্ব আছে,' চীনা নেতা গম্ভীর।

'আছে,' বলল রানা। 'আবার নেই-ও। সবগুলো নকশা একসাথে পেলে তা

মহামূল্যবান বৈকি। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে একটার, বা যে কোন একটা বাদে বাকি সবগুলোর এক কানাকড়ি মূল্য নেই।' হাসল ও। ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'তোমাদের সবার চোখের সামনে নকশা বের করছি, মাপজোক করছি, মাটি খুঁড়ছি—দেখেও কিছু বোঝোনি নাকি?'

'সত্যি,' বলল চৈনিক স্পাই, 'আপনাদের এমন বিদঘুটে কাজ দেখে প্রতিটি দল প্রথমে বুদ্ধু বনে গিয়েছিল। নকশা যে একটা নয়, এবং আপনি যে স্রেফ নকশাগুলোর সূত্র ধরে একটা জায়গা খুঁজে বের করে খালি হাতে ফিরে যাবেন, পরে আরেক দল এসে মাটির তলা থেকে আসল জিনিস উদ্ধার করবে, এখন প্রায় সবাই এই ধারণা পোষণ করছে।'

'তাহলে নকশা নিতে আসা হয়েছে কেন?' জানতে চাইল রানা।

'সবার ধারণার সাথে আমাদের ধারণার একটু অমিল আছে,' হাসি হাসি সবিনয় ভঙ্গিতে কথা বলছে পিস্তলধারী নেতা। 'আমাদের ধারণা, নকশায় সবকিছু নেই।'

'তো কোথায় আছে?'

পিস্তল ধরা হাতে তর্জনীটা খাড়া করল চীনা নেতা, রানার মাথাটা দেখাল সে। 'ওখানে, আপনার মাথার ভিতর। তাই নকশা, এবং তার সাথে আপনাকেও নিয়ে যেতে এসেছি আমরা, ডক্টর ফিলাতভ। আপনি যদি আমাদের ক্যাম্পে অতিথি হিসেবে যোগ দেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য বলে মনে করব।'

হেসে উঠল রানা। 'আর তা না হলে জোর-জুলুম করতে কসুর করব না। এই তো? আচ্ছা, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সকে তোমরা কি মনে করো? আমি ইসরায়েলের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আমাকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা না করেই এই অভিযানে তারা পাঠিয়েছে, বোকার মত এ-কথা ভাবছ কেন?'

হাসল চীনা নেতা। ইঙ্গিতে ডনকে দেখাল। 'আপনার বডিগার্ড, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ এজেন্ট ডন সাহেব তো মাটি শুঁকছেন। ম্যাকের কাছ থেকেও সাহায্য পাবেন না—তাকে গুরুতর ভাবে আহত করে গার্ড দিয়ে রাখা হয়েছে। মিস জুলিকেও যাবার সময় বেঁধে রেখে যাব।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'কই, আর কাউকে তো দেখছি না।'

'সব কাজ দেখিয়ে করলে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স এত নাম করতে পারত?' নির্ভয়ে হাসছে রানা। 'এই উপত্যকার চারদিকে আছে ওরা। ক'জন, অনুমান করতে পারো?' হাত তুলে তর্জনী এবং মধ্যমা আঙুল দুটো খাড়া করল সে।

'দু'জন?' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল লোকটা।

বিরক্তির সাথে, ধমকের সুরে বলল রানা, 'নাহ্, তোমাদের নিয়ে পারা গেল না। তোমরাও তো এসপিয়োনাজ জগতে যথেষ্ট নাম কিনেছ, তাহলে এমন বোকার মত কথা বলছ কেন?'

চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল চীনা নেতার। 'আপনি বলতে চাইছেন দুশো? ইহুদি এজেন্ট...'

'কম পক্ষে,' বলল রানা। 'আরও বেশি হতে পারে। ঘিরে রেখেছে ওরা সবাইকে চারদিক থেকে।'

দ্রুত ভাবছে চৈনিক গুপ্তচর। 'আপনার কথা বিশ্বাস করব কেন? প্রমাণ কি…?'

'প্রমাণ পেতে হলে আমাকে সাথে করে নিয়ে যেতে হবে, আটকে রাখতে হবে,' বলল রানা। 'দেখবে, সুন্দর সুন্দর সব প্রমাণ একে একে আসতে শুরু করেছে। সবগুলো চাক্ষুষ করতে পারবে, এ প্রতিশ্রুতি অবশ্য দিতে পারি না আমি। তার আগেই…'

দ্বিধায় পড়ে গেল লোকটা। দ্রুত ভাবছে সে। কোন সন্দেহ নেই ডক্টর ফিলাতভ ইসরায়েলের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সত্যিই তো, এমন একজন ব্যক্তিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা না করে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স এই বিপজ্জনক অভিযানে পাঠাবেই বা কেন?

'তাহলে, ডক্টর ফিলাতভ, আপনি বলতে চাইছেন…'

'বলতে চাইছি, উভয় সঙ্কটে পড়েছ তোমরা,' বলল রানা। 'মাথা তো আমাদের তাঁবুতে গলিয়েছ—কিন্তু, এখন না পারবে বেরিয়ে যেতে, না পারবে থেকে যেতে! কর্পূর হয়ে উবে যেতে পারো কিনা ভেবে দেখো।'

'কেন?' বোকা বোকা দেখাচ্ছে চীনা নেতাকে। 'বেরিয়ে যেতে পারব না কেন! যে পথ দিয়ে এসেছি…'

'ভেবেছ, আসার সময় কেউ তোমাদের দেখেনি?' হাসছে রানা। 'প্রতিটা তাঁবু থেকে ইনফ্রা-রেড লেন্সের মাধ্যমে সবাই দেখেছে, বুঝলে? এখন তোমরা বেরুলেই সেই ঘটনাটা ঘটবে।'

'কোন্ ঘটনা?'

'যা ঘটতে বাকি আছে,' হঠাৎ গম্ভীর হলো রানা। 'খুনখারাবি।'

'ডক্টর ফিলাতভ, আপনার কথা…'

'তোমরা বেরোলেই চারদিক থেকে ছেঁকে ধরবে সবাই। আমার কাছ থেকে নকশা পেয়েছ ভেবে…'

'মাই গড!' বিপদটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে সৃষ্টিকর্তার নাম ধরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নাস্তিক চীনা। 'তাহলে…তাহলে এখন কি উপায় হবে আমাদের?'

মাথার উপর তোলা হাত দুটো নামিয়ে ফেলল জুলি। উভয় সঙ্কটে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে শত্রুপক্ষ, ভাবতে বড় মজা লাগছে। রানার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে ওর উপর কয়েকশো গুণ শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে তার। বিস্ফারিত হয়ে গেছে ডনের চোখ দুটোও।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'নিরীহ একজন বিজ্ঞানী আমি,' বলল ও। 'দেশের সেবা করার জন্যে এই অভিযানে বেরিয়েছি। অভিযানের এই পর্যায়ে কোনরকম হৈ-হাঙ্গামা চাই না। কোন উপায় যখন নেই, চলো, আমিই পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাদেরকে।'

'আ-আপনি!' চীনা নেতা হতভম্ব।

'আমার সাথে তোমাদেরকে দেখে আরেকবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোকা বনে যাবে ওরা,' বলল রানা। 'আমার পিছনে থাকবে তোমরা আমার গায়ে লেগে যেতে পারে এই ভয়ে গুলি করতে সাহস পাবে না কেউ।'

'কিন্তু, আন্তন···

হাতের ইশারায় জুলিকে থামিয়ে দিল রানা। 'এছাড়া উপায় নেই,' একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'আমি না ফেরা পর্যন্ত কোন কাজে হাত দিয়ো না।'

রানার শেষ কথাটার অর্থ কি, ধরতে পারল না জুলি। মৃদু একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল চৈনিক গুপ্তচরের ঠোঁটে। সহানুভূতির চোখে ডনের দিকে একবার তাকাল সে।

'গা ঘেঁষে বেরিয়ে এসো আমার সাথে,' দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। 'পিস্তল পকেটে রাখো।'

অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে ডন। একটু আগে রানার যে কথাটার অর্থ বুঝতে পারেনি জুলি, সেটা তার কানেই যায়নি। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে চীনাদের নিয়ে রানা বাইরে বেরোলে কি ঘটবে, তাই কল্পনা করতে ব্যস্ত সে। অবশেষে সুবর্ণ সুযোগটা পেতে যাচ্ছে জুনেস্কিরা। চারদিক উত্তেজনায় থমথম করছে! যে-কোন মুহূর্তে একটা গুলি হতেই পারে। এমন উপযুক্ত পরিবেশ আর হয় না। রানাকে দেখে আর কেউ কিছু না বললেও, টিটো জুনেস্কি এ-সুযোগ কক্ষনো হারাবে না, দেখামাত্র এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে রানার বুক। চীনাদের নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রানা, দেখেও যেন প্রত্যয় হচ্ছে না তার। এত সহজে এমন উৎকট সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে, ভাবতে গিয়ে আনন্দ, বিস্ময়, অবিশ্বাসে বুকের কাছে দম আটকে যাচ্ছে তার। এক সেকেন্ড পর ব্যাপারটা অবিশ্বাস করতে পারল না সে। তাঁবুতে এখন নেই রানা। নিজেকে জুনেস্কিদের হাতে তুলে দেবার জন্যে বেরিয়ে গেছে।

ছয়

হেলসিঙ্কি। ইসরায়েলী দূতাবাস।

দাঁড়াল কার্ল পপকিন, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল, তারপর আবার শুরু করল পায়চারি। এই বয়সে কত আর সহ্য করা যায়, ভাবছে সে। ভেবেছিল এটাই শেষ দায়িত্ব, কাজটা ভালয় ভালয় শেষ হয়ে গেলেই অবসর গ্রহণ করবে। কিন্তু অবস্থা দেখে এক্ষুণি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। এখানকার এই উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তা আর উত্তেজনায় ঠাসা জীবনের চেয়ে নিজের বাড়িতে বাগান পরিচর্যা করে সময় কাটানো কতটা যে আরামের, আজকের মত এমনভাবে এর আগে উপলব্ধি করেনি সে। রানারা রওনা হয়েছে আজ তিন দিন। রিস্টওয়াচ দেখল সে। ভোর সাড়ে চারটে। কাঁটায় কাঁটায় বাহাত্তর ঘণ্টা। কিন্তু কই, হেলিকপ্টার চেয়ে ফোন তো এল না। নাকি ওদিকেও স্টকটনরা কোন ঘাপলায় জড়িয়ে পড়েছে?

মনে হয় না। শুধু স্টকটন একা হলে সে ভয় ছিল। তার সাথে ডন, ফেজ, জুলি আছে। বাইরে আছে ম্যাক। আরও আছে—টিটো, জুনেস্কি। ছয়জন। রানা একা।

নাহ্, খামোকা দুশ্চিন্তা করছে সে। বড়জোর এমন হতে পারে—এই ক'দিন উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়ায় খুনটা করেনি ওরা। কে জানে, হয়তো এই মুহূর্তে রানার কপালের পাশে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টানছে জুনেস্কি। কিংবা, টিটোই হয়তো টেলিস্কোপে চোখ রেখে লক্ষ্যস্থির করছে। আর কিছুক্ষণ পরই হয়তো ফোন আসবে ওদের কারও।

একটু শান্ত হলো পপকিন। কিন্তু হঠাৎ আবার উদ্বেগে আক্রান্ত হলো সে। আসলে দুশ্চিন্তা রানাকে নিয়ে নয়। তাকে ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া গেছে, ধরে নেয়া যেতে পারে। দুশ্চিন্তা ডক্টর ফিলাতভের ব্যাপারে। কিছু একটা হয়েছে তার। শত্রুপক্ষ কিডন্যাপ করেছে তাকে তেল আবিব থেকে? আপন মনে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে। না, তা সম্ভব নয়। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের মুঠো থেকে কাউকে কিডন্যাপ করবে এমন শক্তি কারও নেই। তাহলে?

তার শেষ অয়্যারলেস মেসেজের উত্তরে হেডকোয়ার্টার জানিয়েছে: তেল আবিবে আসার কোন দরকার নেই তোমার। অপেক্ষা করো, পরবর্তী মেসেজ আসছে। ব্যস, এইটুকু। ডক্টর ফিলাতভকে কেন পাঠানো হচ্ছে না, তার কোন ব্যাখ্যা নেই।

'কিন্তু কোথায়, সেই পরবর্তী মেসেজই বা কোথায়?' দাঁতে দাঁত ঘষে প্রায় চিৎকার করে উঠল বদমেজাজী পপকিন। সাউন্ড-প্রুফ অফিস রুমের দরজার বাইরে থেকে নক্ হলো ঠিক এই সময়। এল? তবে কি শেষ পর্যন্ত এল মেসেজ? ভাবতে ভাবতে এগোল পপকিন। দরজার সামনে গিয়ে নব ঘুরাল। বলল, 'কাম ইন।'

অয়্যারলেস অপারেটর নিজেই মেসেজটা হাতে করে নিয়ে এসেছে। নিঃশব্দে তার বাড়িয়ে ধরা হাত থেকে কাগজটা নিল পপকিন। লোকটার দিকে ভাল করে তাকালও না। বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। সেখানে দাঁড়িয়েই ভাঁজ খুলে মেলে ধরল চোখের সামনে কাগজটা।

পড়তে গিয়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল কার্ল পপকিন। প্রথম বাক্যের অক্ষরগুলো চঞ্চল খুদে প্রাণী যেন, ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে দিয়েছে চোখের সামনে। তবে, যতই নাচুক, প্রতিটি অক্ষরের চেহারা ধরতে পারছে সে।

অয়্যারলেস মেসেজের প্রথম বাক্যটা বাংলা করলে দাঁড়ায়: সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেছেন ডক্টর ফিলাতভ।

তারপর জানানো হয়েছে: সম্ভব হলে মাসুদ রানাকে দিয়ে কাজ হাসিল করো। আর সম্ভব না হলে অপারেশন এক্স-রে বাতিল করো।

নিজের মুখে একটা হাত চেপে ধরল পপকিন। অকথ্য গালিটা বেরোবার পথ পেল না। হঠাৎ খেয়াল হলো হাতের কাগজটা কখন যেন পড়ে গেছে। পাখার বাতাস সেটাকে ঠেলা দিয়ে ডেস্কের নিচে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সেদিকে হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকল পপকিন। সব শেষ! ভাবছে সে। দুটো ফিলাতভকেই হারিয়েছি আমরা। এখন আর কোন উপায় নেই।

'অ্যাই, জুলি।' মুখ তুলে ফিস ফিস করে বলল ডন, 'দড়ি কেটে দাও আমার, কুইক।'

নিজের জায়গা থেকে এক পা নড়েনি জুলি। গলা শুকিয়ে গেছে ওর, ঢিপ ঢিপ করছে বুক। তাঁবুর খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। ডনের কথা কানে ঢুকতে এক সেকেন্ডের জন্যে তাকাল, দপ করে জ্বলে উঠল দৃষ্টি, চোখের চারপাশ কুঁচকে গিয়ে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার তাকাল তাঁবুর বাইরে।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ডন। কান পেতে আছে। তাঁবুর বাইরের পরিস্থিতিটা কল্পনা করার চেষ্টা করছে সে। রানাকে দেখে টিটো জুনেস্কি কয়েক সেকেন্ড আনন্দে বিহ্বল হয়ে যাবে। বিহ্বলতা অবশ্য দ্রুত কাটিয়ে উঠবে তারা। টিটো হয়তো এই মুহূর্তে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখছে রানাকে।

দশ সেকেন্ড চোখ বুজে অপেক্ষা করল ডন। গুলি হচ্ছে না। চোখ খুলেই তাকাল জুলির দিকে, তাঁবুর ভিতরটা এখনও প্রায় অন্ধকার, জুলির কাঠামোটা বোঝা যাচ্ছে শুধু, দড়ি কেটে দিচ্ছে না কেন ও? কোন কারণে টিটো জুনেস্কি যদি ব্যর্থ হয়, কিছুক্ষণের মধ্যে বহাল তবিয়তে ফিরে আসবে রানা। না, তা হতে দেবে না সে। বাঁধনমুক্ত হয়ে তাঁবুর বাইরে চোখ রাখা দরকার। রানাকে ফিরে আসতে দেখলে তাঁবুর ভিতরে দাঁড়িয়ে সে-ই করবে গুলি।

'জুলি, শুনতে পাচ্ছ না?' চাপা উত্তেজনার সাথে বলল ডন। 'হাত পায়ের বাঁধন কেটে দাও জলদি!'

তাকাল না জুলি। উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুনতেই পায়নি ভাল করে ডনের কথা।

'জুলি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ডন।

চমকে উঠে তাকাল জুলি। 'একটু পর,' বলল সে। 'আন্তনের জন্যে দুশ্চিন্তায় মাথা ঘুরছে আমার।' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দরজার দিকে আরও দু'পা এগিয়ে গেল সে।

'ওর সাহায্য দরকার ' ডন ব্যগ্র গলায় বলল, 'তুমি দড়ি কেটে দিলেই আমি বেরিয়ে যেতে পারি।'

তার কথায় কান দিচ্ছে না দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারছে ডন, হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে রানার সাথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে মেয়েটা, এই মুহূর্তে ওকে দিয়ে বাঁধন কাটানো যাবে না। অস্থিরতা বেড়ে গেল তার। এখনও গুলি হচ্ছে না দেখে খটকা লাগছে। নিশ্চয়ই কোন বাধা আছে, তাই গুলি করতে পারছে না টিটো-জুনেস্কিরা। হয়তো পারবেও না। সুতরাং, দায়িত্বটা এখন তার একার ঘাড়ে চাপছে। কিন্তু হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কি করার আছে তার! মুক্ত হতে হবে, মরিয়া হয়ে ভাবল সে। যেভাবেই হোক জুলির ঘোর ভাঙিয়ে দেবে সে?

ঝড় বয়ে যাচ্ছে ডনের মনে। এই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে রানাকে খুন করা আর হয়তো সম্ভবই হবে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। 'জুলি!'

এমন চাপা উত্তেজনার ছোঁয়া ছিল ডনের কণ্ঠস্বরে, ঘাড় ফেরাতেই হলো জুলিকে। 'কি?' অন্ধকারে তাকিয়ে জানতে চাইল সে।

'একটা অত্যন্ত গোপনীয়, টপসিক্রেট কথা বলতে চাই তোমাকে আমি,' বলল ডন।

'পরে, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাঁবুর বাইরে তাকাল জুলি আবার।

'ও আমাদের লোক নয়,' চাপা গলায় বলল ডন। 'মি. পপকিন তোমাকে জানায়নি...'

ভুরু কুঁচকে উঠল জুলির। তাকিয়ে আছে বাইরে। 'এত বক বক করছ কেন? একটু চুপ করে থাকতে পারো না?' ডনের গলা কানে ঢুকেছে মাত্র, কি বলছে শোনেনি সে।

রাগে নিজের মাথাটা মাটিতে ঠুকে খুলিটা ফাটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে ডনের। 'আমি কি বলছি শুনছ? ও আমাদের লোক নয়।'

'জানি,' জুলি অন্যমনস্ক। 'হেড অফিসের লোক ও।'

'তা বলছি না!' অস্থিরভাবে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ডন। পরমুহূর্তে খাদে নেমে গেল গলা। 'আমি বলতে চাইছি, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের লোক নয় ও।' ঘামছে ডন। কর্মকর্তার একটা নির্দেশ অমান্য করে যাকে যে কথা বলার নয় তাকে সেই তথ্য জানাচ্ছে সে। এর পরিণতি কি হবে, জানা নেই তার। আদেশ অমান্যের শাস্তি পেতে হতে পারে। কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়ে করারও কিছু নেই।

ঝট্ করে অন্ধকারে ডনের দিকে তাকাল জুলি। তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠল তার চোখে। 'নিজের অযোগ্যতা ঢাকার জন্যে আর কোন উপায় পেলে না? ওর মত একজন দেশপ্রেমিককে তুমি ডাবল এজেন্ট বললেই কেউ তা বিশ্বাস করবে ভেবেছ?'

'জুলি, তুমি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ না—' রাগ নয়, ব্যাকুলতা ফুটে উঠল ডনের কণ্ঠস্বরে।

'শোনার দরকার নেই।' বলেই দুপ্‌দাপ্ শব্দে পা ফেলে একেবারে দরজার কাছে চলে গেল জুলি।

'জুলি, দাঁড়াও!' মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল ডন। 'আমি অর্ডার করছি, দাঁড়াও তুমি।'

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জুলি। বাইরের আবছা আলো পড়েছে তার মাথায়, কাঁধে। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডনের দিকে। হাসছে সে।

হাসিটার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হলো না ডনের। দ্রুত ভেবে নিল পরিস্থিতিটা। টিটো-জুনেস্কি সুযোগটা হারিয়েছে। তারও করার কিছু নেই। 'শোনো, পরে সব কথা খুলে বলব তোমাকে। যা বললাম সে সম্পর্কে ওকে জানিয়ো না কিছু। তোমার ওপর এটা অফিশিয়াল নির্দেশ।'

বাইরে বেরিয়ে রানা দেখল, ছায়া ছায়া অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করেছে। পরিষ্কার নয় কিছুই, তবু একশো গজ দূরের তাঁবুটারও কাঠামো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখন। সবার সামনে ও, ওর পিঠ ঘেঁষে রয়েছে ছোটখাট আকৃতির চীনা এজেন্ট, তার পিছনে চশমা আঁটা বেঁটে এবং সাংঘাতিক চওড়া চ্যাঙ। মাথাটা নিচু করে দু'হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে, যেন ইঁট-পাটকেল থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে।

দরজা থেকে তিন পা এগিয়ে দশ সেকেন্ডের জন্যে থামল একবার রানা। দুটো কাজ সারল। জানে, প্রতিটি তাঁবু থেকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে সবাই ওকে। ঠিক

নির্দিষ্ট কাউকে লক্ষ্য করে নয়, হাত দুটো মাথার ওপর তুলে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে দু'বার নাড়ল ও। আশা করল, প্রতিদ্বন্দ্বী দলের দু'জন লোককে ওর সাথে হঠাৎ এভাবে দেখে যে যাই ভাবুক না কেন, ওকে হাত নাড়তে দেখার পর বোকার মত কিছু করে বসা থেকে বিরত থাকবে সবাই। আরেকটা কাজ হলো এই ফাঁকে। চীনাদের তাঁবুটা কোন্ দিকে জানা ছিল। সবচেয়ে কাছেরটাই তাদের। পাথরের স্তূপ আর ঝোপ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে অনায়াসে গা ঢাকা দিয়ে পৌঁছানো যায়। হানা দেবার পরিকল্পনা ছিল বলেই তারা বুদ্ধি করে এই রকম একটা আদর্শ জায়গা বেছে তাঁবু গেড়েছে, সোজা পথটা ধরে গা ঢাকা দিয়ে ওখানে পৌঁছতে চাইছে না রানা। কোন গোপনীয়তা রাখতে চায় না ও। সবার নাকের ডগা দিয়ে যাবার জন্যে কোন্ পথটা ভাল হবে দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল, তারপর সেই পথ ধরে এগোল।

নিস্তব্ধ, ভূতুড়ে পরিবেশ। খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা পাইনের সারি যেন দৈত্যকুল। খুদে পিরামিডের মত দেখাচ্ছে ফাঁকা জায়গায় টাঙানো তাঁবুগুলোকে। এদিক-ওদিক ঘন ঝোপ-ঝাড়, খুব বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। কোথাও নড়ছে না কেউ। কোন আওয়াজ নেই।

ঘন ঘন এদিক ওদিক বাঁক নিয়ে এগোচ্ছে ওরা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সবাই। কোথায় যাচ্ছে ডক্টর ফিলাতভ, কেউই বুঝতে পারছে না। সাথে চীনারা রয়েছে বটে, কিন্তু ওরা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে তো চীনাদের ক্যাম্প নয়! প্রায় প্রতিটি তাঁবুর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল ওরা। শেষ বাঁকটা নিয়ে সোজা খানিকদূর এগিয়ে পিছন দিক থেকে পৌঁছে গেল চীনাদের ক্যাম্পে।

শুধু ভদ্রতা রক্ষার জন্যে নয়, তাঁবুতে ফিরে চীনা নেতা আন্তরিকতার সাথেই ডক্টর ফিলাতভকে আপ্যায়ন করতে চাইল, মৃদু হেসে সে-প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল রানা। বিদায়ের আগে রানার সাথে করমর্দন করার সময় বলল সে, 'ধন্যবাদ, ডক্টর ফিলাতভ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার এই মহানুভবতা জীবনে কখনও ভুলব না আমরা। যদি কখনও আমাদের সাহায্য দরকার বলে মনে করেন, একটু ইঙ্গিত দেবেন, সাথে সাথে হাজির হয়ে যাব আমরা।'

'মনে থাকবে কথাটা,' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ঘুরপথে যাবার আর কোন তাৎপর্য নেই, সোজা পথটাই ধরল ও।

দশ গজ এগিয়ে অনুভব করল রানা পাথরের স্তূপ আর উঁচু ঝোপ-ঝাড় ঘিরে ফেলেছে ওকে, কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না। একটা পায়ের আওয়াজ, দূরে...কানের ভুল? হন হন করে হাঁটছে রানা, চলার গতি একটুও শ্লথ হলো না। শুকনো একটা পাতা ভাঙল মচ্ করে। শুনতে ভুল?...না। ধনুকের মত একটু বেঁকে গেছে পথটা। পাঁচ গজ পর আবার সোজা এগিয়ে গেছে। দু'পাশেই উঁচু ঝোপ। কিছুই দেখেনি রানা, বাঁ চোখের কোণ দিয়ে শুধু অনুভব করল পাশের ঝোপটা দুলে উঠেছে। পদক্ষেপ নেবার জন্যে ডান পা-টা তুলতে যাচ্ছিল রানা, না তুলে সেই পায়ের উপর ভর দিয়েই বিদ্যুৎবেগে সরে গেল বাঁ দিকে। দুপ্ করে আওয়াজ হলো একটা। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা সউদী অ্যারাবিয়ান পোশাকে আপাদমস্তক ঢাকা। দ্বিতীয় লাফে পৌঁছে গেল রানা, প্রচণ্ড এক কারাতে

চপ্ কষাল ওর কনুই থেকে তিন আঙুল নিচে নার্ভ সেন্টারে। ছিটকে পড়ে গেল সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলটা। ইতোমধ্যেই ডান হাতটা কোমরের কাছে চলে এসেছে রানার। পরক্ষণে আবছা আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল ছোরাটা। বিদ্যুৎবেগে সামনে ঠেলে দিয়ে ঘ্যাচ করে ফলার সবটুকু সেঁধিয়ে দিল লোকটার পেটে। হ্যাঁচকা টানে সেটাকে উপর দিকে, পাঁজরের খাঁচার গা পর্যন্ত নিয়ে গেল। তারপর টেনে বের করে নিয়ে দ্রুত পিছিয়ে গেল এক পা।

দু'হাত দিয়ে পেটটা চেপে ধরতে গিয়েও পারল না টিটো। লম্বা ফাঁকটা দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত নাড়িভুঁড়ি। পিচ্ছিল জিনিসগুলো সামলাতে পারল না, হাতের ফাঁক গলে বেশির ভাগই ঝুলে পড়ল নিচের দিকে। উপুড় হয়ে পড়ে গেল টিটো।

হাঁটু মুড়ে বসল রানা। ছোরাটা ঘষে ঘষে মুছল টিটোর আলখেল্লায়। উঠে দাঁড়াল। চোখ ফিরিয়ে নিল টিটোর উপর থেকে। যে কেউ দেখলে মনে করবে ব্যগ্রভাবে এখানে সেখানে মাটির গন্ধ শুঁকছে টিটো। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল রানা। কোথাও কোনরকম চাঞ্চল্য নেই। কি ঘটে গেল, জানে না কেউ। শান্ত পদক্ষেপে নিজের পথে আবার এগোল সে। যেন কিছুই হয়নি।

তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে জুলি। দু'পা এগিয়ে এসে একটা হাত ধরল রানার। 'বাঁচালে,' বুকের গভীর প্রদেশ থেকে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল ওর।

'সুখবর আছে,' তাঁবুতে ঢুকে ডনের চোখে চোখ রেখে বলল রানা।

'কি সুখবর!' সোৎসাহে জানতে চাইল জুলি।

ডনের দিকে পিছন ফিরল রানা। জুলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'একজন অ্যারাবিয়ান অ্যামবুশ পেতে বসেছিল আমার ফেরার পথে।'

'তারপর?' আঁতকে উঠে জানতে চাইল জুলি।

'তারপর আর কি, আমাকে বহাল তবিয়তে ফিরে আসতে দেখে বাকিটুকু বুঝে নাও,' মৃদু হেসে বলল রানা।

একটু এগিয়ে পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে উঁচু হলো জুলি। আলতোভাবে চুমু খেল রানার কপালে, বলল, 'আশ্চর্য মানুষ তুমি রা···, আন্তন।'

পিছিয়ে এসে রানাকে ছাড়িয়ে ডনের দিকে তাকাল জুলি। দেখল মুখটা ঝুলে পড়েছে তার। জুলির দেখাদেখি রানাও তাকাল ডনের দিকে। 'আহা, বাঁধন কেটে দাওনি কেন! দেখছ না, ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে বেচারা!'

কোমর থেকে একটা ছুরি বের করে নিয়ে ডনের দিকে এগোল জুলি।

রিস্টওয়াচ দেখছে রানা। 'সূর্য উঠতে পনেরো মিনিট বাকি। কফি খেয়ে সময়টা কাটানো যেতে পারে, কি বলো?'

ভোর ছ'টায় সূর্য ওঠার সাথে সাথে রওনা হয়ে গেল ওরা।

ক্রিং ক্রিং করে যন্ত্রণাকর একটা ঘণ্টা একনাগাড়ে বেজে চলেছে ডনের মাথার ভিতর। তিনদিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। টিটো বা জুনেস্কি, দু'জনের একজন নেই। যে

আছে তার দ্বারা কতটুকু কি হবে, বুঝতে পারছে সে। কাছে পিঠে ছায়া পর্যন্ত নেই তার। সব দায়িত্ব এখন তার একার ঘাড়ে।

পরিবেশটা আগের চেয়ে অবশ্য অনেক অনুকূল, ভাবছে ডন। প্রতিপক্ষদের পাহারাও এখন নেই রানার উপর। ওদের জীপ কেভো ক্যাম্প থেকে সোমপিয়োর দিকে মাইল দশেক এগিয়ে এসেছে। পিছনের মাইল আড়াই রাস্তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার। কোন গাড়ির চিহ্ন নেই কোথাও। এটাই উপযুক্ত সময়। এখন শুধু মোক্ষম একটা সুযোগের অপেক্ষা। এখুনি, এই মুহূর্তে কাজটা সারতে পারত সে, কিন্তু কি মনে করে লোকটা তাকে দিয়ে গাড়ি চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হঠাৎ। সব কিছু আগাম টের পেয়ে যায় নাকি, গড নোজ! ঠিক হ্যায়, তাকে দিয়ে তো আর অনন্তকাল গাড়ি চালাতে পারবে না। এক সময় থামবে গাড়ি। হাত দুটো খালি হবে।

জীপের পিছনে, জুলির উল্টো দিকের একটা সীটে বসে আছে রানা। মাঝে মাঝে চোখে বিনকিউলার তুলে ফেলে আসা দীর্ঘপথটা দেখছে। দূর পাহাড়ের বাঁকে মাত্র একবার একটা গাড়ির উইন্ডস্ক্রীন রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠতে দেখেছে ও, তারপর আর কিছু চোখে পড়েনি। আসছে সবাই, কোন সন্দেহ নেই? পরস্পরের মতিগতি লক্ষ্য করতে করতে আসছে বলেই হয়তো গতিটা এত মন্থর। মনে মনে হাসল রানা। ওর প্ল্যানটা কার্যকরী করতে সুবিধেই হবে এতে।

'সোমপিয়োয় আমরা একদিন থাকব, তাই না?' জানতে চাইল জুলি। 'ওখান থেকে?'

'যাকে বলে খাঁটি রোমাঞ্চ,' বলল রানা, 'এই অভিযানে তা একেবারেই নেই। ভাবছি এই অভিযান সংক্ষিপ্ত করে রোমাঞ্চকর কোন কাজ বাগানো যায় কিনা।'

'মি. পপকিন কিন্তু বলেছেন সোমপিয়োয়...'

'একটা দিন কাটাবে,' বলল রানা। 'জানি। তা না করেও প্রতিপক্ষদের দুটো দিন আটকে রাখা যায়।'

'কিভাবে?'

'একটু পরেই দেখতে পাবে,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'বলেছিলাম, ওদের সবার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব, ভুলে গেছ?'

না জানি আবার কি সর্বনেশে ফন্দি এঁটেছে শালা, ভাবছে ডন। স্টিয়ারিঙ ধরা হাত দুটোর তালু ঘামছে তার।

দ্রুত এগিয়ে আসছে উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো সারি সারি পাহাড়। দুর্গম পার্বত্য এলাকা, কিন্তু দেড় মাইল লম্বা একটা গিরিপথ থাকায় সোমপিয়োয় পৌছানো মোটেও কষ্টসাধ্য নয়। গিরিপথটা সম্পূর্ণ ঢাকা, প্রশস্ত একটা দু'মুখো টানেলের মত।

ম্যাপ দেখছে রানা। মুখ তুলে বলল, 'নোভা গিরিপথের মুখের কাছে ক্যাম্প করব আমরা।'

ভিউ মিররে চোখ রেখে রানাকে দেখছে ডন। কিভাবে কথা আদায় করবে ভাবছে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কি আবার আমাকে মাটি কাটতে হবে, ডক্টর ফিলাতভ?'

'না-না,' বলল রানা। 'তবে, মোট বইতে হতে পারে।'

আর একটু হলে শব্দটা বেরিয়ে যাচ্ছিল, সময় থাকতে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসিটাকে ঠেকাল জুলি। ডন বা রানা সেটা লক্ষ করে থাকলেও প্রকাশ করল না।

দূরে থেকেই নোভা গিরিপথের বিশাল মুখ গহ্বরটা দেখা গেল। ভিতরটা অন্ধকার। শ'খানেক গজ দূরে থাকতেই ডন স্পীড কমাচ্ছে দেখে রানা বলল, 'এখানে নয়, আরও সামনে গিয়ে থামো।'

গিরিপথের একেবারে মুখের সামনে গিয়ে থামল গাড়ি।

'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!' লাফ দিয়ে নিচে নেমে বলল রানা। 'হাতে অনেক কাজ। আগে তাঁবুটা খাটাতে হবে।'

জীপ থেকে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল ডন। জুলি তাকে সাহায্য করছে। গোলাবারুদের বাক্সটা দু'হাত দিয়ে ধরেছে ডন, দেখেই বলল রানা, 'ওটা গাড়িতেই থাক।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডন। কিন্তু রানা ইতোমধ্যে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়েছে। এখনও কোন গাড়ি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

তাড়াহুড়ো করে তাঁবু খাটানো হলো। 'ডনকে নিয়ে গিরিপথে ঢুকছি আমি,' জুলিকে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল রানা। 'ফিরতে দেরি হবে একটু। আমাদের সাড়া না পেলে, যাই ঘটুক, তাঁবু থেকে বেরিয়ো না। তাঁবুর পর্দাটাও তুলো না। আমি চাই সবাই মনে করুক আমরা তিনজনই রয়েছি তাঁবুর ভিতর। বুঝেছ?' হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে গাড়ির দিকে ছুটল রানা। 'ডন, কুইক!'

জীপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন। 'গোলাবারুদের বাক্সটা মাথায় নাও। হেঁটে গিরিপথটা পেরিয়ে যেতে চাই···পারবে তো?' কণ্ঠস্বরে একটু ব্যঙ্গের ফোড়ন দিয়ে জানতে চাইল রানা।

কটাক্ষটা তার শারীরিক সামর্থ্যের উপর, বুঝতে পারল ডন। আত্মসম্মানে ঘা লাগল তার। 'দেখুন পারি কিনা।' বলে কাঠের বিরাট বাক্সটা ধরল সে দু'হাত দিয়ে। তুলতে গিয়ে···ওরে বাবারে! আঁতকে উঠল মনে মনে ডন। তার ধারণাই ছিল না বাক্সটা এত ভারী। কমপক্ষে এক মন; পঞ্চাশ সেরও হতে পারে। কিন্তু এখন অক্ষমতা প্রকাশ করা আরও লজ্জাকর ব্যাপার হবে। অগত্যা ভারী বাক্সটা টেনে হিঁচড়ে গাড়ির কিনারা পর্যন্ত আনল, তারপর দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে তুলে নিল মাথার উপর।

গিরিপথটা অন্ধকার। ভিতরে ঢুকে টর্চ জ্বালল রানা। সামনে ডন। পিছন থেকে ডনের চলার পথে টর্চের আলো ফেলে তাকে সাহায্য করছে রানা। 'পা চালিয়ে চলো, ভাই! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে।'

খানিক পর পরই এদিক-ওদিক বেঁকে গেছে সুড়ঙ্গটা। তবে খুব একটা উঁচু-নিচু নয়, খানাখন্দও তেমন নেই, প্রায় সমতলই বলা যায় পথটাকে। শুধু সামনে নয়, দু'পাশের দেয়ালের দিকেও টর্চের আলো ফেলে কি যেন দেখছে রানা।

হাঁপিয়ে উঠছে ডন। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে মেজাজ বিগড়ে আছে তার। সে একা কেন বইবে বাক্সটা? উনি কোথাকার লাট সাহেব···ইত্যাদি ভাবছে সে, এমন সময় সহানুভূতির সুরে রানা বলল, 'তোমার কপালটা খারাপ, ডন। ভারী বাক্সটা

একা বইতে হচ্ছে। আমি মাথায় নেব তারও উপায় নেই। আমার বুদ্ধি বেশি তো তাই, একটা নয়, তিন তিনটে ফোঁড়া হয়েছে, কোথায় জানো? ঠিক চাঁদির মাঝখানে।'

কথা বলল না ডন। দাঁতে দাঁত চেপে হজম করার চেষ্টা করছে রাগটা।

উপদেশের সুরে কথা বলছে রানা। 'দেশ সেবার চেয়ে বড় পুণ্য আর নেই...' সারাটা পথ এরই ফজিলত বর্ণনা করে গেল সে। নীরবে হজম করল ডন।

বাক্সটাকে অসম্ভব ভারী লাগছে ডনের। মনে হচ্ছে দশ বিশ মন ছাড়িয়ে গেছে ওটার ওজন। হাঁটছে তো হাঁটছেই, যেন কোনদিন শেষ হবে না পথ। 'আর কতদূর?' লজ্জার মাথা খেয়ে প্রশ্নটা না করে পারল না সে।

'কি করে বলব?' টর্চের আলো ফেলল রানা বাঁ পাশের দেয়ালে। একটা গুহামুখ দেখা যাচ্ছে। আরও কয়েক পা এগিয়ে গুহাটার সামনে থামল ও। টর্চের আলো ফেলল ভিতরে। বিশ গজ লম্বা গুহাটা, বেরোবার আর কোন পথ নেই। তিন দিকে নিরেট পাথরের নিশ্ছিদ্র দেয়াল। 'এই রকম একটা গুহাই খুঁজছিলাম,' বলল রানা। 'কাজে লাগবে এটা।'

কি কাজে লাগবে তা জানার উৎসাহ নেই ডনের। চুপ করে থাকল সে। টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে আবার খানিক ধনুকের মত বেঁকে গেছে গিরিপথটা। বাঁক নেবার সময় দিনের আলো চোখে পড়ল। একটু পরই প্রখর রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওদের। গিরিপথ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

চোখ কুঁচকে সামনে তাকাল রানা। সোয়া মাইল দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাহাড়। গিরিপথ থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে, হারিয়ে গেছে পাহাড়টার আড়ালে। চোখে বিনকিউলার তুলল রানা। দেখছে চারপাশ। ডান দিকে মস্ত একটা লেক। ওপারে পাহাড়। বাঁয়ে নির্জন প্রান্তর, খাঁ খাঁ করছে। ঘুরে দাঁড়াল ও। সুড়ঙ্গের বিশাল মুখের দিকে তাকাল। ত্রিশ ফুটের মত চওড়া, প্রায় সেই সমান উঁচু। আরও উপরে উঠে গেল রানার দৃষ্টি। খাড়া উঠে গেছে পাহাড়ের গা খানিক দূর, তারপর একটা বিশাল ঝুলপাথর পিঠ উঁচু করে সেঁটে আছে পাহাড়ের গায়ে।

'কোথায় রাখব এটা?'

রিস্টওয়াচ দেখছে রানা। বত্রিশ মিনিট লেগেছে গিরিপথটা পেরিয়ে আসতে। ডনের মাথায় বোঝা না থাকলে আরও দ্রুত হাঁটতে পারবে ওরা, ফিরতে বিশ বাইশ মিনিটের বেশি লাগবে না। কিন্তু তার আগে আরও ঘণ্টাখানেক ব্যয় হবে...হঠাৎ ডনের দিকে তাকাল ও। 'কিছু বলছিলে?'

মাথার বাক্সটার গায়ে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে একটা হাত দিয়ে চাপড় মারল ডন। 'মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব নাকি চিরকাল? কোথায় রাখব বলবেন তো!'

'হাঁপিয়ে গেছ নাকি?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল রানা।

পুরুষত্বে ঘা লাগল ডনের। ঘাড়, কাঁধ, মাথা প্রচণ্ড ব্যথায় অবশ হয়ে আসছে, কিন্তু জেদের সুরে মুখ হাঁড়ি করে বলল, 'না।'

'পাহাড়ে চড়ব আমরা,' হাত [illegible] সুড়ঙ্গ মুখের কাছ থেকে কয়েক গজ বাঁ

দিকে পাহাড়ের গা দেখাল রানা। 'ওই জায়গা দিয়ে ওঠা যাবে বলে মনে করো?'

ভারী বাক্সটা মাথায় রয়েছে, তাই খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে ঘুরে সেদিকে তাকাল ডন। সাথে সাথে শুকিয়ে গেল মুখ। পাহাড়ের গায়ে এখানে সেখানে সিঁড়ির ধাপের মত সমতল পাথর বেরিয়ে আছে, আকারে কোনটাই আট ইঞ্চির বেশি নয়। একটার উপর একটা তির্যকভাবে উঠে গেছে ধাপগুলো, চল্লিশ ফুট উপরের পেট-উঁচু ঝুলপাথরের কিনারা পর্যন্ত। রানা ঠাট্টা করছে, ভাবল সে। ধীরে ধীরে ঘুরল আবার। 'কোন পাগলও তো ওখানে ওঠার চেষ্টা করবে না, ডক্টর ফিলাতভ।'

'আমরা পাগল নই, তাই আমরা করব,' বলল রানা। 'নাও, তাড়াতাড়ি করো। হাতে বেশি সময় নেই। পড়ে যাবে, সে ভয় কোরো না। তোমার ঠিক পিছনেই থাকছি আমি।'

হঠাৎ একটা সম্ভাবনা ঝিলিক দিয়ে উঠল ডনের মনে। কষ্টেসৃষ্টে খানিক দূর উঠে বাক্সটা যদি ফেলে দেয়া যায়, ঠিক শালার মাথার উপর, ব্যস! রীতিমত রোমাঞ্চ অনুভব করল ডন। এবার সে দেখে নেবে।

ধাপ বেয়ে ওঠা যতটা কঠিন বলে মনে হয়েছিল, কাজটা তার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন, উঠতে গিয়ে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ডন। মাথার উপর বাক্সটাকে ধরে থাকতে হয়েছে এক হাত দিয়ে, অপর হাতটা পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাকা পাথর ধরে শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখেছে। এক পায়ের পাঁচটা আঙুল নামমাত্র ঠেকে আছে নিচের ধাপে, পরবর্তী ধাপটা বেশ দূরে এবং উঁচুতে, পায়ের নাগালের প্রায় শেষ সীমায়। হাঁটু ভাঁজ করে বুকের কাছে তুলেছে, পা-টাকে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে নাগাল পেতে চাইছে পরবর্তী ধাপের। বারবার ব্যর্থ হচ্ছে তার প্রচেষ্টা। ধাপের কিনারা স্পর্শ করছে আঙুলগুলো, হড়কে নেমে আসছে সাথে সাথে। দুর্ভাগ্য ক্রমে ধাপটা সাংঘাতিক ঢালু, সেজন্যেই আঙুলগুলো শক্ত ঠাঁই পাচ্ছে না। টন টন করছে দুটো পা-ই, ব্যথায় অবশ হয়ে আসছে। নিচের ধাপ ছুঁয়ে থাকা পা-টা যে-কোন মুহূর্তে স্থানচ্যুত হতে পারে। তা যদি হয়, কম্ম সাবাড়!

নিচের দিকে তাকাল ডন। আঁতকে উঠল সে। শিরশির করে শরীরে বয়ে গেল আতঙ্কের একটা ঢেউ। ঠিক নিচেই দাঁড়িয়ে আছে রানা। দু'হাত দিয়ে তার নিচের ধাপ ছুঁয়ে থাকা পা-টা ধরতে যাচ্ছে।

'ফেলে দেব না। উঁচু করে ধরছি তোমাকে,' বলল রানা। 'এবার দেখো নাগাল পাও কিনা।'

শক্ত করে ধরে ধাপ থেকে তুলে ফেলেছে ডনের পা-টা রানা। পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করছে ও।

ভয়ে আত্মা খাঁচা ছাড়া হবার অবস্থা ডনের। যত বড় দুঃসাহসী বীর পুরুষই হোক, কোন মানুষের পক্ষে এই ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। নিজেই দাঁড়িয়ে থাকতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, এই অবস্থায় আরেকজনের গুরুতর বিপদ মাথায় নেয়া সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়।

মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই আতঙ্ক কাটিয়ে উঠল ডন। বুঝল, মুহূর্তের বিলম্বে সর্বনাশটা ঘটে যাবে। দু'জনের যে-কেউ এক চুল ভুল নড়াচড়া করলে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ

ফুট নিচে পড়তে হবে।

ডনকে প্রায় এক ফুট এগিয়ে দিয়েছে রানা। ওর একত্র করা দু'হাতের মাঝখানে ডনের পা। ফুলে উঠেছে দুই হাতের পেশী। দ্রুত শক্তি কমে আসছে হাত দুটোর। এই সময় হালকা হয়ে গেল ডনের পায়ের চাপ। পরবর্তী ধাপে অপর পা-টা জায়গা করে নিতে পেরেছে।

ঝুলবারান্দার কিনারায় পৌঁছতে পনেরো মিনিট লেগে গেল ডনের। শেষ ধাপটায় দাঁড়িয়ে আছে সে। বাক্সের উপরটা ঠেকে আছে আলতোভাবে ঝুলপাথরের ফুলে ওঠা গায়ের সাথে।

'এবার?' কেঁপে উঠল ডনের গলা। বাক্সের প্রচণ্ড চাপে মাথার খুলি ভেঙে নিচের দিকে দেবে যাবে বলে মনে হচ্ছে তার।

'একটু অপেক্ষা করতে হবে,' কাঁধ থেকে রশির কুণ্ডলীটা নামাচ্ছে রানা। রশির একটা প্রান্তে তেমাথা বিশিষ্ট একটা বড় সাইজের আঙটা। রশির কুণ্ডলীটা পায়ের কাছে একটা ধাপে নামিয়ে রাখল ও। তারপর আঙটাসহ প্রান্তটা ছুঁড়ে দিল ঝুলপাথরের মাথার দিকে। পেট উঁচু পাথরটার গা ঘেঁষে একটু তির্যক ভাবে উঠে গেল রশিটা। ঝুলপাথরের মাথা ছাড়িয়ে আরও খানিক দূর উঠল, পড়ল চোখের আড়ালে।

আগেই নিচে থেকে দেখে নিয়েছে রানা, ঝুলপাথরের মাথায় ছোট বড় নানান আকারের পাথর পড়ে আছে। রশি ধরে টানছে ও। একটু পরই আটকে গেল আঙটা, টানলেও আসছে না। ভাল করে টেনে দেখে নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে ডনকে বলল, 'রশি বেয়ে উঠে যাচ্ছি আমি। বাক্সটা বেঁধে দাও টেনে তুলে নেব।'

রশি ধরে উঠতে শুরু করল রানা। ডনের পাশ ঘেঁষে উঠছে। দ্রুত ভাবছে ডন, ধাক্কা দিয়ে দেখব নাকি? কিন্তু দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে আছে রশিটা রানা, এক হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে লাভ হবে না কোন। নিজেই হয়তো তাল সামলাতে পারবে না সে। থাক। আরও ভাল সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করবে সে।

ফুলে ওঠা পাথর বেয়ে দ্রুত উঠে গেল রানা। তিন মিনিট পর উপর থেকে ওর গলা পেল ডন, 'বাক্সটা শক্ত করে বাঁধো রশি দিয়ে।'

কিছুক্ষণ পর পর একটা করে সুযোগ আসছে, কিন্তু কোনটাই গ্রহণ করতে পারছে না ডন। এই যেমন এখন, বাক্সটা মাথা থেকে ফেলে দিতে পারে সে। এ কাজের জন্যে এটাই তার শেষ সুযোগ। রানার মতলবটা পরিষ্কার না জানলেও অনুমান করতে পারছে সে। বাক্সের ভিতর সাংঘাতিক শক্তিসম্পন্ন ছয়টা টাইম বোমা আছে। সেগুলো ফাটাবার মতলব রানার। উদ্দেশ্যটাও পরিষ্কার: বিশাল পাথর ধসিয়ে সুড়ঙের মুখটা বন্ধ করে দেয়া। গোলাবারুদের বাক্স উপরে তোলার আর কোন কারণ থাকতে পারে না।

যে-কোন মূল্যে এ কাজ থেকে বিরত রাখা উচিত রানাকে উপলব্ধি করছে ডন। মাথা থেকে বাক্সটা ফেলে দেয়াই এখন একমাত্র উপায়। কিন্তু, এর খারাপ দিকটাও বিবেচনা করতে হয়। বাক্স ফেলার অপরাধে, কোন সন্দেহ নেই, তার শাস্তির ব্যবস্থা করবে রানা। কোন অজুহাতই শুনবে না ও। শাস্তিটা কি হবে, আগে থেকে

জানারও কোন উপায় নেই। তাছাড়া, বাক্সটা নিচে পড়ে ভাঙবে বটে, কিন্তু তাতে টাইম বোমাগুলোর কোন ক্ষতি নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে রানার নির্দেশে আবার নিচে নেমে গিয়ে সেগুলো তুলে আনতে হবে তাকেই। আঁতকে উঠল ডন। অসম্ভব, দ্বিতীয়বার ওভাবে ওঠার চাইতে সে বরং আত্মহত্যা করবে!

নিজেকে আর কোন চিন্তা ভাবনার অবকাশ না দিয়ে এক হাত দিয়ে বাক্সের গায়ে রশি পেঁচাতে শুরু করল সে। কষ্টসাধ্য কাজ, প্রচুর সময় নিচ্ছে। বেঈমানদের জন্যে নরকেও বোধহয় এত কঠিন সাজার ব্যবস্থা নেই। ধারাল ক্ষুরের উপর দিয়ে সেতু পার হওয়াও বুঝি এর চেয়ে সহজ।

'হয়েছে,' শেষ শক্তিটুকু একত্র করে চেঁচিয়ে উঠল ডন।

সাথে সাথে টান পড়ল রশিতে। উপর থেকে ধীরে ধীরে টানছে রানা। হালকা হয়ে যাচ্ছে ডনের মাথা। আরামের শীতল পরশ নামছে মাথা বেয়ে।

ধীরে ধীরে উঠে গেল বাক্সটা, হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে। অপেক্ষা করছে ডন। রানা কি রশিটা নামিয়ে দিয়ে উঠতে বলবে তাকে? ভাবছে সে।

এক এক করে দশ মিনিট কেটে গেল। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ডন। নিজেকে হীন, রানার হাতের অসহায় পুতুল মনে হচ্ছে। না বুদ্ধি, না সাহস—কোনদিক থেকেই নিজেকে ওর সমকক্ষ ভাবতে পারছে না সে। আরও দশ মিনিট কাটল, 'কি করব আমি?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল ডন।

'আওয়াজ কোরো না,' উপর থেকে ভেসে এল রানার গলা। 'যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

কি করছেন আপনি, ডক্টর ফিলাতভ?—প্রশ্নটা করতে গিয়েও করল না ডন। উত্তরটা কি দেবে রানা, জানা আছে তার। দুটো মাত্র শব্দ উচ্চারণ করবে ও: দেশসেবা।

আরও দশ মিনিট পর উপর থেকে বলল রানা, 'ডন, আমার কাজ শেষ। নামতে শুরু করো তুমি।'

'আগে নামতে বললেই তো হত! এই অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে কষ্ট দেবার কি মানে?' গজ গজ করছে ডন। সাবধানে নামতে শুরু করল। খানিক দূর নেমে মুখ তুলে উপরে তাকাল। রানাও নামছে। কিন্তু তাকিয়ে আছে তারই দিকে। চোখাচোখি হতে হাসল।

বলল, 'তাড়াতাড়ি নামো। আরও কাজ বাকি আছে।'

মুহূর্তের জন্যে থামল ডন। আবার একটা সুযোগ বয়ে যাচ্ছে। এখন যদি গুলি করে··· কিন্তু না, পকেট থেকে রিভলভার বের করে লক্ষ্য স্থির করতে যে সময় লাগবে, তার আগেই দড়ি বেয়ে হড় হড় করে নেমে আসবে রানা।

নিচে নেমে ভাল করে দাঁড়াবার অবসর পেল না ডন, তার আগেই ঝুপ করে পাশে নামল রানা। কনুই দিয়ে তার পাঁজরে মৃদু গুঁতো মারল ও, 'কুইক! যত অল্প সময়ে সম্ভব ফিরে যেতে হবে আমাদের।'

ডনকে পাশে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল রানা। পকেট থেকে টর্চটা বের করল। সুড়ঙ্গে ঢুকে জ্বালল সেটা।

ডনকে নিয়ে রানা গিরিপথে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সেই যে তাঁবুর ভিতর ঢুকেছে জুলি, প্রায় দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল, ভুলেও একবার বাইরে বেরোয়নি সে। বেরোয়নি বটে, কিন্তু তাঁবুর বাইরে যে উপভোগ্য নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছে তা থেকে নিজেকে মোটেই বঞ্চিত করছে না সে। তাঁবুর পর্দা ফেলা, ফাঁক-ফোকরে চোখ রেখে সবই দেখতে পাচ্ছে সে। ওরা চলে যাবার পাঁচ সাত মিনিটের মাথায় প্রথম দল চীনারা পৌঁছেচে। এখানেও সবচেয়ে কাছাকাছি তাঁবু ফেলেছে তারা। এরপর একে একে এসেছে ব্রিটিশ-সুইডিশ, জার্মান, অ্যারাবিয়ান, কানাডিয়ান এবং ফ্রেঞ্চরা। সবচেয়ে অবাক করে দিয়েছে জুলিকে বাদামী রঙের সেই মার্সিডিসটা। হাতকাটা বয়স্ক লোকটাসহ বিশাল ছাতিওয়ালা সেই ছোকরা এবং অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটাকে নিয়ে গাড়িটা পৌঁছেচে সবার শেষে। এরাও তাহলে ওদের প্রতিপক্ষ, ভাবতে গিয়ে বিষম খেয়েছে জুলি। রানাকে খবরটা দেবার জন্যে সেই থেকে ছটফট করছে সে।

রানাকে জানাবার মত আরেকটা খবর যোগাড় হয়েছে জুলির। ব্রিটিশ-সুইডিশদের সাথেই এসেছে জ্যাক জাস্টিস, কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে সেই যে সে ক্যাম্পে ঢুকেছে, তারপর থেকে বাইরে মুখ দেখায়নি সে। খুবই রহস্যময় ব্যাপার, মনে হয়েছে তার।

ওদের তাঁবুর চারধারে মোটামুটি দূরত্ব বজায় রেখে তাঁবু ফেলেছে প্রত্যেকটি দল। ওদের জীপটা গিরিখাদের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর দিকে মুখ করে, দেখে আশ্বস্ত হয়েছে সবাই। ঘুণাক্ষরেও কারও মনে সন্দেহ জাগেনি, সবাই ধরে নিয়েছে ডক্টর ফিলাতভ তাঁবুর ভিতরই আছেন।

গাড়ির আওয়াজ! কান সজাগ হয়ে উঠল জুলির। কে যেন চিৎকার করে ডাকছে। আরে, রানার গলা। ফোকর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল জুলি। দরজার দিকে ছুটল।

অন্ধকার গিরিপথ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে ওরা। দিনের উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, কিন্তু থামল না। ছুটে গিয়ে লাফ দিয়ে জীপের পিছনে উঠে পড়ল রানা। আরও একটু এগিয়ে ডনও লাফ দিয়ে উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। বসেই স্টার্ট দিল গাড়ি।

'জুলি! জুলি!' ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল রানার কণ্ঠস্বর।

প্রত্যেকটা তাঁবু থেকে দেখতে পাচ্ছে সবাই ওদেরকে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে প্রত্যেকে। ডক্টর ফিলাতভ তাঁবুতে ছিলেন না এতক্ষণ, এটা একটা বিস্ময়। তার চেয়ে বড় বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে এই মুহূর্তে ওর অপ্রত্যাশিত আচরণ। গিরিপথ থেকে এভাবে ছুটে বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে জীপে চড়া, গলা ছেড়ে চিৎকার করা—সব কিছুই বড় গোলমেলে ঠেকছে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়েছে জুলি। দ্রুত হেঁটে আসছে সে। ব্যস্ততার সাথে দ্রুত হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে রানা, তাই দেখে ছুটতে শুরু করল জুলি।

'ঘোরাও জীপ।' ডনকে নির্দেশ দিল রানা।

গর্জন তুলে সামনে এগোল জীপ, সামনের ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে থামল। দ্রুত পিছু হটছে, সেই সাথে ঘুরে যাচ্ছে জীপের নাক। রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে দাঁড়াল। কাছে চলে এসেছে জুলি। হাতের বিরাম নেই ডনের। ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে স্টিয়ারিঙ হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে আবার ছেড়ে দিল জীপ। একরাশ ধুলো উড়িয়ে দিয়ে বাঁক নিচ্ছে। লাফ দিয়ে পিছনের সীটে উঠে পড়ল জুলি। ঘুরে গেছে জীপের মুখ। আতঙ্কিত ইঁদুরের মত ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অন্ধকার গর্তে।

পিছন দিকে তাকিয়ে আছে রানা। তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর হুঁশ ফিরেছে এতক্ষণে। পাগলের মত দৌড়াচ্ছে সবাই। টপাটপ উঠে পড়ছে যে যার গাড়িতে।

মুচকি একটু হাসল রানা।

হেডলাইট অন করে দিয়েছে ডন। পিছন থেকে প্রতি মুহূর্তে তাগাদা দিচ্ছে রানা, 'জোরে, আরও জোরে। তোমার গাড়ি চালানোর ওপরই এখন সব কিছু নির্ভর করছে, ভায়া!'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা, আন্তন?'

'সুড়ঙের ভিতর আরেক সুড়ঙে।'

'মানে?'

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'আর দশ মিনিট পর বুঝতে পারবে।'

ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটছে জীপ। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে চালাচ্ছে ডন। কি ঘটতে যাচ্ছে, জানে সে। তবু সান্ত্বনা এইটুকু যে জীপে স্টার্ট দেবার সময় জুনেস্কির সাথে চোখাচোখি হতেই ইঙ্গিতে তাকে তাঁবু ছেড়ে নড়তে নিষেধ করে দিতে পেরেছে সে।

তিন মিনিটের মাথায় গুহাটার কাছে পৌঁছে গেল জীপ।

'খুব সাবধানে বাঁক নাও,' বলল রানা। 'শেষ মাথায় থামবে। নিভিয়ে দেবে সব আলো।'

স্পীড কমিয়ে আনল ডন। ধীরে ধীরে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল গুহায়। নিরেট পাথরের দেয়ালটা দেখা যাচ্ছে সামনে।

'আলো নেভাও।' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা।

হেডলাইট অফ করে দিল ডন।

'আন্তন···।'

'চুপ!' ধমক মেরে থামিয়ে দিল রানা জুলিকে। 'কোন রকম শব্দ না!'

আবছা ইঞ্জিনের আওয়াজ। বাড়ছে ক্রমশ। তারপর উজ্জ্বল আলো পড়ল পিছনের সুড়ঙে। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে একটা গাড়ি। তিনজনই তাকিয়ে আছে ঘাড় ফিরিয়ে। সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা, পিছনে আরেকটা। সেটার পেছনে আরও একটা।

'চার···পাঁচ···ছয়···' বিড় বিড় করে গুনছে রানা। আট নম্বর গাড়িটা ঝড় তুলে চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও। রিস্টওয়াচ দেখল। 'তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, ডন। চার মিনিট সময় আছে এখনও হাতে। ধীরে সুস্থে তাঁবুতে

পৌঁছুবার জন্যে যথেষ্ট।'

'কিন্তু বুঝলাম না কিছু,' বলল জুলি। 'আন্তন, ওদেরকে ডাইভার্ট...'

'আমরা এখন মি. পপকিনের কাছে ফিরে যাব,' বলল রানা। 'ডন, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই মানে সময় অপচয় করতে বলিনি তোমাকে। সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে এই গিরিপথ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। টাইম বম্বগুলোর বিস্ফোরণে সুড়ঙের ছাদ এখানে সেখানে ধসে পড়াও বিচিত্র নয়। মাঝখানে আটকা পড়লে বাঁচার আশা কম। নাও, স্টার্ট দাও।'

টাইম বম্ব! রানার কথা শুনে বুদ্ধিমতী জুলি দ্রুত বুঝে নিল ব্যাপারটা। অমনি হাততালি দিয়ে উঠল সে। 'তার মানে কেউ আর পিছু নিতে পারছে না!'

'দু'একজন বাদে,' বলল রানা। 'যারা তাঁবু ছেড়ে নড়েনি এখনও।'

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ব্যাক করছে ডন।

'তুমি জানলে কিভাবে?' প্রশ্ন করল জুলি।

রহস্যের সুরে বলল রানা, 'জানি!'

ঘাবড়ে গেল ডন। জুনেস্কিকে সে ইঙ্গিত দিয়েছে, তা কি দেখে ফেলেছে রানা? অসম্ভব! দেখলে অন্ধ দেশপ্রেমিকের মাথা খারাপ হয়ে যেত। জাত দুশমন একজন অ্যারাবিয়ানের সাথে তাকে ইঙ্গিতে ভাব বিনিময় করতে দেখলে রানা তখনই জ্যান্ত কবর দেবার ব্যবস্থা করত তার।

গিরিপথ থেকে বেরোবার ঠিক ত্রিশ সেকেন্ড আগে প্রচণ্ড গুরু গম্ভীর আওয়াজের সাথে সাথে কেঁপে উঠল সুড়ঙটা। ঝুর ঝুর করে ছোট ছোট পাথর আর বালি খসে পড়তে শুরু করল জীপের চারদিকে।

'মুখটা সত্যি বন্ধ হয়েছে কিনা দেখে আসতে পারলে হত,' বলল জুলি।

'কমপক্ষে দশ হাজার টন পাথর ধসে পড়েছে,' বলল রানা। 'ওগুলো সরাতে অন্তত দু'দিন লাগবে, প্রয়োজনীয় লোকবল এবং মেশিনারি যদি পাওয়া যায়।'

'কেউ যদি ঘুরপথে, মানে পাহাড় টপকাবার চেষ্টা করে?'

'ভূতে ধরলে করতেও পারে সে চেষ্টা,' বলল রানা। 'ধরো, তাতেও ওই দু'থেকে তিনদিনই লাগবে।'

গিরিপথ থেকে বেরিয়ে এল জীপ। দিনের আলোয় চারদিক উজ্জ্বল। তাঁবুগুলো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু লোকজনের সংখ্যা নগণ্য। আরবদের তাঁবুর সামনে নেই কেউ। ব্রিটিশ-সুইডিশদের তাঁবুর সামনেটাও ফাঁকা। মার্সিডিসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই হাতকাটা লোকটা। বিশাল ছাতি আর অপূর্ব সুন্দরীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

নিজেদের তাঁবুর কাছাকাছি জীপ থামাল ডন। লাফ দিয়ে প্রথমে নামল রানা। তাঁবুর দিকে এগোচ্ছে। জীপ থেকে নিচে নেমে এদিক ওদিক সকৌতুকে তাকাচ্ছে জুলি।

আস্তে করে ট্রাউজারের ডান পকেটে হাত ঢুকাল ডন, চেয়ে আছে রানার দিকে। ইতোমধ্যে জুনেস্কির তাঁবুর দিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নেয়া হয়ে গেছে তার। তাকে দেখতে না পেয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

তাঁবুর ভিতর থেকে টেলিস্কোপ ফিট করা রাইফেল তুলছে জুনেস্কি। হঠাৎ ডনের দিকে চোখ পড়ল তার। রাইফেলটা নামিয়ে পাশে রাখল। সুযোগটা ডন নিতে চাইছে, নিক। বিনকিউলারটা তুলে নিল সে।

তাঁবু থেকে দশ হাত দূরে এখনও রানা। জীপের সীটে বসে লক্ষ্য স্থির করছে ডন। মাত্র পনেরো হাত দূরের টার্গেট, চলমান হলেও, সোজা হেঁটে যাচ্ছে—ব্যর্থ হবার কোন কারণ নেই।

নিস্তব্ধতা চৌচির হয়ে গেল গুলির আওয়াজে। থমকে দাঁড়াল রানা। ওর ডান পাশ থেকে পিস্তলের আওয়াজ হয়েছে। তাকাতেই দেখল মার্সিডিসের পাশে দাঁড়ানো লোকটার হাতে একটা বিরাট আকারের মাউযার। নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। জুলির চিৎকার ঢুকল কানে। ঝট্ করে পিছন ফিরল রানা। কপালে মস্ত লাল টিপের মত গর্ত নিয়ে জীপের সীট থেকে ঢলে পড়ে যাচ্ছে ডন। 'তবে রে, শালা!' হঠাৎ খেপে ওঠা ষাঁড়ের মত ঝড়ের বেগে ধাওয়া করল রানা হাতকাটা লোকটাকে।

রানাকে ছুটে আসতে দেখে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল হাতকাটা, খিঁচে দৌড়াতে শুরু করল উল্টোদিকে। প্রাণপণে ছুটছে, দ্রুত তালে সামনে পিছনে আসা যাওয়া করছে পিস্তল ধরা একটা হাত। কোটের অপর হাতটা ঝুলছে, অচল।

পিছু তাড়া করে মার্সিডিসের কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল রানা। ঝোপ আর পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে হাতকাটা। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মার্সিডিসের হ্যান্ডেল ধরে হেঁচকা টান মারল ও। খুলে গেল দরজা। ঝট্ করে পিছন ফিরল। 'জুলি, কুইক!'

ডনকে গুলি খেতে দেখে অন্তরাত্মা কেঁপে গেল জুনেস্কির। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কি করা উচিত বোঝার আগেই মূল্যবান কয়েকটা সেকেন্ড বয়ে গেল। চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে ব্যস্তভাবে রাইফেলটা যখন তুলল, মার্সিডিসে ঢুকে পড়েছে তখন রানা। জুলিও পৌঁছে গেছে গাড়ির কাছে।

গুলি করতে গিয়েও করল না জুনেস্কি। জুলির গায়ে লাগাতে পারে। ওর গাড়িতে চড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। স্টার্ট দিয়েই রেখেছে রানা, জুলি উঠতে না উঠতে ইংরেজি U-অক্ষরের মত একটা বাঁক নিয়ে তীব্রবেগে ছুটিয়ে দিল মার্সিডিস। লক্ষ্যস্থির করার অবকাশই পেল না জুনেস্কি। তবু একটা গুলি করল বটে, কিন্তু লাগল না চাকায়।

পিছনে ধুলোর পাহাড় তুলে কেভো ক্যাম্পের দিকে ছুটে যাচ্ছে মার্সিডিস।

সাত

হেলসিঙ্কি।

ইসরায়েলী দূতাবাসের একটি সাউন্ড-প্রুফ অফিস ঘরে দরজার দিকে মুখ করে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে পপকিন। একটা হাত পড়ে আছে ডেস্কের উপর, মুঠোর ভিতর কাঁচের একটা পেপারওয়েট। অপর হাতের কনুইটা ঠেকে আছে ডেস্কে। সেই হাতেরই তালুতে থুতনি রেখে চোখ বুজে আছে সে। কপালে চিন্তার রেখা। গত দু'দিন ধরে বেশির ভাগ সময় এই ভঙ্গিতেই গালে হাত দিয়ে বসে বসে সময় কাটাচ্ছে সে। পায়চারির শক্তি বা উদ্যম নেই। বাইরে থেকে দেখে চেহারাটা শান্ত বলে মনে হবে, কিন্তু মনের ভিতর তুমুল আলোড়ন তুলে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। জুনেস্কি, টিটো, ম্যাক, স্টকটন, ডন, ফেজ, জুলি—সাতজনের একজনেরও কোন খবর নেই। রানাকে বধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে রওনা হয়েছে ওরা আজ পাঁচদিন। এখন সকাল দশটা। পাঁচদিন উত্তীর্ণ হয়েও পাঁচ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। অনুকূল পরিবেশের জন্যে প্রথম তিন দিন অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল ওদেরকে, এর মধ্যে রানাকে যদি খুন করা সম্ভব না হয় তাহলে এই সময় উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র, পরিবেশের ধার না ধেরে, খুন করার নির্দেশ আছে। নির্দেশ যদি অমান্য করা না হয়ে থাকে, তিপ্পান্ন ঘণ্টা আগেই খুন হয়ে গেছে রানা। তা যদি হয়, হেলিকপ্টার চেয়ে ফোন করা হয়নি কেন?

কোন কারণে খুন করা সম্ভব হয়নি রানাকে? সম্ভাবনাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিল পপকিন। জুলি না হয় কিছু জানে না, কিন্তু জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের ছয়জন দুর্ধর্ষ এজেন্ট তো রয়েছে। এদের সবাইকে ফাঁকি দেবে কিভাবে রানা? না, অসম্ভব। রানাকে খুন করতে পেরেছে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাহলে হেলিকপ্টার চায়নি কেন? খবর দিচ্ছে না কেন? কিংবা সরাসরি লাশ নিয়ে চলেই বা আসছে না কেন?

কোন প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না পপকিন। রানা সাংঘাতিক বুদ্ধিমান এজেন্ট, সুতরাং তাকে হত্যা করা সহজ নয়—একথাও ভাবছে সে। কিন্তু যতই বুদ্ধিমান আর দুর্ধর্ষ হোক, নিজেকে তো সে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের লোক বলেই জানে। নিজের পরিচয় যদি জানা থাকত ওর, তাহলে ভয়ের কারণ ছিল। স্মৃতি ফিরে পেয়েছে, এমন মনে করারও কোন কারণ নেই। প্রখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট পরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন: স্মৃতি ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা ওর নেই। তাহলে?

নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে গোটা দলটা। কি ধরনের বিপদে পড়তে পারে? রানার লাশ···। হ্যাঁ ওটা হয়তো ছিনতাই হয়ে গেছে। এবং সবাই হয়তো ছিনতাইকারীদের পিছু ধাওয়া করে সময় নষ্ট করছে। কি দরকার বাবা, লাশের আশা ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। হেডকোয়ার্টারকে প্রকৃত

পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললেই হলো…।

খুট করে একটা শব্দ হলো দরজায়। চোখ খুলে গেল পপকিনের। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ভূত! চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে। তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ডেস্কের কোণে হাঁটু ঠুকে গেল তার।

মুখে হাসি নিয়ে ডেস্কের দিকে এগিয়ে আসছে ভূতটা, পিছনে জুলি।

'তু-তুমি!' তোতলাচ্ছে পপকিন।

'আমাকে দেখে এমন চমকে উঠলেন যে?' হাসছে রানা। 'আশা করেননি বুঝি?' ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল ও। পায়ে বাধিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। ইঙ্গিতে আরেকটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল জুলিকে।

'তু-মি!' চিন্তাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে পপকিনের।

হাসছে রানা। 'হ্যাঁ, আমি। মাসুদ রানা। ফিরে আসার কথা ছিল, এসেছি। আপনার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে আমি ফিরে আসতে পারব কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল আপনার। তাই কি?'

পর পর দু'বার ঢোক গিলল পপকিন। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে অচল হয়ে গেছে মস্তিষ্ক, এখনও কাজ শুরু করেনি।

'আরে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন।'

হঠাৎ চালু হয়ে গেল পপকিনের ব্রেন। ধীরে ধীরে বসতে যাচ্ছে সে ব্যথায় চিন চিন করে উঠল হাঁটুটা। 'আর সবাই কোথায়?' দ্রুত সামলে নিচ্ছে নিজেকে। সাবধানে, মৃদু গলায় করল প্রশ্নটা। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে চোখের দৃষ্টি। চকিতে একবার দেখে নিল জুলিকে।

হঠাৎ মুখের হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল রানার। 'মি. পপকিন, ওদের সম্পর্কে আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন আপনি।'

'কি প্রশ্ন, রানা?' সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে পপকিন।

'একদল গরুকে আমার সাথে ভিড়িয়ে দিয়েছিলেন আপনি। কেন?'

তিন সেকেন্ড কথা বলল না পপকিন! ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'ঠিক বুঝলাম না তোমার কথা। কাদেরকে গরু বলছ তুমি?'

'সরি,' বলল রানা। 'ভুল হয়েছে আমার। গরু নয়। গাধা। জেনেশুনে কেন পাঠিয়েছিলেন গাধাগুলোকে?'

চোখ কপালে উঠে যাচ্ছে পপকিনের। দ্রুত বুঝে নিতে চাইছে রানার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ। 'তুমি স্টকটন ডন ফেজ—এদের কথা বলছ?'

'নয়তো কাদের কথা বলব?' বিরক্তির সুরে বলল রানা। 'আর কাউকে পাঠিয়েছিলেন নাকি?'

'কি করছে ওরা? কোথায়…?'

'টপাটপ মরে গেছে গুলি খেয়ে।'

'কি… কি বললে।' চেয়ার ছেড়ে আবার উঠে দাঁড়াতে গিয়েও ধপাস করে বসে পড়ল পপকিন।

'অথচ,' রাগত গলায় বলল রানা, 'আমাকে রক্ষা করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন

আপনি ওদেরকে। দেখে তো মনে হলো নিজেদের মধ্যে কে কার চেয়ে আগে গুলি খেয়ে মরতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়েছিল!'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে পপকিন। জুলির দিকে তাকাল সে।

'সত্যি,' বলল জুলি। 'কারও কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য পায়নি রানা।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে পপকিনের। শুকিয়ে গেছে কণ্ঠতালু। ঢোক গিলেও কোন ফায়দা হচ্ছে না। বাঁ হাঁটুটা ডলছে সে এক হাত দিয়ে। 'সব কথা আমাকে খুলে বলো, রানা,' ব্যগ্রতার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বরে।

ধীরে ধীরে সব কথাই বলল রানা। গভীর মনোযোগ দিয়ে রানার প্রতিটি শব্দ শুনল পপকিন। দুটো জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। এক, ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে এখনও কিছুই জানে না রানা। দুই, স্মৃতি ফিরে পায়নি ও—তার মানে হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ অনুযায়ী অপারেশন এক্স-রে মিশনে ওকে পাঠানো যায়। ডেস্কের উপর চোখ রেখে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবল সে। তারপর বলল, 'কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও। একজন অ্যারাবিয়ানকে খুন করেছ, বলছ। কে সে? পরিচয় উদ্ধার করতে পেরেছ?' জুনেস্কি নাকি টিটো?—বুঝতে চাইছে পপকিন।

'পেটের কথা জিজ্ঞেস করলেও বলতে পারত না,' জানাল রানা। 'কি করে বলবে, নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছিল যে।'

শিউরে উঠল মনে মনে পপকিন। 'আচ্ছা, ম্যাকের খবর কিছু জানা আছে?'

'আহত হয়েছে, এইটুকু শুনেছি।'

'হুঁ,' চিন্তায় ডুবে গেল আবার পপকিন।

'জুনেস্কি কোথায়?' হঠাৎ বলল রানা, 'এদের সকলের বদলে তাকে একা যদি আমার সাথে পাঠাতেন, তাহলেও এমন বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটত না। ভেবে দেখুন, যা ঘটল, এরপর জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের লোক বলে নিজের পরিচয় দেব কিভাবে? ইস, লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। সে যাক, এদিকের খবর কি? আপনার কাজ শেষ?'

মুখ তুলল পপকিন। 'শেষ? শুরু হয়নি, তার আবার শেষ!'

'মানে?'

নৈরাশ্যের বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পপকিন। 'হেডকোয়ার্টার থেকে খবর এসেছে সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেছেন ডক্টর আনাতোলি ফিলাতভ।'

'হোয়াট!' এবার রানার আঁতকে ওঠার পালা। 'বলেন কি! তাহলে…এই যে এতগুলো লোক প্রতিপক্ষদের ডাইভার্ট করতে গিয়ে মারা পড়ল, এত কৌশল করে, ঝুঁকি নিয়ে সবাইকে নোভা গিরিপথের ওপারে আটকে রেখে এলাম—সব মাঠে মারা গেল? এখানে বসে বসে আপনি বুড়ো আঙুল চুষছেন সেই থেকে?'

'আমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই,' আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে গলার জোর বেড়ে গেল পপকিনের। 'কিছুই করার ছিল না আমার। ডক্টর ফিলাতভ মারা গেছেন, সুতরাং একমাত্র ভরসা তুমি, তাই তোমার জন্যে এখনও এখানে বসে অপেক্ষা করছি আমি। তুমি ফিরে এসে আমাকে বাঁচিয়েছ, রানা।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা,' ভুরু কুঁচকে উঠেছে রানার।

'অপারেশন এক্স-রে এখন সম্পূর্ণ তোমার উপরই নির্ভর করছে,' বলল পপকিন। 'ডক্টর ফিলাতভের চেহারা রয়েছে তোমার, তোমাকে ছাড়া থিসিস উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই আমাদের হাতে।'

'অসম্ভব!' বলল রানা। 'ন্যাড়া ক'বার বেল তলায় যায়? আপনার অযোগ্যতার দরুন কোনমতে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি। আবার? না, মি. পপকিন। আপনার কোন কাজ আমি আর করে দিচ্ছি না।'

বাঁ হাত দিয়ে ডেস্কের ড্রয়ার টান দিয়ে ভিতরে হাত ঢোকাচ্ছে পপকিন, 'কিন্তু হেডকোয়ার্টার যদি সরাসরি নির্দেশ দেয় তোমাকে?' এক টুকরো কাগজ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

অয়্যারলেস মেসেজটা পড়ল রানা। স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে ওতে। গুম হয়ে বসে রইল সে বেশ কিছুক্ষণ।

'কি, রাজি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'উপায় কি!' পাইপে টোবাকো ভরছে ও।

'আমি?' ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইল জুলি, 'আমিও ওর সাথে যাচ্ছি?'

'না,' বলল পপকিন। 'হেডকোয়ার্টার থেকে সে-রকম নির্দেশ পাইনি আমি...'

মুখ কালো হয়ে গেল জুলির।

দরজা খুলে যাচ্ছে দেখে কথার মাঝখানে থেমে গেছে পপকিন।

হন্তদন্ত হয়ে কামরায় ঢুকল জুনেস্কি। রানাকে দেখেই কোটের ভিতরে শোল্ডার হোলস্টারে রাখা পিস্তলের বাঁটে চলে গেল তার হাত।

'এই যে, জুনেস্কি,' দ্রুত বলল পপকিন। 'ঠিক সময়েই পৌঁছে গেছ দেখছি। গুড! অপারেশন এক্স-রে মিশনে রানার সাথে তুমিও যাচ্ছ...'

বসের কথা শুনে থমকে গেছে জুনেস্কি। নিঃশব্দে দ্রুত এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছে।

গ্রাহ্য না করে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকল পপকিন। 'এসো, বসো। কিভাবে কি করতে হবে, সব বুঝিয়ে বলছি তোমাদেরকে।'

বসের কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝছে না জুনেস্কি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল সে।

পাইপে আগুন ধরিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। 'কেমন আছ, জুনেস্কি। খবর ভাল তো?'

উত্তর দিল না জুনেস্কি। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে রানার কাছ থেকে দু'হাত দূরের একটা চেয়ারে বসল।

সব বুঝিয়ে বলতে শুরু করল পপকিন। কিন্তু তার একটা কথাও কানে ঢুকছে না জুনেস্কির। শক্ত হয়ে বসে আছে সে। বসের মুণ্ডপাত করছে মনে মনে। চার চারজন লোক খুন হয়ে গেছে যে লোকের জন্যে, তার সঙ্গে খোশগল্প করছে পপকিন।

সব কথার পর পপকিন বলল, [illegible] তুমি বলেছ নাভা গিরিপথের ওপারে দু'জন বাদে সবাইকে আটকে [illegible] এসেছ এই দু'জনের পরিচয় জানো?'

'জ্যাক জাস্টিস,' বলল রানা। 'আর একজন অ্যারাবিয়ান।'

'জ্যাক জাস্টিস!' আঁতকে উঠল পপকিন। 'মাই গড। ওকেই তো সবচেয়ে বেশি ভয় আমাদের! জানো, কে ও?' রানা মাথা কাত করতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠল সে, 'না! আমেরিকান এজেন্ট নয় সে। জ্যাক জাস্টিস ওর আসল নামও নয়। ওর নাম গুস্তাভ তাতাভস্কি। কে জি বি-র মস্ত বড় অফিসার।'

'সে কি!'

'বিপদটা কোথায় বুঝতে পারছ এবার?' বলল পপকিন। 'অ্যারাবিয়ানটার কথা বাদ দাও। কিন্তু, গুস্তাভ তাতাকে যেভাবে হোক আটকাতে হবে। রাশান ল্যান্ডে ও যদি তোমাদেরকে পায়, জীবনে আর থিসিস নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে না,' একটু চিন্তা করল পপকিন, 'ঠিক আছে, ওর ব্যাপারেও তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ওকে এখানেই ঠেকাবার ব্যবস্থা করব আমি।'

মুচকি একটু হেসে বলল রানা, 'তার দরকার নেই। আমার মাথায় আরও ভাল একটা বুদ্ধি আছে ওকে ঠেকাবার।'

'কি রকম শুনি?' সাগ্রহে জানতে চাইল পপকিন।

কিছুই শুনছে না জুনেস্কি। বসের নির্বুদ্ধিতা কল্পনা করে রাগে ফুলছে শুধু।

বুঝিয়ে বলল রানা। ওর প্ল্যান শুনে খুশির হাসি চিক চিক করে উঠল পপকিনের দু'চোখে। 'গুড! সুন্দর বুদ্ধি করেছ।' চেয়ারে হেলান দিল সে। 'তাহলে আগামীকাল সকালেই রওনা হয়ে যাচ্ছ তোমরা। ইতিমধ্যে টেলিফোনে ক্যাসি ভারতানেনের সাথে সব কথা পাকাপাকি করে ফেলব আমি।'

'কিন্তু,' বলল রানা। 'অরিজিন্যাল প্ল্যান ছিল ডক্টর ফিলাতভের সাথে আপনি যাবেন। এখন আমার সাথে জুনেস্কি যাচ্ছে কেন?'

একটু থতমত খেয়ে গেল পপকিন। তক্ষুণি সামলে নিল নিজেকে। 'পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্ল্যান অদলবদল করার দরকার পড়ে, রানা। তোমরা ওদিকে নির্বিঘ্নে কাজ সারো, আমি এদিকটা সামলাই। আর কোন প্রশ্ন?'

'নেই,' বলল রানা। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। দেখাদেখি জুলিও উঠল। জুনেস্কি নড়ল না। গ্যাঁট হয়ে বসে থাকল নিজের চেয়ারে।

দিনটা ফাইল দেখেই কাটাল রানা। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাটাল জুলির সাথে। দূতাবাসেই ব্যবস্থা হয়েছে থাকার।

ডিনার শেষে ব্যালকনিতে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে রয়েছে ওরা। রানার এক হাতে হুইস্কির গ্লাস, অপর হাতে টোব্যাকো পাইপ।

'এবারও তোমার সাথে যেতে পারলে খুশি হতাম,' দুঃখ করে বলল জুলি। অপারেশন এক্স-রে মিশনে ওকে পাঠানো হচ্ছে না শুনে মন খারাপ করে আছে সে। 'কেন জানি না, বুঝলে, মনে হচ্ছে আর হয়তো তোমাকে...'

জুলির মুখে হাত চাপা দিল রানা। 'আর কোন প্রসঙ্গ নেই?' হাসল সে। 'আচ্ছা, ভাল কথা, বিয়ে-শাদির কথা বরাবর এড়িয়ে যাচ্ছ কেন বলো তো? জুনেস্কি বলছিল...'

'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে বলল জুলি। 'তেল আবিবে থাকে ছেলেটা। কি যে পেয়েছে আমার মধ্যে, পাঁচ বছর ধরে জেদ ধরে বসে আছে, আমাকে ছাড়া বিয়ে করবে না। অথচ…'

'অথচ ওকে তুমি ভালবাস না, এই তো বলতে চাও?'

'না, ঠিক তাও নয়,' ইতস্তত করছে জুলি। 'ছেলেটা এত ভাল, এতই ভাল আর নিরীহ টাইপের যে…মাঝে মাঝে ভাবি, আমার মত দস্যি মেয়েকে নিয়ে জীবনে কি সুখী হতে পারবে ও?'

'পাগলী,' জুলির মাথায় আলতোভাবে চাঁটি মারল রানা। 'আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, বাইরে তুমি যাই হও, ভেতরটা তোমার ফুলের মত কোমল। যে কোন পুরুষকে সুখী করার মত যথেষ্ট গুণ তোমার মধ্যে রয়েছে।'

লজ্জা পেল জুলি। 'থাক আর প্রশংসা করতে হবে না! আচ্ছা, চেহারা স্মৃতি সবই তো ফিরে পাচ্ছ তুমি কিছুদিনের মধ্যে। তোমার কি ধারণা, তখন আমার কথা আর মনে থাকবে?'

'জানি না। মাঝের এই দিন ক'টার কথা মনে থাকবে কিনা আমার জানা নেই। হয়তো থাকবে। কিংবা হয়তো সম্পূর্ণ ভুলে যাব যে জুলি বলে একটা মিষ্টি মেয়েকে আমি চিনতাম, তাকে আমার ভাল লেগেছিল। কি হবে কিছুই জানি না আমি।' একটু থেমে আবার বলল, 'জীবনটা অদ্ভুত, তাই না?'

'আমি—আমি কিন্তু… তোমার স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারব না,' কি যেন বলতে চায় জুলি, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, তোমার স্মৃতি গভীর একটা বেদনা হয়ে অনেক দিন কষ্ট দেবে আমাকে। তোমাকে হারাতে হবে ভাবলেই টনটন করছে বুকের ভেতরটা। কিন্তু আমি জানি, ডাক্তার বলেছে আমাকে, তোমার স্মৃতি ফিরে আসা মানেই তোমার জীবন থেকে আমার খসে যাওয়া। আমার কথা কিচ্ছু মনে থাকবে না তোমার। ভাবতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে আমার—কী আশ্চর্য এই জগতের নিয়ম!'

'আবার হয়তো দেখা হবে আমাদের,' বলল রানা, 'তখন মনে করিয়ে দিয়ো।'

'উঁহুঁ। এসব কথা যদি বলি, গল্প শোনার মত হয়তো শুনবে তুমি, কিন্তু কোন দাগ কাটবে না তোমার মনে। আমার প্রতি তোমার এখনকার অনুভূতি সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে, কিছুতেই মনে পড়বে না কিচ্ছু!'

'আবার নতুন করে শুরু হতে পারে না আমাদের সম্পর্ক?'

'না। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে বিশেষ সম্পর্কের জন্ম হয়। যে পরিবেশে তোমার সাথে আমার পরিচয়, তার পুনরাবৃত্তি হবে না আর কোনদিন। এটা অনেকটা মৃত্যুর মত। আমাদের সম্পর্কের মৃত্যু ঘটবে তোমার স্মৃতি ফিরে আসার সাথে সাথে। তখনও তোমাকে ভালবাসব আমি—কিন্তু তুমি আমাকে চিনতেই পারবে না। কেমন লাগছে ভাবতে বলো তো?'

'খুব খারাপ,' বলল রানা।

'জানো, কাল সকালেই ফেরত পাঠানো হচ্ছে আমাকে অসলোয়

'তার মানে আজই তোমার সাথে আমার সব সম্পর্কের শেষ? অন্য মানুষে

রূপান্তরিত হয়ে যাব এরপর?'

'হ্যাঁ।' একটা হাত রাখল জুলি রানার হাতে। 'তোমাকে হারিয়ে খুব খারাপ লাগবে আমার। কিন্তু কি করব, মেনে নিতে হবে অবশ্যম্ভাবীকে।'

'আমার মনে হয়, সবচেয়ে ভাল বর্তমানকে মেনে নেয়া,' বলল রানা। 'চুলোয় যাক অতীত-ভবিষ্যৎ।'

'তার মানে?'

'ঘরে চলো, বুঝিয়ে দিচ্ছি।' হাসল রানা। শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল গ্লাসটা। উঠে দাঁড়িয়ে দুই বাহু ধরে টেনে তুলল জুলিকে। রানার বুকের কাছে সেঁটে এল জুলি।

আট

পাইপে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল রানা, বলল, 'আস্তে চালাও।'

অ্যাকসিলারেটর থেকে পায়ের চাপ কমাল জুনেস্কি, তামাকের কটু গন্ধ থেকে বাঁচবার জন্যে তাড়াহুড়োর সাথে নিজের দিকের জানালা দিয়ে বাইরে বের করে দিল নাকটা। শুধু ক্যান্সারের ভয়ে নয়, গন্ধটা সহ্য হয় না বলেও তামাকের সাথে প্রেম হয়নি তার।

'এদিকের উঁচু টাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছ?' প্রশ্ন করল রানা, 'ডান দিকে?'

রানার মাথার উপর দিয়ে তাকাল জুনেস্কি। 'পানির ওভারহেড ট্যাঙ্ক নাকি?'

মৃদু হাসল রানা। 'আরে না। রাশিয়ার মাটিতে ওটা একটা রাশিয়ান অবজারভেশন টাওয়ার।'

'সীমান্তের এত কাছে চলে এসেছি আমরা! বড়জোর এক কিলোমিটার হবে।'

'হ্যাঁ। গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে পারো এবার। ইমাত্রায় ফিরে গিয়ে হোটেলে নাম লেখাই চলো।'

'হোটেলে?' বিস্মিতভাবে জানতে চাইল জুনেস্কি। 'কার না বাড়িতে ওঠার কথা ছিল আমাদের?'

'তাই উঠব। তবে হোটেলে নাম লেখাবারও দরকার আছে।'

রানার সাথে থাকলেও উদ্বেগ বা অস্বস্তি স্পর্শ করেনি জুনেস্কিকে। পপকিনের সাথে গোপন বৈঠকে আলোচনার সময় প্রথমেই বেঁকে বসেছিল সে, স্পষ্ট ভাবে বসকে জানিয়ে দিয়েছিল রানার সঙ্গী হিসেবে এই অভিযানে যেতে সে রাজি নয় কিন্তু পপকিন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করিয়েছে তাকে বসের যুক্তিটা খণ্ডন করতে পারেনি সে। রানাকে খুন করার কোন চেষ্টা তাকে করতে হবে না, শুধু চোখ কান খোলা রেখে সাথে থাকতে হবে, কাগজপত্র কেউ কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে তা ঠেকাতে হবে—এর মধ্যে রানার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র নেই। ভেবে-চিন্তে রাজি হয়ে গেছে জুনেস্কি। যা করবার পপকিন নিজেই করবে কাজ উদ্ধারের পর।

পরবর্তী বৈঠকে রানাও উপস্থিত ছিল। এই বৈঠকে শুধু রানার ভবিষ্যৎই ছিল আলোচ্য বিষয়। থিসিস উদ্ধার-পর্ব শেষ হলেই লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হবে ওকে, জানিয়েছে পপকিন। ওখানে বিখ্যাত একজন প্লাস্টিক সার্জেন নিখুঁতভাবে রানার আগের চেহারা ফিরিয়ে দেবেন। একজন সাইকিয়াট্রিস্ট ফিরিয়ে দেবেন স্মৃতি। দিন পনেরো ক্লিনিকে থাকতে হবে ওকে। তারপর সোজা তেল আবিবে ফিরে গিয়ে হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করবে। বসকে গড় গড় করে এক গাদা মিথ্যে কথা বলতে শুনে মনে মনে হেসেছে জুনেস্কি।

সামনে রাস্তার চওড়া একটা জায়গায় এসে ডাটসন প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলল জুনেস্কি। ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে নিচ্ছে গাড়িটা। 'এ ধরনের টাওয়ার আরও আছে নাকি এদিকে?'

'শুধু এদিকে নয়, গোটা সীমান্ত জুড়ে খানিক পরপর দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো,' বলল রানা। 'আমার সন্দেহ, নানান ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের মাধ্যমে একটার সাথে আরেকটার যোগাযোগ আছে। টাওয়ারের ওপরে ওরা যারা আছে, প্রতিটি শব্দ এবং পায়ের দাগ রেকর্ড করতে পারে।' আকাশ ছোঁয়া টাওয়ারটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল ও। 'রাশানরা সাংঘাতিক সন্দেহপ্রবণ—পাঁচিলের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে প্রতিবেশীর ঘরের ভিতরটা পর্যন্ত দেখে নিতে চায়। মজার লোক এই রাশানরা!'

কথা বলছে না জুনেস্কি। কিভাবে যেন বর্ডার ক্রস করার কথা ওদের? মনে করতে চেষ্টা করছে সে। ও, হ্যাঁ কার সাথে যেন দেখা করতে হবে, সে-ই সব ব্যবস্থা করবে। লোকটা নাকি ঘোরতর রাশান বিদ্বেষী। কিন্তু টাওয়ারগুলোর শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে সে আমাদেরকে ওপারে নিয়ে যাবে? উৎকণ্ঠা বাড়ছে তার। আড়চোখে দেখে নিল একবার রানাকে। দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নেই লোকটার চেহারায়। পুরোমাত্রায় উপভোগ করছে সে ভ্রমণটা। নার্ভ বটে, ইস্পাতের তৈরি।

রানার নির্দেশ মত ঘুরপথে ইমাত্রায় ফিরে এল সে। হোটেলের বাইরে থামাল নীল ডাটসন। পুরানো আমলের মস্ত এক বিল্ডিং পাথর দিয়ে গড়া, এখানে সেখানে মাথা উঁচু করে আকাশচুম্বি টাওয়ার, ঝুলবারান্দা, খিলান। ওয়াল্ট ডিজনীর নকশা করা রূপকথার দুর্গের মত।

হোটেলের প্রবেশ পথেই বিস্ময়। মস্ত খিলানের নিচে দিয়ে যেতে হয়। পাথরের গায়ে খোদাই করা হয়েছে পৌরাণিক জীব-জানোয়ার। গাঢ় রঙের মসৃণ, চকচকে কাঠের আবরণ দিয়ে মোড়া, মেঝে থেকে সাত ফিট পর্যন্ত দু'পাশের দেয়াল। রিসেপশন ডেস্কে গিয়ে দোতলার সর্ব ডানের ঘরটা চাইল রানা। খাতায় নাম রেজিস্ট্রি করে পাসপোর্ট জমা দিয়ে এলিভেটরে চড়ল ওরা। ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে সাথে যাচ্ছে একজন পোর্টার।

করিডর ধরে এগিয়ে ডানদিকের শেষ দরজার তালা খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে একপাশে সরে দাঁড়াল পোর্টার। ভিতরে ঢুকল রানা, পিছু পিছু জুনেস্কি। কাঠের প্যানেল দিয়ে মোড়া ছোট্ট একটা প্যাসেজ, তারপর বিরাট একটা গোলাকার

বেডরুম। 'বাঁ দিকের বিছানাটা আমার,' পোর্টারকে বকশিশ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

নিজের চারদিকে মুগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে জুনেস্কি। 'ভাবছি, এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করবে কিনা! এমন সুন্দর সাজানো কামরা বড় একটা দেখা যায় না।'

রেফ্রিজারেটরের দিকে এগোল রানা। 'উনিশশো দুই সালে ফিনল্যান্ড যখন রাশিয়ার একটা অংশ ছিল তখন তৈরি করা হয় এই ভি আই পি ইনস। রাশিয়ার অংশ ছিল, একথা অবশ্য ফিনরা স্বীকারই করতে চায় না। সে যাই হোক, সেন্ট পিটার্সবার্গের অভিজাত ধনীদের লীলাক্ষেত্র ছিল এই ইমাত্রা। স্বয়ং জার এই হোটেলে এসে উঠতেন, সম্ভবত আমাদের এই কামরাটিতেই।'

'আরে বাপ্স।'

জুনেস্কি এখনও মুগ্ধ চোখে দেখছে কামরাটা। চারদিকে মেঝে থেকে সিলিং-ছোঁয়া জানালা। ছয়টা ইজিচেয়ার, সাথে পালিশ করা লম্বা, নিচু কাঠের টেবিল একটা করে। সামান্য একটু দেয়াল যাও বা আছে, ভাল্লুক, হরিণ আর বাঘের চামড়া দিয়ে পুরোটা মোড়া। জানালার সামনে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে জুনেস্কি।

রেফ্রিজারেটর থেকে একটা একটা করে বোতল বের করে দেখছে রানা। 'এটা সুইডিশ, চলবে না। কোসকেনকোরভা, স্থানীয় জিনিস। দুত্তোরি ছাই, বিয়ার নেই নাকি! এই যে আছে…'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল জুনেস্কি। আধ গ্যালন বিয়ার ভর্তি মস্ত একটা বোতল বগলদাবা করে তার দিকে এগিয়ে আসছে রানা। হাতে দুটো গ্লাস।

ঘাড় ফিরিয়ে আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জুনেস্কি। জানালার কার্নিস থেকে তুলে নিল একটা বিনকিউলার। ওর পাশে এসে দাঁড়াল রানা, বিনকিউলারটা ওকে দেখাল সে, 'নিশ্চয়ই ভুলে কেউ ফেলে গেছে এটা।'

'দেখি?' জানালার কার্নিসে বোতল আর গ্লাস দুটো নামিয়ে রাখল রানা। জুনেস্কির হাত থেকে বিনকিউলারটা নিল। নেড়েচেড়ে দেখে উৎসাহের সাথে বলল, 'বাহ, চমৎকার জিনিস। যাক। একটা কিছু উপরি-পাওয়া হলো। সৌখিন জিনিস, এটা বরং আমার হেফাজতেই থাক।'

ম্লান হয়ে গেল জুনেস্কির মুখ। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসটা এভাবে হাতছাড়া হয়ে যাবে, ভাবেনি সে। প্রতিবাদের সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রানা তখন অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে।

বিনকিউলার চোখে তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল ও, 'চিমনিগুলো দেখতে পাচ্ছ?' চোখ থেকে বিনকিউলারটা নামিয়ে ও বাড়িয়ে দিল জুনেস্কির দিকে।

দূরে তাকাল জুনেস্কি! 'হ্যাঁ।' চোখে বিনকিউলার থাকায় চিমনিগুলোর প্রতিটি ইঁট পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে।

গ্লাসে বিয়ার ঢালছে রানা। 'স্ট্যালিনের আঙুল,' বলল রানা। 'এই নামেই পরিচিত ওই জায়গা। ভাল নাম সভেতোগোরস্ক।'

'মাই গড!' বিস্মিত জুনেস্কি বলল, 'এত কাছে, ইমাত্রার মধ্যেই মনে হচ্ছে।'

ধীরে ধীরে চোখ থেকে বিনকিউলারটা নামাল সে। 'স্ট্যালিনের কথা কি যেন বলছিলেন?'

'স্ট্যালিনের আঙুল—স্থানীয়দের দেয়া নাম। এই নামকরণের পিছনে ছোট্ট একটা ইতিহাসও আছে।'

'তাও জানেন আপনি?' ভুরু কপালে উঠল জুনেস্কির

'ফাইলটা পড়লে তুমিও জানতে পারতে,' বলল রানা। জুনেস্কির হাতে বিয়ার ভর্তি একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল, মৃদু চুমুক দিল নিজেরটায়। 'যুদ্ধের পর রাশানরা সীমান্তরেখা সামনে বাড়িয়ে আনতে চাওয়ায় দুই পক্ষ একটা বৈঠকে বসে। সভেতোগোরস্ক-বা এনসো কাগজশিল্পে সমৃদ্ধ সুন্দর একটা ছোট্ট শহর। একজন রাশিয়ান কলম দিয়ে নতুন সীমান্তরেখা আঁকছিল একটা ম্যাপে, কিন্তু এনসোতে পৌঁছে সে দেখল ম্যাপের ওই জায়গায় একটা আঙুল রেখে তার জন্যে অপেক্ষা করছেন স্ট্যালিন। মুখ তুলে স্ট্যালিনের দিকে তাকাল সে। উত্তরে নিঃশব্দে হাসলেন স্ট্যালিন। সুতরাং, কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্ট্যালিনের আঙুলের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে রেখা আঁকল সে। সেই থেকে এনসো রাশিয়ার অংশ হয়ে গেল।'

'দ্য ওল্ড বাস্টার্ড,' অন্যমনস্কভাবে বলল জুনেস্কি। একটু লজ্জিত ভাবে হাসল সে। 'ডক্টর ফিলাতভ, বসের কথা তো শুনিইনি, ফাইল নাড়াচাড়া করারও উৎসাহ নেই আমার। কিন্তু ঠিক কিভাবে বর্ডার ক্রস করব ভেবে পাচ্ছি না। আবছা ভাবে মনে আছে একটা পলিটিক্যাল সিচুয়েশনের সুযোগ নিতে বলেছেন বস্। কিন্তু...'

'গোটা ব্যাপারটা তোমার জানা দরকার,' গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বলল রানা। 'ব্রীফকেসটা দাও আমাকে।'

ঢক ঢক করে গ্লাসটা নিঃশেষ করল জুনেস্কি। দরজার কাছ থেকে ব্রীফকেসটা তুলে নিয়ে টেবিলের কাছে ফিরে এল সে। তার হাত থেকে সেটা নিয়ে টেবিলে নামিয়ে রাখল রানা। একটা ইজিচেয়ারে বসল। জুনেস্কিও বসল ওর সামনের চেয়ারে।

'মনে রাখবে, ফিনদের সাথে কথা বলার সময় সভেতোগোরস্ককে ওই নামে উল্লেখ করা চলবে না, এনসো বলতে হবে,' পাইপে আগুন ধরিয়ে বলল রানা। 'সভেতোগোরস্ক বললে বেঁকে বসবে ওরা, শত অনুরোধেও আর সহযোগিতা করতে রাজি হবে না। এ-ব্যাপারে সাংঘাতিক সেন্টিমেন্টাল ওরা।'

'তা বুঝতে পারছি।'

'কচু পারছ,' বলল রানা। 'সবটুকু শোনো আগে, তবে বুঝবে। আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে Lonnrot নামে এক লোক একগাদা লোকগীতি সংগ্রহ করে সেগুলোকে ছন্দ মেলানো পদ্যের আকারে সাজিয়ে ফেলে—তারই নাম ক্যালেভেলা, ফিনিশদের জাতীয় মহাকাব্য। ফিনিশদের প্রধান সাহিত্যকর্ম বলতে এটাকেই বোঝায়। আধুনিক ফিনিশ সংস্কৃতির ভিত এই মহাকাব্য।'

'ইন্টারেস্টিং,' বলল জুনেস্কি। 'কিন্তু এর সাথে আমাদের সম্পর্ক কি?'

'শুনে যাও শুধু,' বিরক্তির সুরে বলল রানা। 'ক্যালেভেলার প্রধান পটভূমি হলো ক্যারেলিয়া, এখন সে জায়গা রাশিয়ার দখলে। ক্যালেভেলার গ্রামটাও এখন

রাশিয়ান,' তর্জনী দিয়ে নাকের একটা পাশ ঘষছে রানা। 'ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম : ফ্রেঞ্চরা যেন কর্নওয়াল আর নটিংহামশায়ার দখল করে নিয়েছে, সেই সাথে ইংরেজদের নিজস্ব সম্পদ রাজা আর্থার এবং রবিন হুডের কিংবদন্তীগুলোর একচ্ছত্র মালিক বনে গেছে। এখানকার ব্যাপারটা আরও গুরুতর, ফিনিশরা এ ব্যাপারে সবাই খেপে বোম হয়ে আছে।'

'এদের ধারণা তাদের জাতীয় ঐতিহ্যে থাবা বসিয়েছে রাশানরা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'এবার রাজনীতির কথা। যুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট প্যাসিকিভি নতুন ধরনের একটা পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করেন, যার মোদ্দা কথা কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, অনেকটা সুইডেনের মত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা তা নয়। নিরপেক্ষতা বজায় আছে বটে, তবে তা রাশিয়ার স্বার্থে। বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে কিছুই করা বা বলা চলবে না। এই পররাষ্ট্র নীতি প্যাসিকিভি লাইন হিসেবে পরিচিত। বর্তমান প্রেসিডেন্ট কেককোনেনও এই প্যাসিকিভি লাইনের অনুসারী।'

চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েও উঠল না রানা। জুনেস্কি ওকে উঠতে দেখে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তার হাতে গ্লাসটা দিয়ে আবার ইজি চেয়ারে হেলান দিল ও। বিয়ার ভর্তি করে গ্লাসটা ফিরিয়ে এনে দিল জুনেস্কি। পর পর কয়েকটা চুমুক দিয়ে আবার শুরু করল রানা, 'প্যাসিকিভি লাইন সমর্থন করে না এমন কিছু ফিনদের সাথে একটু পর দেখা করতে যাব আমরা। এরা কট্টর দক্ষিণপন্থী, যাকে বলে প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু এদের সাহায্য ছাড়া সীমান্তের ওপারে, এনসোতে যাবার কোন উপায় আমাদের হাতে আপাতত নেই। কেককোনেন যদি জানতে পারে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি আমরা, দু'চার গোছা চুল যা আছে মাথায়, সব রাতারাতি পেকে সাদা হয়ে যাবে তার। রাশিয়ার সাথে চমৎকার সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে সে, কোনমতেই চাইবে না সীমান্তে এমন কিছু ঘটুক যার ফলে রাশিয়া শাস্তিস্বরূপ বেয়াড়া কোন আবদার করে বসতে পারে। তা আমরাও চাই না। সুতরাং ফিনদের সাথে নরম সুরে কথা বলব আমরা, এবং এনসোয় পা দিয়ে নরম পায়ে হাঁটব।'

ধীরে ধীরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল জুনেস্কি।

হঠাৎ তীব্র চোখে তাকাল রানা, ধারাল গলায় বলল, 'আর একটা কথা। ওপারে যদি আমরা ধরা পড়ি, সমস্ত দায় দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে হবে—একজন ফিনকেও জড়ানো চলবে না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা, সুতরাং ভুলেও ভুলে যেয়ো না।'

'ভুলব না,' নরম গলায় বলল জুনেস্কি।

'অবশ্য, ধরা পড়ব না এই আশা নিয়েই ওপারে যাচ্ছি আমরা,' টেবিল থেকে ব্রীফকেসটা তুলে কোলের উপর নামাল রানা। খুলল সেটা। ভিতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল। 'এটা এনসোর স্ট্রীট প্ল্যান, উনিশশো উনচল্লিশ সালের তৈরি।' ভাঁজ খুলে ম্যাপটা টেবিলের উপর বিছাল। সেটার গায়ে একটা আঙুল বুলিয়ে কি যেন খুঁজছে, আঙুলটা নামতে শুরু করল নিচের দিকে। 'এই যে, পেয়েছি। এই বাড়িটাতে থাকেন ডক্টর ফিলাতভের বাবার, অর্থাৎ বুড়ো নিকোলাই ফিলাতভের বন্ধু প্রফেসর স্যানিকিনিন। বৃদ্ধ এক পা বাড়িয়ে আছেন পরপারের

দিকে, ইতিমধ্যে যদি রওনা হয়ে গিয়ে না থাকেন। প্রথমে এই বৃদ্ধের কাছে যেতে হবে আমাদের। একমাত্র তিনিই জানেন নিকোলাই ফিলাতভ কোথায় রেখে গেছেন তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফর্মুলা। নিকোলাই ফর্মুলাটা যখন মাটিতে পোঁতেন, স্যানিকিনিন তখন একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।'

'এবং নিকোলাই ফিলাতভের পুত্র ডক্টর ফিলাতভকে ছাড়া তিনি সে-তথ্য আর কাউকে জানাবেন না,' নিস্তেজ গলায় বলল জুনেস্কি।

'বাহ্, এই তো সব মনে করতে পারছ!' মুচকি হেসে বলল রানা। গ্লাসটা নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়াল ও। 'চলো, এবার আমাদের বেরিয়ে পড়ার সময় হয়েছে।'

নয়

পনেরো মিনিট পর শহরতলির একটা বাড়িতে ফিনদের সাথে বৈঠক হলো ওদের। পথেই গাড়ি চালাতে চালাতে জুনেস্কিকে বলেছে রানা, 'ওরা পাঁচজন লোক সাহায্য করছে আমাদেরকে। ক্যাসি ভারতানেন, তার ছেলে তার্মো, এবং ফোরম্যান হেইকী হুভিনেন, বাকি দু'জনের নাম এখনও জানি না আমি।'

'নামগুলো মুখস্থ করার দরকার নেই?'

'নেই মানে? তোমার বাপ আমি—ক্যাসি ভারতানেন। তুমি আমার ছেলে, তার্মো ভারতানেন। আমাদের ফোরম্যান হেইকী হুভিনেন। রাশান সীমান্ত বা সীমান্তের ওপারে প্রশ্ন করা হতে পারে, তখন যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলো, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স চিরকালের জন্যে হারাবে তোমাকে।'

'হুঁ।'

'আর একটা কথা,' বলল রানা। 'সাবধান, এই তিনজনের সাথে আলাপের সময় নাম উচ্চারণে ভুল-ভাল করে বসলে বিপদে পড়বে। রসিকতা বোঝে না ওরা সুতরাং ঠাট্টা-মস্করাও করতে যেয়ো না। বরং, মুখ বুজে থেকো। বুড়ো ভারতানেন যুদ্ধের সময় ফাইটার পাইলট ছিল, এখনও তার ধারণা যুদ্ধে জার্মানরা জিতে গেলেই ভাল হত।'

'বলেন কি!'

'রাশানদের ঘৃণা করতে হবে, তাই নাজীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত সম্ভবত এই ধরনের যুক্তিতে বিশ্বাসী ওরা। যাই হোক এত কথা এই জন্যে বলছি, যে কোন অবস্থাতেই ওদেরকে অসন্তুষ্ট করা চলবে না। এরাই আমাদের একমাত্র সহায়।'

'মনে থাকবে,' বলল জুনেস্কি। 'প্ল্যানটা কি বলবেন?'

'ফিনদের রয়েছে কাগজের মিল তৈরি করার ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা,' বলল রানা। 'ওদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার জন্যে রাশানরাও আগ্রহী। এনসোতে

তারা নতুন একটা মিল তৈরি করছে। যন্ত্রপাতি সবই ফিনদের, ফিনরাই খেটেপিটে মিলটাকে দাঁড় করাচ্ছে। কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিক—প্রায় সবাই এই ইমাত্রার লোক। প্রত্যেকদিন সকালে সীমান্ত পেরিয়ে ওপারের মিলে কাজ করতে যায় একদল লোক। ফিরে আসে পরদিন সকালে।'

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল জুনেস্কির। 'এবং তাদের সাথে আমরাও যাব, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কিন্তু আনন্দে বগল বাজাবার কিছু নেই। যত সহজ ভাবছ ব্যাপারটা তত সহজ নয়।' হাত তুলে দেখাল রানা। 'ওই যে, ক্যাসি ভারতানেনের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে।' রাস্তার একধারে গাড়ি থামাল রানা।

দু'পাশে উঁচু ঝোপ-ঝাড় মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা একটা সরু পথ গেছে বাড়িটার দরজা পর্যন্ত। এইটুকু পথ হেঁটে পেরোতে হবে।

'এরা তিনজন সীমান্ত পেরিয়ে এনসোয় যায়?'

'হ্যাঁ।'

একটু চিন্তা করল জুনেস্কি, তারপর বলল, 'এতই যদি ঘৃণা করে রাশানদের, সাহায্য করতে যায় কেন তাহলে?'

'একটা গুপ্তসংস্থার সদস্য এরা, সংস্থার লক্ষ্য একদিন না একদিন রাশিয়ার মুঠো থেকে তারা এনসোকে ছিনিয়ে নেবেই। এই সংস্থার নির্দেশে সাহায্য করার নাম করে গোয়েন্দাগিরিও করতে যায় এরা।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার ধারণা, কোন আশা নেই এদের। বর্তমান সরকারই এদেরকে বিনাশ করবে।'

ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল ফিনরা। একটা গোল টেবিলকে ঘিরে বসে আছে পাঁচজন লোক। কামরায় ঢুকেই রানা প্রশ্ন করল, 'তোমাদের মধ্যে ক্যাসি ভারতানেন কে?'

পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের কঠোর চেহারার একজন লোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আমি,' একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে সে, এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল।

নিজের পরিচয় দিয়ে বলল রানা, 'দু'জন লোকের কথা বলা ছিল, তারা তৈরি?'

'হ্যাঁ, তৈরি।' টেবিলের দিকে তাকাল ক্যাসি ভারতানেন। 'তানিন, ফোবিন।'

চেয়ার ছেড়ে তাগড়া দুই লোক সটান উঠে দাঁড়াল। চেহারার সাথে কোন মিল না থাকলেও শরীরের কাঠামো রানা এবং জুনেস্কির সাথে বেশ মিলে যায়। সামনে এসে দাঁড়াল তারা। খুঁটিয়ে দেখল রানা দু'জনকে। 'জুনেস্কি, টুপি, জুতো, গগলস, কাপড়চোপড়—সব খুলে ফেলো।' তানিনের দিকে ফিরল রানা। 'ওরগুলো তুমি পরে নাও।' এরপর তাকাল ফোবিনের দিকে। 'তুমি আমারগুলো পরবে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে সুটকেস খুলে নিজের এবং রানার দু'সেট পোশাক বের করছে জুনেস্কি।

কি করতে হবে সব তানিন এবং ফোবিনকে বুঝিয়ে বলল রানা। 'মুখ ঢেকে ঢুকবে হোটেলে। দোতলার সর্ব ডানের কামরাটা তোমাদের। ঢুকে ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে দেবে। হোটেল ম্যানেজমেন্টকে বলা আছে, কেউ তোমাদেরকে বিরক্ত করবে না। তবু যদি কেউ নক্ করে, বলবে ডক্টর ফিলাতভ লেখাপড়ার জরুরী কাজে ব্যস্ত, দেখা হবে না।'

নিজের রিভলভারটা পকেট থেকে বের করে ফোবিনকে দিল রানা, 'এটা রাখো। কৌশলে বা জোর করে কেউ যদি কামরায় ঢুকতে চেষ্টা করে, চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করবে, দরকার হলে ফাঁকা গুলি করবে। মনে থাকে যেন, পালা করে সব সময়ই জেগে থাকবে একজন।

'যথেষ্ট খাবার রেখে এসেছি ওখানে,' একটু বিরতি নিয়ে বলল রানা। 'মদ পানি সিগারেট এইসবও প্রচুর আছে। আবার বলছি, কোন অবস্থাতেই বাইরে মুখ দেখাবে না। তোমরা কামরায় আছ এটা জানাবার জন্যে খুটখাট আওয়াজ করবে, তবে মাত্রা ছাড়িয়ে কিছু করার দরকার নেই। আমাদের গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছ তোমরা, হোটেলের সামনে পার্কিং লটে রাখবে ওটাকে।'

তানিন এবং ফোবিনকে বিদায় দিয়ে রানা তাকাল ক্যাসির দিকে। বলল, 'এবার আমাদের আসল আলোচনা শুরু হতে পারে।'

ক্যাসির ছেলে তার্মো ভারতানেনের বয়স ত্রিশ, সাদামাঠা চেহারা, কাঠিন্যের লেশমাত্র নেই। রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়ে চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে তার। হেইকী হুভিনেন খুব কম কথা বলে। বেঁটে-খাটো লোকটাকে দেখে কেন যেন পছন্দ হলো না রানার।

গোল টেবিলটাকে ঘিরে বসল ওরা। একটা ডিশে করে একগাদা খোলা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান স্যান্ডউইচ দিয়ে গেল ক্যাসির পৌনে তিনমনি বউ। আগেই টেবিলে জায়গা করে নিয়েছে এক ডজন বিয়ারের বোতল, তার পাশে দুটো রঙহীন ভদকার বোতল।

ঢকঢক করে পুরো একগ্লাস ভদকা গিলে তার্মো ভারতানেন বলল, 'হেইকী হুভিনেন ফর গডস সেক, গুম হয়ে বসে না থেকে কিছু একটা বলো, এত কিসের দুশ্চিন্তা, শুনি?'

হেইকীর দিকে ফিরল রানা। 'দুশ্চিন্তা?'

'কাজটা সহজ নয়,' মুখ তুলে বলল হেইকী।

'তা আমরা সবাই জানি,' বলল রানা। 'কঠিন বলেই না উপযুক্ত লোকদের কাছে সাহায্যের জন্যে এসেছি।'

তার্মোর বাবা ক্যাসি ভারতানেন সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক কথা।'

'তোমাদের কি,' মুখ হাঁড়ি করে বলল হেইকী। 'তোমাদেরকে তো আর ওখানে থাকতে হচ্ছে না। বিপদ যদি ঘটে, পুরো দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে আমাকে।' রানার দিকে তাকাল সে। 'আগামী দু'দিনের মধ্যে এ কাজ সম্ভব নয়।'

মৃদু গলায় জানতে চাইল রানা, 'কেন?'

'আপনি এবং আপনার সঙ্গী ভারতানেনদের বদলে ওপারে যাবেন, তাই না? কিন্তু ফোরম্যান হিসেবে আমি জানি ক্যাসিকে আগামী কাল স্ক্রিনিং প্লেটে জরুরী কাজ করতে হবে। ক্যাসিকে যদি কাজে যেতে হয়, তার্মোকেও যেতে হবে। রাতটা থেকে পরদিন সকালে ওরা ফিরবে। আবার তার পরদিন সকালে যাবার কথা ওদের, সেদিন হয়তো ওদের বদলে আপনারা যেতে পারেন।'

'হয়তো?'

'মিলে যদি তেমন জরুরী কোন কাজ না থাকে ওদের,' বলল হেইকী। 'কাজ না থাকলেও ওদের অনুপস্থিতির জন্যে কৈফিয়ত দিতে জান বেরিয়ে যাবে আমার...'

পরিষ্কার বোঝা গেল, ভয় পেয়েছে হেইকী। কিন্তু রানার অন্য রকম সন্দেহ হলো। ক্যাসির দিকে তাকাল ও। 'তুমি কি বলো?'

খানিক ইতস্তত করে ক্যাসি বলল, 'হেইকীর কথার মধ্যে যুক্তি যে নেই, তা নয়।' হেইকীর দিকে ফিরল সে। 'কিন্তু তুমি তো ইচ্ছা করলেই আগামীকাল যাতে স্ক্রিনিং প্লেটে কাজ না হয় তার ব্যবস্থা করতে পারো, হেইকী? ধরো, ছোটখাট স্যাবোটেজ...'

'অসম্ভব। কক্ষনো তা পারি না।' দ্রুত এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছে হেইকী। 'জর্জিয়ান কুত্তার বাচ্চা জোজোভস্কি থাকতে তা কখনও সম্ভব নয়। ধরা পড়ে যেতে হবে।'

'কে সে?' প্রশ্ন করল রানা।

'রাশানদের চীফ ইঞ্জিনিয়ার। মিল চালু হলে দায়িত্ব নেবে সে, কিন্তু এখন থেকেই খুঁটিনাটি সব নখদর্পণে রাখার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা মিলে ঘুরঘুর করে বেড়ায়।'

'ধ্বংসাত্মক কিছু করার ঘোর বিরোধী আমিও,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'তবে দুটো দিন অপেক্ষা করতেও চাই না।'

'এছাড়া উপায় নেই,' বলল হেইকী।

মৃদু হাসল রানা। বলল, 'তুমি ফোরম্যান, তাই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তোমার ওপর নির্ভর করছে। বুঝতে পারছি দর কষাকষি করতে চাইছ নতুন করে। বেশ তো, কত পেলে সন্তুষ্ট হবে, বলো। নগদ নারায়ণ না হয় দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়া যাবে।'

গাম্ভীর্য খসে পড়ল হেইকীর চেহারা থেকে। এই প্রথম হাসল সে। 'এখন আমার মনে হচ্ছে, চেষ্টা করলে আগামীকালই আপনারা যেতে পারবেন।'

'বাসে আর যারা থাকবে, আমাদেরকে দেখে অবাক হবে না?' জানতে চাইল রানা।

'এ ব্যাপারে যাতে মাথা না ঘামায় তার ব্যবস্থা করা হবে,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হেইকী হুভিনেন। 'তারা সবাই ফিন,' গর্বে ফুলে উঠল তার বুক। 'তারা সবাই ক্যারেলিয়ানস্।'

'এবং তুমি একজন ফোরম্যান।'

সহাস্যে মাথা ঝাঁকাল হেইকী। 'ঠিক, সেটাও একটা ব্যাপার বটে।'

দুই ভারতানেনের দিকে তাকাল রানা। 'আমরা রওনা হবার পর দু'দিন তোমরা এই বাড়ি থেকে বেরোবে না। একই সাথে ইমাত্রা এবং এনসোয় কিভাবে থাকো তোমরা, কারও মনে এ প্রশ্ন জাগুক তা আমি চাই না।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল তার্মো। ভদকার বোতলে টোকা মেরে বলল, 'এই জিনিস প্রচুর রেখে যাবেন, তাহলে বাইরে বেরুবার নামও করব না আমরা।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। তাই দেখে তার্মোর বাবা বলল, 'চিন্তা করবেন না। দরজা জানালা বন্ধ করে বাড়ির ভিতরই থাকব আমরা।'

'গুড,' বলল রানা। 'কাপড়চোপড় সব যোগাড় হয়েছে তো?'

'সব।'

পকেট থেকে ভাঁজ করা দুটো কার্ড বের করল রানা। 'এগুলো আমাদের পাস। দেখো তো, ঠিক আছে কিনা।'

রানার হাত থেকে হেইকী কার্ড দুটো নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল প্রথমে। তারপর নিজের পাসটা বের করে কোথাও কোন অমিল আছে কিনা চেক করল। বলল, 'নিখুঁত। কোন ত্রুটি নেই। দেখতে নতুন লাগছে।'

'যাতে পুরানো দেখায় তার ব্যবস্থা করা যাবে।'

'অবশ্য কিছু এসে যায় না,' কাঁধ ঝাঁকাল হেইকী। 'সীমান্তের গার্ডরা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। আজকাল প্রায়ই না দেখে ছেড়ে দেয়।'

'দেখতে না চাইলেই ভাল আমাদের জন্যে,' শুকনো গলায় বলল রানা।

ক্যাসি ভারতানেন রানার গ্লাসে ভদকা ঢালছে। 'মি. ফরেনার, আমরা জানি না, ঠিক কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা ওপারে যাচ্ছেন, তবে এটুকু জানি যে রাশানদের উপকার করতে যাচ্ছেন না—এতেই আমরা সন্তুষ্ট।'

মৃদু হেসে বলল রানা, 'উপকার বা অপকার কোনটাই করতে যাচ্ছি না আমরা। ব্যক্তিগতভাবে এটুকু বলতে পারি, একজন খাঁটি ফিনের শেষ ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে এই ঝুঁকিটা নিতে যাচ্ছি আমরা। অনুরোধ করছি, এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না তোমরা।'

দশ

সকাল সাড়ে ছয়টা। ভেড়ার পালের মত একগাদা শ্রমিককে নিয়ে নির্জন গেঁয়ো পথ ধরে ধীর গতিতে ছুটে চলেছে বাস। রাস্তার দু'পাশে ঝোপ-ঝাড়, কখনও খেত-খামার। খুবই সরু রাস্তা, পাশাপাশি দুটো গাড়ির জায়গা হবে না। উল্টো দিক থেকে কোন গাড়িকে আসতে দেখলে রাস্তা থেকে নেমে যেতে হবে বাসকে। এই মুহূর্তে রাস্তার সামনে পিছনে অবশ্য কোন যানবাহন নেই। ড্রাইভার খাঁটি ফিন, রাশিয়া তার দু'চোখের বিষ হলেও, ভদকার একনিষ্ঠ ভক্ত সে। দু'বোতল গলায় না ঢেলে ড্রাইভিং সীটে চড়ে না। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অশান্ত সাগরের ঢেউয়ের মাথায় নৌকোর মত এদিক ওদিক কাত হয়ে পড়ছে মান্ধাতা আমলের ঝক্কর মার্কা বাসটা, তবে এগোচ্ছে।

বাসের ভিতর মহা শোরগোল তালি মারা নোংরা পোশাক পরা শ্রমিকদের চেঁচামেচি, হো-হো হাসি, মদ আর তামাকের গন্ধ—শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ তবু রক্ষে, বেশ শীত শীত লাগছে। টোকা মারলে একরাশ ধুলো উড়বে রানার গায়ের কোটটা থেকে, অসংখ্য তালিও দেখা যাচ্ছে এখানে সেখানে—টেনেটুনে করে সেটাকে গায়ে জড়িয়ে নিল ও। পাশে বসা জুনেস্কি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। অবজারভেশন টাওয়ারটা একেবারে কাছে চলে এসেছে সামনেই নিষিদ্ধ সীমান্ত।

ঘামছে সে।

দুই সীট সামনে বসেছে হেইকী হুভিনেন। মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে, রানার চোখে তাকাল সে। মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। ভাবলেশহীন। কিন্তু রানার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বুঝে নিল হুভিনেনের উৎকণ্ঠা। বিরক্ত বোধ করল। প্রায় সারারাতই লোকটা মদ গিলেছে। ফলাফল: এখন এই আত্মবিশ্বাসের অভাব।

অকস্মাৎ প্রতিবাদের সুরে চেঁচামেচি করে উঠেই থেমে গেল বাসের চাকাগুলো। দাঁড়িয়ে পড়েছে বাস। মাথা উঁচু করে সামনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ফিনিশ ইউনিফর্ম পরা একজন সৈনিক হেঁটে আসছে। জানালার সামনে দাঁড়াল সে। দু'একটা কথা বলল ড্রাইভারের সাথে। হাসছে। হাত নেড়ে এগিয়ে যেতে বলছে। একটা ঝাঁকুনির সাথে গতি সঞ্চার হলো আবার বাসে।

কোটের পকেট থেকে টোবাকো পাইপটা বের করে তাতে স্থির হাতে তামাক ভরছে রানা। কনুই দিয়ে হঠাৎ পাঁজরে খোঁচা মারল জুনেস্কি। চমকে তাকাল রানার দিকে সে। 'হেইকীর কাছ থেকে নিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা তোমাকে দিলাম কেন? এক-আধটার সদ্ব্যবহার করো।'

সিগারেট আর বিষ, দুটোই সমান জুনেস্কির কাছে। রানার কথা শুনে প্যাঁচার মত বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। কিন্তু নির্দেশ অমান্য করতে সাহস হলো না। রাশান বর্ডার দিয়ে ভিতরে ঢুকছে ওরা, সম্ভাব্য সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করলে এ-যাত্রা হয়তো ফিরে আসতে পারবে। ওর কাছে আবার পিস্তলও রয়েছে, যদি ধরা পড়ে···। বাস দাঁড়িয়ে পড়ল আবার।

বুক পর্যন্ত জানালা দিয়ে বাইরে বের করে দিয়েছে ড্রাইভার। একজন সশস্ত্র রাশান বর্ডার-গার্ড দ্রুত এগিয়ে আসছে দেখে হাঁক ছেড়ে বলল সে, "kolmekymmentakuusi",' উত্তরে কসাক সৈনিক মাথা ঝাঁকাল। লাফ দিয়ে আরোহীদের দরজা দিয়ে চড়ল বাসে। কয়েক মুহূর্ত নড়ল না সে। তীক্ষ্ণ চোখে শ্রমিকদের মুখ দেখছে।

টের পেয়েছে কিছু? ভাবছে রানা। নাকি লোকটার স্বভাবই এইরকম? মাথাটা ঘুরতে শুরু করল ধীরে ধীরে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে মনের কথা পড়ার চেষ্টা করল রানা। মনে হচ্ছে, নিঃশব্দে শ্রমিকদের মাথা গুনছে সে। ধীরে ধীরে সরে আসছে তার দৃষ্টি ওর দিকে।

খস্ করে একটা কাঠি জ্বেলে পাইপে আগুন ধরাল রানা। সব হৈ-চৈ স্তব্ধ হয়ে গেছে। সৈনিকের উপস্থিতি সম্পর্কে সবাই সচেতন, কিন্তু কেউই তার দিকে সরাসরি তাকিয়ে নেই। সাধারণ শ্রমিকরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, কারও চোখের দৃষ্টি সীমান্ত রক্ষীর যদি পছন্দ না হয়, খামোকা বাস থেকে নামিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখবে সারাটা দিন ও রাত। বসে থাকতে হবে এইজন্যে যে বাসটা রয়ে যায় এনসোতে, পরদিন ভোর ছ'টার আগে ফেরে না ইমাত্রায়। বসে থাকতে না চাইলে পায়ে হেঁটে খালি পকেটে ফিরতে হবে বাড়িতে। প্রতিবাদ করে লাভ নেই, বরং ক্ষতি—সীমান্ত পেরোবার মাসিক পাসটা বাতিল করে দেবে। বরাত মন্দ হলে পিটুনিও খেতে হবে।

পাইপের মাথাটা দুই হাতের তালু দিয়ে ঘিরে রেখেছে রানা, তাতে ওর মুখের নিচের দিকটা পুরোপুরি আড়াল পেয়েছে। নাক মুখ থেকে গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে ও স্মোকস্ক্রিন তৈরি করার। কৌশলটা দ্রুত অনুকরণ করছে জুনেস্কি। সিগারেট ধরাতে প্রচুর সময় নিচ্ছে। বাতাসের ধাক্কা থেকে কাঠির আগুনটাকে জিইয়ে রাখতেই গলদঘর্ম হচ্ছে সে।

অদ্ভুত লোক বটে কসাক সৈন্যটা। ভাবল রানা। মাথা গোনা শেষ করে ঘুরল না সে, বাসের ভিতর দিকে মুখ করেই পিছিয়ে যাচ্ছে। সিঁড়ির ধাপ তিনটে টপকে নেমে গেল নিচে। সাথে সাথে ড্রাইভার ছেড়ে দিল বাস।

ফ্রন্টিয়ার পোস্টের পাশ ঘেঁষে মন্থর গতিতে এগোচ্ছে এখন। একজন রাশভারী চেহারার অফিসারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জানালার বাইরে থেকে মাথাটা ভিতরে ঢুকিয়ে নিল জুনেস্কি। তলপেটের কাছে পেশীগুলোয় হঠাৎ টান পড়ল তার। সে এখন রাশিয়ায়। ঢোক গিলে আড়চোখে তাকাল রানার দিকে। দিব্যি পাইপ টানছে রানা। মুখটা হাসি হাসি। উদ্বেগের কোন চিহ্নমাত্র নেই ওর চেহারায়। নার্ভ বটে শালার! মনে মনে স্বীকার না করে পারল না জুনেস্কি।

মাথার উপর কালো ধোঁয়ার মেঘ নিয়ে এনসোর মেইন রোড ধরে ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাস। চারদিকের উঁচু চিমনিগুলো থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে ঢেকে দিচ্ছে আকাশটাকে। কয়েকবার বাঁক নিল বাসটা। শিল্পশহর, কিন্তু রাস্তা প্রায় ফাঁকা, জনশূন্য। মস্ত একটা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল ড্রাইভার। অস্বাভাবিক লম্বা, তেমনি উঁচু একটা ফ্যাক্টরি বিল্ডিঙের সামনে বাসটাকে দাঁড় করাল। যে-যার জিনিসপত্র তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। হেইকীর দিকে তাকাল রানা। মাথা ঝাঁকাল সে। জুনেস্কির পাঁজরে কনুইয়ের খোঁচা মেরে উঠে দাঁড়াল রানা, নামার জন্যে হেইকীর পিছনে লাইন দিল।

গেট দিয়ে মিলে ঢুকল ওরা। শ্রমিকরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। হেইকীর পিছু পিছু মস্ত একটা হলঘরে ঢুকল রানা আর জুনেস্কি। চারদিকে যা দেখতে পাচ্ছে, শুধু অপরিচিত নয়, রীতিমত বিস্ময়কর ঠেকছে রানার কাছে। বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে প্রকাণ্ড একটা মেশিনের শেষ প্রান্তে গিয়ে থামল ওরা। কেউ নেই আশপাশে। একটু একটু ঘামছে হেইকী। 'সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছি,' চোরের মত চণ্ডমুণ্ড করছে সে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' চাপা গলায় বলল রানা। 'এখন কি করতে হবে তাই বলো।'

'একটা ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে,' বলল হেইকী। 'জোজোভস্কিকে কাজের ফিরিস্তি দিতে লাগবে পনেরো মিনিট। তারপর আধঘণ্টা তার চোখের সামনে থেকে কাজ তদারক করতে হবে আমাকে। এর পর তাকে এটা সেটা বুঝিয়ে দিতেও সময় নষ্ট হবে। এক ঘণ্টা পর, যদি এখান থেকে নড়ে সে, তখন আপনাদেরকে বের করে দিতে পারব।'

'এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা। 'কোথায়?'

হাত তুলে মেশিনটা দেখাল হেইকী। 'মেশিনের ভিতর ঢুকে পড়ুন, কোথাও গা

ঢাকা দিয়ে থাকুন।'

বিস্ময়কর মেশিনটার দিকে আবার তাকাল রানা। পুরোটা তৈরি হয়নি এখনও। এখনই এটার দৈর্ঘ্য তিনশো গজ, পঞ্চাশ ফিটের মত চওড়া। একনাগাড়ে কাঁচা মাল থেকে মণ্ড এবং মণ্ড থেকে কাগজ উৎপাদন করতে পারবে, এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে মেশিনটার ডিজাইন। উপর দিকে তাকাল রানা। সাড়ে তিন থেকে চার তলা বাড়ির মত উঁচু।

'কোট খুলে মাঝামাঝি কোথাও ঢুকে পড়ুন,' হেইকী বলল। 'কয়েক মিনিটের মধ্যে যদি সময় পাই কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে যাব আমি। ভিতরে কাউকে ঢুকতে দেখলে হাতুড়ি দিয়ে নাট বল্টু পেটাতে শুরু করবেন।'

মাথা তুলে একটা ক্রেনের দিকে তাকাল রানা, বিরাট একটা স্টীল রোলার ঝুলছে। 'ঠিক আছে,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'শুধু লক্ষ রেখো, ওটা যেন আমার মাথায় না পড়ে। এবং এক ঘণ্টার বেশি দেরি কোরো না।'

সিঁড়ি বেয়ে খানিকদূর উঠে মেশিনের ভিতর দিকে মাথা নিচু করে এগোচ্ছে রানা। ওকে অনুসরণ করল জুনেস্কি। পিছন ফিরল সে, কিন্তু হেইকী এরই মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। মাথা তুলে দাঁড়ানো যায় এমন একটা জায়গায় পৌঁছে থামল রানা। নোংরা কোটটা খুলছে, চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে চারদিক। 'এমন নিরিবিলি জায়গা পেলে আমার মনে হয় দুনিয়ার সব শ্রমিক কাজে ফাঁকি দিয়ে তাস খেলত। ফিনিশরা কি করে জানা নেই।'

একটা মোটা পাইপের উপর দাঁড়িয়ে আছে জুনেস্কি। বসল সে। মাথাটা যথাসম্ভব নিচু করে ইস্পাতের টিউব আর একগাদা তারের জালের ভিতর দিয়ে দূরে তাকাল। 'ওরা কাজ করছে।'

'সেক্ষেত্রে আমাদেরও তাই করা দরকার।'

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দ্রুত এগিয়ে আসছে কে যেন। কংক্রিটের মেঝেতে ধাতব কিছু পতনের শব্দ হলো। দ্রুত মিলিয়ে গেল পায়ের আওয়াজ। 'হেইকী যন্ত্রপাতি রেখে গেল, যাও, নিয়ে এসো।'

পাইপ ধরে ধরে মেঝেতে নামল জুনেস্কি। হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। মেশিনের বাইরে মাথা বের করে দিয়ে হেইকীর রেখে যাওয়া যন্ত্রপাতিগুলো দেখল। হাত বাড়িয়ে নিতে যাবে, একটা বুট জুতো মেঝের সাথে চেপে ধরল ওর হাতটাকে।

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। পাঁচ গজ দূর থেকে সব দেখতে পাচ্ছে ও।

ব্যথায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল জুনেস্কির। মাথা তুলে লোকটার দিকে তাকাতে যাবে, একটা লোহার পাইপে ঠকাস করে ঠুকে গেল মাথার পিছনটা।

'এর নাম কাজে ফাঁকি দেয়া,' কর্কশ কণ্ঠস্বর। 'ইচ্ছা করে যন্ত্রপাতি ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল, এখন আবার নিতে আসা হয়েছে। আমার নাম বাপু জোজোভস্কি, আমাকে ফাঁকি দেয়া এত সহজ নয়।'

বানরের মত পাইপ ধরে ঝুলে নিঃশব্দে মেশিনের প্রান্তে চলে এসেছে রানা জোজোভস্কির মাথার দেড় হাত উপরে উবু হয়ে বসে আছে একটা ছোট্ট প্ল্যাটফর্মের কিনারায়। হাতে একটা হাতুড়ি। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখলে...

খালি হাতটা দিয়ে মাথার পিছনে হাত বুলাচ্ছে জুনেস্কি। কপালটা প্রায় ঠেকে আছে মেঝের সাথে।

'কি? এমন অন্যায় করবে আর?'

মাথা নাড়ছে জুনেস্কি।

দ্রুত এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে ফোরম্যান হেইকী হুভিনেনের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেল না রানা।

জুনেস্কির হাত থেকে বুট তুলে নিল জোজোভস্কি। 'আজকে মাফ করে দিলাম; যাও।' ঘুরে দাঁড়াল সে। গট গট করে চলে গেল চোখের আড়ালে।

দু'জন একই সাথে ফিরে এল আগের জায়গায়।

'কুত্তার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা, শালা বানচোত, শালা...' ফুটন্ত লাভার মত বেরিয়ে আসছে জুনেস্কির মুখ থেকে উত্তপ্ত গালাগাল।

'থামো।' চাপা গলায় বলল রানা। 'আমার প্রশ্নের জবাব দাও আগে। মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে যাচ্ছিলে কি মনে করে? চেহারা দেখে ও স্যালুট করবে ভেবেছিলে নাকি?'

বোকার মত চেয়ে থাকল জুনেস্কি।

'তুমিও দেখছি ওদেরই মত!' গম্ভীর হয়ে বলল রানা। 'দেখো, নিজে মরো, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সাথে আমাকে নিতে চেষ্টা কোরো না।' কথা শেষ করেই হাতুড়ি দিয়ে এখানে সেখানে দমাদম পেটাতে শুরু করে দিল ও।

এক ঘণ্টা পর। এনসোর ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে ওরা। জুনেস্কির গায়ে এখনও হলুদ ওভার-অল রয়েছে, কাঁধে রেখে হাত দিয়ে ধরে আছে একটা কোদাল। ওভার-অল খুলে ফেলেছে রানা, হাতে ধোয়া ভাঁজহীন একটা লাল হাফ হাতা শার্ট ওর গায়ে, পরনে খাকী ট্রাউজার। জুনেস্কির প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে ও, ওর এই পোশাকটা স্থানীয় পানি সরবরাহ বিভাগের একজন ইন্সপেক্টরের ইউনিফর্ম। হাতের মেটাল ডিটেকশন যন্ত্রটা লুকাবার কোন চেষ্টা নেই। যন্ত্রের গায়ে ইস্পাতের কালো চকচকে একটা পাত লাগানো আছে, তাতে রুপোলী হরফে লেখা: ম্যানুফ্যাকচারড বাই সোভেলেস্ট্রো ল্যাবরেটরিজ অভ নেপ্রোপেট্রোভস্ক।

রাশান ভাষা দু'জনেরই কমবেশি জানা আছে। মুখ বুজে থাকাটা সন্দেহজনক, তাই ঝগড়ার সুরে দুটো একটা কথা বলছে ওরা হাঁটতে হাঁটতে।

পাঁচ মিনিট হাঁটার পর দু'বার ঢোক গিলে জানতে চাইল জুনেস্কি, 'আর কদ্দূর? ম্যাপটা একবার দেখে নিলে হয় না, ডক্টর...বাবা?'

'মিল থেকে বেরোবার পর আমি আর তোমার বাপ নই,' চাপা গলায় ধমক মারল রানা। 'এখন আমি নবোকভ, তোমার ভগ্নিপতি। তুমি ইজেভ, আমার শ্যালক। প্রফেসর স্যানিকিনিন অভিযোগ করেছেন, তাই তাঁর বাড়ির পানি সরবরাহ অনিয়মিত কিনা দেখতে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু প্রফেসর স্যানিকিনিনের সাথে আলাপ করার সময় আবার আমি ডক্টর ফিলাতভ হয়ে যাব, আর তখন তুমি হবে আমার বোবা সহকারী। মনে থাকবে?'

'থাকবে,' ঢোক গিলে বলল জুনেস্কি। 'কিন্তু এতটা ভিতরে ঢুকে পড়ছি, ভাবছি ঝামেলা হবে বেরুতে...'

'বলো কি! এক্ষুণি বেরোবার কথা ভাবছ তুমি!'

মিনমিন করে বলল জুনেস্কি, 'কিন্তু প্রফেসরের বাড়ি এতটা ভিতরে তা ভাবিনি...'

'এই তো এসে পড়েছি,' বলল রানা। 'ম্যাপ দেখার দরকার নেই, সব পরিষ্কার মনে আছে আমার। সামনের বাঁকটা নিয়ে তিনটে বাড়ির পর।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল রানা, 'তুমি বোবা, ভুলো না কথাটা।'

এলাকাটা অবসরপ্রাপ্ত বুড়োদের বাসস্থান, কোন হৈ-চৈ নেই। ছোট্ট একতলা বাড়িটার সামনে থামল ওরা। নির্জন, ফাঁকা উঠান। গেটটা ভাঙা, ভিতরে ঢুকতে অসুবিধে হলো না।

সরু পথটা দিয়ে উঁচু একটা বারান্দার দিকে এগোচ্ছে ওরা। খানিকদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল জুনেস্কি। মাটির নিচ থেকে গলগল করে পানি বেরিয়ে এসে চারদিক ডুবিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে।

মুচকি হেসে জুনেস্কিকে পাশ কাটাচ্ছে রানা। 'প্রফেসর স্যানিকিনিন আমাদের জন্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে রেখেছেন।'

বারান্দায় উঠে এল ওরা। দরজা জানালা সব বন্ধ। কলিংবেলের বোতামে আঙুল রেখে একবার চাপ দিল রানা। দরজা খুলল না। কিন্তু সাথে সাথে ভিতর থেকে ঝাঁঝাল গলা ভেসে এল, 'কাকে চাই?' পুরুষ কণ্ঠ।

'প্রফেসর স্যানিকিনিন আছেন?' বিনীত গলায়, শ্রদ্ধার সুরে জানতে চাইল রানা। দ্রুত চারপাশটা দেখে নিল চোখ বুলিয়ে। কেউ নেই কোথাও।

'কে হে?'

কোন্ প্রশ্নের উত্তরে কি বলতে হবে ওকে, আগে থেকেই জানা আছে রানার। বলল, 'আমি ডক্টর নিকোলাই ফিলাতভের ছেলে, ডক্টর আনাতোলি ফিলাতভ।'

'সাথে কে?'

'আমার সহকারী। বোবা। ইজেভ...'

দরজা খুলে গেল। চৌকাঠের ওপারেই একটা হুইল চেয়ারে বসে আছেন অশীতিপর বৃদ্ধ প্রফেসর স্যানিকিনিন। চুল, দাড়ি, ভুরু, হাতের রোম সব ধবধবে সাদা। চোখে কড়া পাওয়ারের চশমা। পোশাক পাল্টাননি এখনও, স্লিপিং গাউন পরে আছেন। মাথাটা একদিকে একটু কাত করে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন রানাকে। তাঁর পিছনে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের স্বাস্থ্যবতী একটা মেয়ে হুইল চেয়ারের গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটাকে দেখে মনটা দমে গেল রানার। চেহারাই বলছে এ মেয়ে রাশান। কে হতে পারে? সেবিকা? উঁহুঁ। সেবিকা হলে প্রফেসর স্যানিকিনিন কোন কাজ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিতেন আগেই। মেয়ে? হতে পারে। প্রফেসরের স্ত্রী হয়তো রাশান। কিন্তু খুঁতখুঁতে ভাবটা তবু মন থেকে দূর হচ্ছে না। কোথায় কি একটা যেন মস্ত গোলমাল আছে মেয়েটার মধ্যে।

হঠাৎ একটুকরো হাসি ফুটল প্রফেসরের মুখে। 'হ্যাঁ, তোমাকে আমি চিনতে

পারছি, আন্তন। তোমার ওই মুখের দাগ তখন তুমি একেবারে বাচ্চা, ওটা যুদ্ধের একটা স্মৃতি চিহ্ন। তোমার বাঁ চোয়ালের ওপর ওই জন্মদাগটাও আমি চিনতে পারছি। এসো, বাবা, এসো।' পিছনে দাঁড়ানো মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'রীনা, চেয়ারটা পিছনে টেনে ওদেরকে ঢোকার পথ করে দাও।'

ঘরে ঢুকল ওরা। দরজা বন্ধ করার আগে গলা বাড়িয়ে বাইরেটা একবার দেখে নিল রানা। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল জুনেস্কি একটা সোফায় বসে দাঁত দিয়ে হাতের নখ খুঁটছে। মেয়েটার দিকে চোখ পড়তে ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে ওর দিকে। এগিয়ে গিয়ে প্রফেসরের হুইল চেয়ারের সামনে দাঁড়াল ও, প্রফেসরের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে একটু নিচু হয়ে তাতে চুমো খেল শ্রদ্ধার সাথে। তারপর সিধে হয়ে দাঁড়াল। 'স্যার,' রীনার দিকে তাকাল রানা, ইতস্তত করছে।

'তাই তো, পরিচয় করিয়ে দিতে হয়,' দাঁতহীন মাড়ি বেরিয়ে পড়ল প্রফেসরের। 'ও ব্যালেরিনা, আমার সাবজেক্ট।'

'জ্বী?' বুঝতে পারেনি রানা কথাটা।

মুচকি হাসলেন প্রফেসর। 'বসো, আন্তন। খুলে বলছি ব্যাপারটা।' পিছিয়ে গিয়ে একটা সোফায় বসল রানা। অনুভব করছে মেয়েটার পলকহীন দৃষ্টি ওর মুখের উপর আঠার মত সেঁটে আছে। 'রীনা উপস্থিত থাকায় বিপদের কোন ভয় নেই। খুবই বিশ্বাসী মেয়ে ও। ঘুমিয়ে আছে।'

'জ্বী?' শুনতে ভুল করছে কিনা সন্দেহ হলো রানার। 'কি বললেন?'

হুইল চেয়ারে হেলান দিলেন প্রফেসর স্যানিকিনিন। 'ঠিকই শুনেছ তুমি, আন্তন। ঘুমিয়ে আছে ও, গত তিন বছর ধরে। তুমি হয়তো জানো না, হিপনোটিজম সম্পর্কে চিরকালই কৌতূহলী আমি। শুধু আজব ধরনের কেস সম্পর্কেই আমি ইন্টারেস্টেড। তিন বছর আগে রীনার কেসটা আমার হাতে আসে। সেই থেকে ও আমার সাবজেক্ট। গভীর তন্দ্রা, যাকে বলে সোমনাবুলিনিজম, তারই শিকার ও। কোন এক গাধা ভুল পোস্ট হিপনোটিক সাজেশন দিয়ে ওর এই সর্বনাশ করেছে। তিন বছর ধরে আমি চেষ্টা করছি ওর ঘুম ভাঙাতে,' অসহায় একটা ভাব ফুটে উঠল প্রফেসরের চোখে, মুখে। 'কিন্তু পারিনি। তবে একেবারে আশা ছেড়ে দিয়েছি, তাও নয়। দেখা যাক।'

আড়চোখে জুনেস্কির দিকে তাকাল রানা। ভয় হচ্ছে ওর, বিস্ময়টা হজম করতে না পেরে এক-আধটা কথা না বেরিয়ে পড়ে মুখ থেকে।

'আপনি বলতে চাইছেন, স্যার, ঘুমের মধ্যে হাঁটছে ও? আপনার কথা শুনছে?'

অত্যন্ত বিজ্ঞ মানুষ প্রফেসর। বললেন, 'সব কথা ব্যাখ্যা করতে প্রচুর সময় লাগবে, বাবা। কিন্তু, তোমাদের হাতে সময় খুব কম। শুধু একটা কথা জেনে সন্তুষ্ট থাকো, ওর দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।' রীনার উদ্দেশে তিনি বললেন, 'রীনা, তোমার যদি কফি খেতে আপত্তি না থাকে তাহলে চার কাপ।'

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল রীনা। ধীর পায়ে, অনেকটা ঘোরের মধ্যে বেরিয়ে গেল সে ড্রয়িংরূম থেকে।

হাতের চামড়া ঝুলে পড়েছে প্রফেসর স্যানিকিনিনের। নিচু টেবিল থেকে একটা নোটবুক খুলে নিলেন তিনি। পাতা উল্টে ভিতর থেকে একটা ম্যাপ বের করে ভাঁজ খুলে টেবিলে বিছালেন। 'ভাল করে দেখে নাও, আন্তন। এটা এনসোর ম্যাপ। এই যে, এখানে চারকোনা এই দাগটা, এটাই ছিল তোমাদের বাড়ি।'

'আমাদের বাড়ির বাগানেই বাবা...'

'না,' প্রফেসর বললেন। 'কাগজপত্র ভর্তি বাক্সটা তোমার বাবা পাশের বাড়ির বাগানে পুঁতে রাখেন। কারণটা সহজবোধ্য। আশা করি বুঝিয়ে দিতে হবে না।'

'কতটা জায়গা নিয়ে বাগানটা?'

'আধ একর, তার কম নয়।'

'বেশ বড় জায়গা,' বলল রানা। 'বাক্সটা কত বড়, স্যার?'

'দুই ফুট লম্বা, দেড় ফুট চওড়া।'

মনে মনে জ্যামিতিক হিসাব কষল রানা, তারপর বলল, 'ঠিক কোথায় আছে তা না জেনে যদি খুঁড়তে শুরু করি, ওটা পাবার সম্ভাবনা মোটামুটি আটশো ভাগের এক ভাগ।'

'অত কঠিন নয় কাজটা,' প্রফেসর বললেন। 'বাক্সটা যখন পোঁতা হয় তখন আমি তোমার বাবার সাথে ছিলাম। কিন্তু মুশকিল হলো, বাগানটা তখন জঙ্গল মত ছিল, আর অনেক বছর আগের কথা তো, পরিষ্কার কিছুই আমার মনে নেই। তুমি আসছ শুনে আমি একটা নকশা তৈরি করেছি।' নোট বইটা থেকে আরও একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন প্রফেসর। ভাঁজ খুলে সেটা বিছালেন টেবিলে।

সামনে ঝুঁকে স্কেল প্ল্যানটা খুঁটিয়ে দেখছে রানা।

'চারটে ডুমুর গাছ ছিল ওখানে,' প্রফেসর বললেন। 'একটার নিচে পোঁতা হয়েছিল বাক্সটা। কিন্তু সেটা কোন্ গাছটা, আমার মনে নেই।'

মাথা তুলে রানা বলল, 'তবু অনেক পরিশ্রম থেকে বাঁচলাম। এখন চার জায়গায় খুঁড়লেই হবে।'

'উনিশশো চুয়াল্লিশ তো আর আজকের কথা নয়,' প্রফেসর মৃদু গলায় বললেন। 'চারটের মধ্যে তিনটে গাছের এখন আর কোন অস্তিত্বই নেই।' নোটবুকের ভিতর থেকে কয়েকটা ফটোগ্রাফ বের করলেন তিনি। 'এগুলো দেখো। তিন হপ্তা আগে রীনাকে দিয়ে তুলিয়েছি।'

ফটোগুলো হাতে নিয়ে দেখছে রানা। 'তার মানে, আধ একর বাগান আর একটা গাছ, এই আমার সম্বল।' একটা ফটোয় আঙুল রাখল ও। 'অবশিষ্ট ডুমুর গাছ এইটা, তাই না? প্রথমে এটার নিচেই খুঁড়তে হবে। এ রাতের অন্ধকারের কাজ, দিন-দুপুরের নয়।'

প্রফেসর স্যানিকিনিন উদ্বিগ্ন হলেন। 'অন্ধকার কোথায় পাবে তুমি? এনসোয় আর্কটিক সার্কেলের ভিতরে না হলেও বছরের এই সময়ে মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে দুর্লভ সন্ধ্যা নামে। রাত এখানে রৌদ্রহীন দিবালোকের মত উজ্জ্বল।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভাবে বলল রানা। 'বাড়িটা খালি, নাকি বাস করছে কেউ?'

'ছোট্ট একটা পরিবার থাকে। রাশান। লোকটার নাম খুনায়েভ, পুরানো মগু

কারখানার ফোরম্যান সে। স্ত্রী আর একটা বাচ্চা নিয়ে থাকে। বিড়াল আছে একটা, কুকুর নেই।'

'আপনার এই ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না আমি,' বলল রানা। 'এই বয়সে ঝুঁকি নিয়ে যতটুকু করেছেন, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আপনাকে আমি ছোট করতে চাই না। আমি…'

'থামো, থামো,' প্রফেসর হাত তুলে থামিয়ে দিলেন রানাকে। 'বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বাক্সটা উদ্ধার করার ব্যাপারে তার ছেলেকে সাহায্য করব। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছি মাত্র, তার বেশি কিছু না। ভালয় ভালয় তুমি ওটা উদ্ধার করে যদি মুক্ত দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারো, শান্তিতে মরতে পারব আমি।'

যান্ত্রিক পুতুলের মত ছোট ছোট পা ফেলে ট্রে হাতে ফিরে এল রীনা। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধূমায়িত কফির কাপ তুলে দিল সে। ট্রেটা টেবিলের একপাশে নামিয়ে রেখে ধীর পায়ে হুইল চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

চিন্তামগ্ন রানাকে দেখছেন প্রফেসর। 'কি ভাবছ, আন্তন?'

'কাজটা কঠিন, প্রায় অসম্ভব,' মুখ তুলে বলল রানা। 'দিনের বেলা খুনায়েডের বাগানটা তছনছ করব আমরা, কতটুকু পছন্দ করবে সে, বোঝাই যায়!'

'অসম্ভব বলে কিছু নেই, আন্তন,' প্রফেসর গম্ভীর হয়ে বললেন। 'তোমার বাবা যে থিসিস ওই বাক্সে রেখে গেছেন সেটার যুগান্তকারী মূল্য আছে, সে তুলনায় ঝুঁকিটা কিছুই নয়। ভাল কথা, দেখতে পাচ্ছি মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে এসেছ—গুড! বাক্সটা টিনের। যন্ত্রটার সাহায্যে বাক্সটার লোকেশন বের করা মোটেও কঠিন হবে না। আরেকটা কথা তোমাকে বলা হয়নি। বাক্সটার ওপর খুব বেশি হলে ফুট দুই মাটি আছে। বেশি গভীর গর্ত করার দরকার পড়বে না।'

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। দেখাদেখি জুনেস্কিও দাঁড়াল।

প্রফেসর এখনও কথা বলছেন, 'ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়, এখনই কাজ সারতে পারবে তোমরা, খুনায়েড বাড়িতে নেই।'

'ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'কিন্তু তার স্ত্রী এবং ছেলেটা আছে। এদের দু'জনকে সামলাতেই…তাছাড়া প্রতিবেশীরা তো আছেই।'

প্রফেসর অভয় দিয়ে হাসলেন, 'ভয় কোরো না, আন্তন। আমি লছি, দেখো, খুব সহজেই কাজটা উদ্ধার করে ফিরে আসতে পারবে তুমি।'

দরজা সামান্য একটু খুলে উঁকি দিয়ে প্রথমে বাইরেটা দেখে নিল না। তারপর প্রফেসরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে অনুসরণ করল ওকে জুনেস্কি।

রাস্তায় উঠে রাশান মেড রিস্টওয়াচ দেখল রানা। মাত্র সকাল আটটা। 'জুনেস্কি,' বলল ও। 'এখন তুমি কিন্তু বোবা নও।'

'জানি,' মুখ হাঁড়ি করে বলল জুনেস্কি। 'কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। দিনের বেলা এমন বেআইনী কাজ কোন বুদ্ধিমান লোক করতে যায়? বছরে এই সময়টা অন্ধকার পাওয়া যায় না। ভাল কথা। সময়টা কয়েক মাস পিছিয়ে নিয়ে গেলেই তো হত।'

'এই থিসিস একটা অমূল্য সম্পদ,' বলল রানা, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা উদ্ধার করা দরকার। এ ছাড়াও আরও একটা কারণে এই মুহূর্তে ওটা উদ্ধার করা প্রয়োজন।' হাতের স্ট্রীট প্ল্যানটায় অপর হাত দিয়ে একটা টোকা মারল ও। 'নিকোলাই ফিলাতভ যখন এই এলাকায় বাস করতেন তখন এটা ছিল অভিজাত শ্রেণীর এলাকা। কিন্তু এই ক'বছরে এনসো আগের চেয়ে তিনগুণ বড় হয়ে উঠেছে। পুরানো এলাকার বাড়িঘর এখন জরাজীর্ণ। এগুলোকে ভেঙে নতুন নতুন ঘরবাড়ি তোলা হবে। বসন্তকাল আসার আগেই বুলডোজার দিয়ে সব মিশিয়ে দেয়া হবে মাটির সাথে। তার মানে, হয় এখনই, নাহয় কখনোই নয়।'

সাত মিনিট পর জুনেস্কি অনেক আগের সেই একই প্রশ্ন আবার উচ্চারণ করল, 'আর কদ্দূর?'

'ওই তো দেখা যাচ্ছে বাড়িটা,' বলল রানা। 'শোনো, তুমি একজন সাধারণ শ্রমিক, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে তোমার ওস্তাদকেই কথা বলতে দিয়ো,' জুনেস্কির কাঁধের কোদালটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'মাটি আর এই কোদালের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু বোঝ না, এই রকম ভান করবে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা!'

বাড়িটার কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। 'পাশের বাড়িটা ছিল নিকোলাই ফিলাতভের। এখন ওখানে কারা থাকে প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া উচিত ছিল,' বলল রানা।

'দুটো বাড়িই দেখতে পাচ্ছি জরাজীর্ণ...'

'সেজন্যেই তো বুলডোজার আসছে।'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। রাস্তার দুটো দিক দেখে নিল। তারপর ইঁট বিছানো রাস্তা থেকে নেমে ঘাসের উপর দাঁড়াল, 'নাও, কোদাল নামাও।'

চোখ কপালে উঠে গেল জুনেস্কির, 'মানে? এখানে?'

'হ্যাঁ, এখানে,' বলল রানা, 'বেশি কথা বলতে নিষেধ করেছি না তোমাকে? কারও মনে যাতে সন্দেহ না জাগে তার জন্যে এখান থেকেই শুরু করতে হবে।' পকেট থেকে দুটো এয়ারফোন বের করে মেটাল ডিটেকটরের সকেটে লিড অয়্যার ঢুকিয়ে দিল। 'বলো তো, টেকনিক্যাল লোক বলে মনে হচ্ছে?'

'হচ্ছে,' সংক্ষেপে বলল জুনেস্কি।

'গুড,' বলল রানা। ডিটেকটরের সুইচ অন করল ও। তারপর একটা কন্ট্রোল অ্যাডজাস্ট করল। ভ্যাকিউম ক্লিনার যেভাবে মেঝের কাছাকাছি ধরতে হয় সেভাবে যন্ত্রটাকে ধরে রাস্তার পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে ও। কোদালটা মাটিতে ফেলে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে জুনেস্কি। চোখেমুখে রাজ্যের বিরক্তি।

প্রায় পঞ্চাশ গজের মত এগিয়ে গেল রানা, তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এল। 'বেশ অনেকগুলো রীডিং পাচ্ছি। রাস্তার নিচে প্রচুর ধাতব খনিজ পদার্থ আছে বলে মনে হচ্ছে।'

'সোনার খনি নয় তো?' ব্যঙ্গের সুরে বলল জুনেস্কি।

রানা গম্ভীর। 'তার চেয়ে অনেক দামী জিনিস খুঁজতে এসেছি আমরা।'

পরমুহূর্তে উদ্বিগ্ন দেখাল ওকে। 'বাগানেও যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ভারি মুশকিলে পড়ব।'

'কৌতূহল সৃষ্টি করছি আমরা,' বলল জুনেস্কি। 'এইমাত্র একটা জানালার পর্দা নড়ে উঠল।'

'আরেকবার চেক করি,' এই ভঙ্গিতে আবার এগোল রানা, এবার থামল বাড়িটার সামনে, তারপর পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে খসখস করে কিছু লিখল।

পিছনে চলে এসেছে জুনেস্কি। রানার কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একটা বাচ্চা ছেলে। জুনেস্কির পাশে দাঁড়াল সে, রানার দিকে হাত তুলে জানতে চাইল, 'কি করছেন উনি?'

'পানির একটা পাইপ খুঁজছেন,' বলল জুনেস্কি।

এগিয়ে গিয়ে বাগানের বেড়ার কাছে দাঁড়াল রানা।

'ওই জিনিসটা কি? হাতে?'

'ঘণ্টি,' ধৈর্যের সাথে বলল জুনেস্কি। 'পানির পাইপটা পাওয়া গেছে কিনা টিংটিং করে আওয়াজ করে জানাবে। তোমার বাবা কি বাড়িতে আছেন?'

'না, কাজে গেছে,' বাগানের নিচু বেড়ার উপর ঝুঁকে পড়েছে রানা, ওর দিকে তাকিয়ে বলল ছেলেটা। 'এখন উনি কি করছেন?'

'জানি না। ওসব কাজের কিছু বুঝি না, আমি সাধারণ একজন শ্রমিক। তোমার মা কি বাড়িতে আছেন?'

'ধোয়াধুয়ির কাজ করছে। আপনারা দেখা করবেন?'

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। 'আমার ধারণা, পাইপটা এই জায়গা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে,' হাঁপ ছেড়ে বলল ও।

'হ্যাঁ,' বলল জুনেস্কি। 'তোমার মায়ের সাথে বোধহয় কথা বলতে হবে আমাদের। দৌড়ে গিয়ে তাকে একটা খবর দাও, কেমন?' এক দৌড়ে ছেলেটা বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। এগিয়ে গিয়ে রানার পাশে দাঁড়াল জুনেস্কি। 'খুনায়েভ কাজে গেছে। মিসেস খুনায়েভ কাপড় কিংবা বাসন-পেয়ালা ধুচ্ছে।'

'ঠিক আছে, চলো,' জুনেস্কিকে পিছনে নিয়ে সদর দরজার সামনে আসতেই দরজাটা ভিতর থেকে খুলে গেল। রোগা পাতলা ক্লান্ত চেহারার এক মহিলা চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে এল ওদের সামনে।

'এটা কি…,' নোটবুকটা বের করে দেখে নিল একবার রানা। 'কমরেড খুনায়েভের বাড়ি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার স্বামী এখন বাড়ি নেই।'

'আপনি তাহলে গ্রাজডানকে খুনায়েভা?'

ক্ষীণ একটু সতর্কতা ফুটে উঠল মহিলার চোখে। 'বলুন?'

হাসল রানা। 'তেমন কিছু নয়, কিছুদিনের মধ্যে এই এলাকার পুরানো সব বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হবে তো, তার আগে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে ফেলতে

হচ্ছে। আমরা সেই রকম একটা কাজে এসেছি। ভাঙাচোরার ব্যাপারটা আপনার জানা আছে?'

'আছে,' সতর্কতার পরিবর্তে চেহারায় ক্ষীণ একটা আক্রমণাত্মক ভাব ফুটে উঠল মহিলার। 'কি জঘন্য ব্যাপার, ভেবে দেখুন! নতুন করে যেই সাজিয়েছি বাড়িটাকে, অমনি হুকুম এসেছে বাড়ি ছাড়তে হবে।'

'সেজন্যে বড়জোর আমি ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করতে পারি,' গম্ভীর মুখে বলল রানা। 'যাক, এখন ব্যাপার হলো এই যে বাগানের ভিতর অসংখ্য পাইপ রয়েছে—গ্যাস, পানি, ইলেকট্রিসিটি এইসব। আমার মাথাব্যথা পানির পাইপ নিয়ে। ভাঙচুর করতে বুলডোজার আসবে, তারা তো আর আমাদের বিভাগের লোক নয়, তাই কোথাও পানির পাইপ আছে কি নেই তা না দেখেই কাজ সেরে তাড়াতাড়ি কেটে পড়বে। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন একটা পাইপ যদি ভাঙে, গোটা এলাকাটা সয়লাব হয়ে যাবে।'

'ভাঙচুর শুরু হবার আগে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিলেই তো পারেন?'

হেসে ফেলল রানা, 'ব্যাপারটা অত সহজ নয়, গ্রাজডানকে খুনায়েভা।' দ্রুত বিশ্বাসযোগ্য একটা ব্যাখ্যা খুঁজছে ও। 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সভেটোগোরস্কের এই শহরটা অনেক দিনের পুরানো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফিনরা এটা তৈরি করেছিল। প্রচুর রেকর্ড আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে নষ্ট হয়ে গেছে, তাই কিছু পাইপ কোথায় আছে জানা নেই আমাদের। শুধু তাই নয়, আমাদের বর্তমান ওয়াটার সিস্টেমের সাথে সেগুলোর যোগাযোগ আছে কিনা তাও জানা নেই।' তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে একটু নিচু গলায় বলল ও, 'এমনও হতে পারে, এখানে আমরা যে পানি পাচ্ছি তার একটা অংশ হয়তো এখনও আসছে সীমান্তের ওপার থেকে—ইমাত্রা থেকে।'

'আপনি বলতে চাইছেন বিনা পয়সায় ফিনদের কাছে থেকে পাচ্ছি?'

'এর অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে আমি আগ্রহী নই,' গম্ভীর হলো রানা। 'আমার এখনকার কাজ হলো পাইপ খুঁজে বের করা।'

রানার কাঁধের উপর দিয়ে রুগ্না মহিলা জুনেস্কির দিকে তাকাল। কোদালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জুনেস্কি। 'বুঝতে পারছি, বাগানে ঢুকতে চাইছেন আপনারা। ওই লোক কি গোটা বাগানটা খুঁড়বে?'

'আরে না,' আশ্বাস দিয়ে বলল রানা। হাতের ডিটেকটরটা একটু উপরে তুলে দেখাল ও। 'সাথে যন্ত্র আছে, নতুন আবিষ্কার—এর সাহায্যে মাটি না খুঁড়েও পাইপ কোথায় আছে জানতে পারব। কোথাও যদি জাংশন পাই তখন হয়তো ছোট্ট একটা গর্ত করতে হতে পারে, তবে পাব বলে মনে করি না।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল খুনায়েভা। 'কিন্তু সাবধান, ফ্লাওয়ার বেডে যেন পা ফেলবেন না। এ বছরই বাড়ি ছাড়তে হবে, জানি, কিন্তু ফুলগুলো যা সুন্দর ফুটেছে এবার, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—হয়তো চলে যাব বলেই মায়া বাড়াচ্ছে।

'ঠিক আছে, চেষ্টা করব ফুল যাতে নষ্ট না হয়,' বলল রানা। জুনেস্কির দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল ও।

ছেলেটাকে অনুসরণ করে বাড়ির পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে ওরা। বাড়িটার কোণে পৌঁছে থামল রানা, দেখল বাগানের শেষ প্রান্তে একটা শেড রয়েছে। বার্চ গাছের কাঠ দিয়ে মজবুত করে তৈরি শেডটা, আকারে বেশ বড়। 'নকশায় নেই ওটা,' নিচু গলায় বলল রানা। 'যা খুঁজছি তা ওটার নিচে না থাকলেই হয় এখন।'

'দর্শক বাবাজীকে বিদায় করার কি ব্যবস্থা?' জানতে চাইল জুনেস্কি।

'কোন সমস্যাই নয়,' বলল রানা। 'পাত্তা না দিলে এমনিই কেটে পড়বে।'

কোদালটা কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে একটা ফ্লাওয়ার বেডের কিনারায় কোপ মারল জুনেস্কি। হাতলটা ছেড়ে দিয়ে মাথায় মুছে নিল হাত দুটো।

বাগানের একটা নকশা বের করে ভাঁজ খুলল রানা। 'ওইটা অবশিষ্ট ডুমুর গাছ,' বলল ও। 'ওটার নিচে কিছু আছে কিনা চেক করে দেখব আগে।' এয়ারফোন দুটো কানে লাগিয়ে নিল, অন করল ডিটেকটর, এগোল গাছটার দিকে।

গাছটার চারপাশে কিছু সময় কাটাল রানা। ছায়ার মত ওর পিছু লেগে আছে ছেলেটা। 'কিছুই নেই এখানে,' হাঁক ছেড়ে বলল ও।

'পাইপটা হয়তো মাঝখান দিয়ে গেছে,' বলল জুনেস্কি।

'সম্ভব। যদ্দূর মনে হচ্ছে, কপালে আজ বিস্তর খাটুনি আছে। গোটা এলাকাটা চষতে হবে।'

কাজ শুরু করে দিল রানা। ছেলেটা থাকায় মাঝে মাঝেই মুখ তুলে একটা করে সংখ্যা বলছে ও, নিষ্ঠার সাথে তক্ষুণি তা নকশায় টুকে নিচ্ছে জুনেস্কি। আধঘণ্টা পর বিরক্ত হয়ে চলে গেল ছেলেটা। জুনেস্কির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল রানা, তারপর আবার কাজে মন দিল। গোটা বাগানটা চেক করতে এক ঘণ্টারও বেশি লেগে গেল ওর। রিস্টওয়াচে চোখ বুলিয়ে দ্রুত ফিরে এল ও জুনেস্কির কাছে। বলল, 'দুটো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। একটা শক্তিশালী রীডিং—খুব শক্তিশালী—ওখানে লনের কিনারায়, আরেকটা দুর্বল রীডিং, ওদিকের ফ্লাওয়ার বেডে। লনের মাটিই প্রথম খুঁড়বে তুমি।'

রানাকে ছাড়িয়ে দূরে চলে গেল জুনেস্কির দৃষ্টি। 'খুনায়েভা আসছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। ওদের দিকে এগিয়ে আসছে মহিলা বলল, 'কিছু পেলেন নাকি?'

'সম্ভবত একটা জাংশন পেয়েছি,' হাত তুলে দেখিয়ে বলল রানা, 'ওখানে। ছোট্ট একটা গর্ত করতে হবে, গ্রাজডানকে খুনায়েভা। চিন্তার কিছু নেই, মাটি ফেলে ঘাসের চাপড়া আবার জায়গা মত বসিয়ে দেব।'

এবড়োখেবড়ো লনের দিকে ফিরল খুনায়েভা। 'কিছু এসে যায় না,' ঠোঁট উল্টে বলল সে। 'আমাদের দক্ষিণের তুলনায়, মানে যেখান থেকে এসেছি আমরা, সে জায়গার তুলনায় এখানে ঘাস বলতে গেলে কিছুই জন্মায় না। আমার স্বামী তো বলেন··· সে যাক, জানতে এসেছি, আপনাদেরকে কিছু খেতে দেব কি?'

'সাথে স্যান্ডউইচ আছে।'

'তাহলে চা বানিয়ে দিই,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, ফিরে গেল বাড়ির ভিতর।

'মানুষটা ভাল,' মন্তব্য করল রানা, রিস্টওয়াচ দেখল। 'এখন দুপুর, সব ভাল শ্রমিকরা আধঘন্টা বিশ্রাম নেয় এই সময়।'

লনে বসে স্যান্ডউইচ আর লেবু চা খেল ওরা। মনে মনে খুনায়েভাকে ধন্যবাদ দিল রানা, চা খাওয়াবার বদলে গল্প জমাবার কোন চেষ্টা না করে ফিরে যাওয়ায়। পাশের বাড়িটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে জুনেস্কিকে বলল, 'ওই বাড়িটার একটা অংশ কিছুটা নতুন লাগছে। আমার মনে হয় ওখানেই পড়েছিল বোমাটা। তাতেই নিকোলাই আর তার ফ্যামিলি মারা যায়, ভাগ্যগুণে বেঁচে যায় আন্তন।'

'এদিকে বুঝি খুব বোমা পড়েছিল?'

'খুব মানে! এই এলাকা বেশ কিছুদিন ফ্রন্ট লাইন হয়ে উঠেছিল। বোম্বারের ভিড়ে সে-সময়ে আকাশ ঢাকা পড়ে যেত।'

গরম চায়ে চুমুক দিল জুনেস্কি। 'বাক্সটা এখনও এখানে আছে কিনা তা আমরা জানছি কিভাবে? ভাল একজন গার্ডেনারের চোখে পড়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। হয়তো খুনায়েভরাই পেয়ে গেছে!'

'মন খারাপ করে দিয়ো না,' শাসাল রানা। 'যাও, মাটি খোঁড়ার সময় হয়েছে তোমার। দাঁড়াও, আরেকবার চেক করে রীডিংটা বুঝে নিই ভাল করে।' উঠে দাঁড়াল রানা। ডিটেকটরের সুইচ অন করল। লনের উপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে থামল এক জায়গায়। কানে গোঁজা পেন্সিলটা নামিয়ে মাটিতে গাঁথল। 'এইখানে। আগে ঘাসসহ ছাল তুলে নাও খানিকটা জায়গায়। পরে আবার যেমন আছে তেমনি সাজিয়ে দিতে হবে।'

কোদাল হাতে উঠে দাঁড়াল জুনেস্কি। এগিয়ে গিয়ে কাজ শুরু করে দিল।

গাছের নিচে ছায়ায় বসে জুনেস্কির কাজ লক্ষ করছে রানা। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে চায়ের কাপে। খানিক পরই মুখ তুলে তাকাল জুনেস্কি। জানতে চাইল, 'কতটা গভীর করতে হবে?'

'ফুট দুই।'

'আড়াই ফুট নিচে দাঁড়িয়ে আছি আমি। কই, এখনও তো দেখছি না কিছু।'

'আরও খোঁড়ো,' বলল রানা। 'প্রফেসর স্যানিকিনিন ভুল করে থাকতে পারেন।'

আবার খুঁড়তে শুরু করল জুনেস্কি। খানিকপর বলল, 'আরও এক ফুট গভীর হয়েছে গর্তটা, কিছুই নেই।'

'যন্ত্রটা কি বলে দেখা যাক আবার,' এয়ারফোন কানে তুলে উঠে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে গিয়ে ডিটেকটরটা নামাল গর্তে। সুইচ অন করতেই কান ঝালাপালা হয়ে গেল ওর। 'আছে, এখানেই আছে। বোধহয় আর কয়েক ইঞ্চি নিচেই।'

'দেখা যাক,' বলল জুনেস্কি। 'কিন্তু গর্তটাকে চওড়ায় আরও বড় না করলে কোদাল চালাতে পারছি না।' আবার সে কোদাল চালাল গর্তের ভিতর, অমনি ঠুন করে একটা মধুর আওয়াজ ঢুকল ওদের কর্ণকুহরে। 'পেয়েছি!' কোদাল দিয়ে যতটা সম্ভব মাটি সরাল সে, তারপর হাত লাগাল। পাঁচ মিনিট পর মুখ তুলল সে।

'জানেন কি পেয়েছি?'

'কি?'

হঠাৎ হাসতে শুরু করল জুনেস্কি। 'হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! সত্যি সত্যিই পানির একটা পাইপ।'

'হুঁ,' গম্ভীর হলো রানা। 'ভাগ্য পরিহাস শুরু করেছে আমাদের সাথে। উঠে পড়ো, নামতে দাও আমাকে। দেখি।' জুনেস্কির জায়গায় নামল ও। হাত দিয়ে স্পর্শ করে অনুভব করল শক্ত ধাতবের গোল, কঠিন আকৃতি। আরও মাটি সরিয়ে বস্তুটাকে আরও খানিক উন্মুক্ত করল ও। তারপর অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে অতি সন্তর্পণে উঠে পড়ল গর্ত থেকে।

আপন মনে এখনও খিক্ খিক্ করে হাসছে জুনেস্কি।

'গর্তটা মাটি দিয়ে ভরো আবার,' বলল রানা। 'খুব সাবধানে। চাপ পড়ে না যেন। পানির পাইপ নয়, একটা তাজা বোমা। আকাশ থেকে পড়েছিল, কিন্তু ফাটেনি।'

বিষম খেল জুনেস্কি। ধীরে ধীরে মুখ থেকে মুছে যাচ্ছে হাসিটা।

'আড়াইশো কিলোগ্রামের কম হবে না,' বলল রানা। 'তার মানে পাঁচশো পাউন্ডার।'

ইমাত্রা। ভি. আই. পি. ইনসের মস্ত খিলানের নিচে ঝকঝকে একটা স্পোর্টস কার এসে থামল। ড্রাইভিং সীট থেকে নামল মাথা কামানো টেনেটুনে পাঁচ ফুট লম্বা এক রাশান গরিলা। বেঁটে হলেও চওড়ায় পুষিয়ে নিয়েছে লোকটা। মুখটা প্রকাণ্ড, ক্লিনশেভ, চেহারা দেখে মনে হয় দুনিয়ার সবাইকে এক হাত দেখে নেবার মতলব রয়েছে তার, তেমন শক্তিও রাখে। পা দুটো বাঁকা, হাঁটার সময় হাত দুটো শরীরের কাছ থেকে বেশ একটু দূরে থাকে। আক্রোশের ভাব ফুটে আছে চোখে মুখে, এটাই তার স্বাভাবিক চেহারা।

এগিয়ে এসে গাড়ির ব্যাকডোর খুলে দিল সে। ছোটখাট একটা পাহাড় নামছে। জ্যাক জাস্টিস ওরফে গুস্তাভ তাতাভস্কি।

সসম্ভ্রমে স্যালুট করল লোকটা গুস্তাভ তাতাকে। ঠোঁট নেড়ে নিচু গলায় কি যেন বলল সে। একটা হাত নাড়ল। লোকটার ইঙ্গিত অনুসরণ করে খিলানের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেল গুস্তাফ তাতার। পার্কিং লটটা দেখা যাচ্ছে। নীল ডাটসনটা দেখল সে। কার্ল পপকিনের গাড়ি ওটা, জানা আছে। মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না তার। 'পোর্টারের সাথে কথা বলো,' মৃদু গলায় নির্দেশ দিয়ে সামনে এগোল সে।

রিসেপশনে স্মার্ট এক ছোকরা বসে আছে। সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে সে, এমন সময় গুস্তাভ তাতাকে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে! রাজকীয় ভঙ্গিতে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল গুস্তাভ তাতা। মুচকি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। কোটের পকেটে হাত ভরে দিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। 'ইয়াং জেনারেশন তাদের সবচেয়ে বড় সম্পদটাকে কাজে লাগাতে জানে না। মেয়েদের মত লম্বা চুল রাখে, নরম সিগারেট ফোঁকে, চশমা পরে। দুঃখ হয়, বুঝলে?' পকেট থেকে অত্যন্ত দামী হাভানা চুরুটের একটা বাক্স বের করে

কাউন্টারে রাখল সে, তারপর স্মার্ট চেহারার রিসেপশনিস্টের দিকে একটু ঝুঁকে বলল, 'কেউ, কোন মেয়ে তোমাকে বলেনি কিছু?'

হতভম্ব হয়ে গেল রিসেপশনিস্ট। 'কি?'

'তুমি সুদর্শন?' গুস্তাভ হাসছে। 'তোমার চেহারার সাথে সিগারেট মানায় না?' চুরুটের বাক্সটা খুলে সেটা সামনে ঠেলে দিল সে। 'এইটা অভ্যাস করো, তোমার দিকে মিছিল করে আসবে ঝাঁক ঝাঁক পরী।'

হেসে ফেলল রিসেপশনিস্ট। বাক্স থেকে একটা চুরুট নিয়ে ধরাল সে।

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ!'

'বাহ্, কী সুন্দর!' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো গুস্তাভ।

'আপনার কি খেদমত করতে পারি, স্যার...?'

পকেট থেকে আমেরিকান পাসপোর্টটা বের করে কাউন্টারে রাখল গুস্তাভ। 'ট্যুরিস্ট। ইমাত্রা ক'দিন যাদু করে রাখতে পারবে জানি না। তবে, সবচেয়ে সেরা কামরাটা চাই আমার।'

রেজিস্টার বুকটা শেলফ থেকে নামিয়ে কাউন্টারে রাখল রিসেপশনিস্ট। পাতা ওল্টাচ্ছে। 'স্যার, আমাদের সবগুলো কামরাই প্রথম শ্রেণীর...'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল গুস্তাভ তাতা। 'আমি ভি. আই. পি. ইনসের ইতিহাস জানি। সব কামরাই ভাল, ঠিক বলেছ, কিন্তু স্পেশাল কামরাও আছে...'

সবিনয়ে হাসল রিসেপশনিস্ট। রেজিস্টার বুক খুলে চোখ বুলাল একটা পৃষ্ঠায়। 'আপনি ঠিকই শুনেছেন, স্যার। কিন্তু স্পেশাল কামরাটা এই মুহূর্তে খালি নেই। মাত্র এক ঘণ্টা আগে ডক্টর ফিলাতভ নামে এক ভদ্রলোক...'

'হোয়াট? রিয়েলি? ডক্টর ফিলাতভ, আই মীন—সেই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ডক্টর ফিলাতভ এই হোটেলে উঠেছেন, তুমি এই কথা বলতে চাইছ?' আনন্দ আর বিস্ময়ের ভাবটা হঠাৎ চেহারা থেকে খসে পড়ল গুস্তাভের। 'নো, মাই ইয়ং ফ্রেন্ড, তুমি নিশ্চয়ই ভুল করছ...'

'ভুল করছি?' রিসেপশনিস্ট ড্রয়ার টেনে একটা পাসপোর্ট বের করে কাউন্টারে রাখল। 'এই দেখুন ডক্টর ফিলাতভের পাসপোর্ট।'

'দেখি, দেখি!' ব্যস্ত হাতে পাসপোর্টটা তুলে নিয়ে খুলল গুস্তাভ। ফটোটা দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। কাউন্টারে চাপড় মেরে বলল, 'দুনিয়ার এই শেষ প্রান্তে এসে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধুর সাক্ষাৎ পাব ভাবতেও পারিনি! কি সৌভাগ্য আমার! ঠিক হ্যায়, আমার বন্ধু সবচেয়ে সেরা কামরা পেয়েছে, তাতেই আমি খুশি। আমার মনে আর কোন দুঃখ নেই। তাহলে, ওর ঠিক নিচের কামরাটাই আমাকে দাও। খালি আছে?'

খাতায় চোখ রেখে রিসেপশনিস্ট বলল, 'তা আছে, স্যার।' মুখ তুলল সে। 'আচ্ছা, ডক্টর ফিলাতভ তাহলে একজন বিজ্ঞানী! এইবার বুঝেছি।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল গুস্তাভ। 'বোঝবার আবার আছে কিহে?'

'উনি সিরিয়াসলি নিষেধ করেছেন, কেউ যেন ওঁকে ডিসটার্ব না করে। খুব গুরুত্বপূর্ণ কি একটা কাজ করবেন নিজের কামরায়, বয় বেয়ারা পর্যন্ত ওদিকে যেতে

পারবে না।'

'আচ্ছা! তাই নাকি?' গুস্তাভ গম্ভীর হলো একটু। 'হুঁ। দেখা করার জন্যে তাহলে অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। তা ডক্টর ফিলাতভের সাথে আর কেউ আছে নাকি?'

'জ্বী, আছেন। মি. জুনেস্কি বলে এক ভদ্র...'

'তাকেও চিনি।' রিসেপশনিস্ট খাতাটা উল্টো করে বাড়িয়ে দিল, তাতে সই করল গুস্তাভ তাতাভস্তি। আরও মিনিট দুই বকর-বকর করে পোর্টারের পিছু পিছু সদ্য বুক করা নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকল সে।

পোর্টারকে মোটা বকশিশ দিয়ে বিদায় করল গুস্তাভ তাতাভস্কি। দরজা বন্ধ করে মেঝেতে দাঁড়িয়ে সিলিঙের দিকে তাকাল। চলাফেরার শব্দ পাচ্ছে সে। উপরের কামরায় ডক্টর ফিলাতভ আর জুনেস্কি পায়চারি করছে বলে মনে হলো তার। ইমাত্রায় এসে থেমে গেছে ওরা, ভাবছে সে, কেন? নিষেধ করে দিয়েছে, কেউ যেন ওদেরকে বিরক্ত না করে। কেন?

ঠিক আছে, আপন মনে কাঁধ ঝাঁকাল গুস্তাভ—বন্ধু, কামরার ভিতর কতক্ষণ থাকো দেখা যাক। আমিও অপেক্ষা করছি। থিসিসটা উদ্ধার করতে হলে সীমান্ত পেরিয়ে আমার দেশে যেতেই হবে তোমাদেরকে। আর ওখানে যদি একবার যাও, তারপর আমি কি করব তা আমার মনই জানে।

রূম সার্ভিসকে ডেকে পানীয়ের অর্ডার দিল সে। জানালার সামনে একটা ইজি চেয়ারে বসল। হোটেলের প্রবেশ পথটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আরে আরে! ওরা কারা! গাড়ি থেকে ওরা কারা...?

যেমন অবাক হলো গুস্তাভ তাতা, তেমনি খুশিও হলো। পালের গোদা, স্বয়ং কার্ল পপকিন চারজন বডিগার্ডকে সাথে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ঢুকছে হোটেলে। ডক্টর ফিলাতভ সীমান্তের ওপার থেকে থিসিসটা নিয়ে আসবে, তারপর তার কাছ থেকে সেটা নিয়ে উড়াল দেবে পপকিন, এই আশাতেই তৈরি হয়ে এসেছে সে। কথাটা ভেবে ঠোঁট বাঁকা করে হাসল গুস্তাভ। শেষ পরিণতির কথা ভেবে এখন থেকেই ওদের জন্যে দুঃখ হচ্ছে তার।

কিন্তু, তবু কেন যেন খুঁত খুঁত করছে মনটা। কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল আছে। বেলা যত বাড়তে লাগল, মেজাজ ততই বিগড়ে যেতে শুরু করল তার। বন্ধ কামরায় করছে কি ওরা?

সন্ধ্যার দিকে তার সহকারীর কাছ থেকে একটা খবর শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। 'হোয়াট! কি বললে? ডক্টর ফিলাতভ বাইরে গেছে?'

ভয় পেয়ে গেল তুর্গেভ। 'না...হ্যাঁ...মানে, বাইরে বেরিয়েছিল, কিন্তু একটু পরই আবার ফিরে এসেছে।'

'ও, তাই বলো!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল গুস্তাভ। কিন্তু রহস্যের সমাধান তাতে হলো না। বন্ধ কামরায় করছে কি ওরা?

এগারো

আরেকটা গর্ত খুঁড়ছে জুনেস্কি।

প্রথম গর্তটা মাটি দিয়ে ভরে দিয়েছে সে। ঘাসের চাপড়াগুলো একটা একটা করে সাজিয়ে রাখছে এখন রানা। কাজটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও। জায়গাটা বেঢপ হয়ে আছে দেখে কাঁধ ঝাঁকাল। পা দিয়ে মাড়ালে হয়তো সমতল হয়ে যাবে, কিন্তু এতবড় ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়।

জুনেস্কির দিকে তাকাল রানা। নিপুণভাবে একটা ফ্লাওয়ার বেডের সর্বনাশ করছে সে। 'কিছু পেলে?'

'হেইয়ো,' বলে আবার কোপ মারল জুনেস্কি। 'এখনও পাইনি,' আর একবার কোদাল চালাল সে। 'দাঁড়ান! মনে হচ্ছে কিছু...' কথা শেষ হবার আগেই তার কাছে পৌঁছে গেছে রানা, 'কি যেন ঠেকল কোদালে।' ঝুঁকে পড়ল সে।

'দেখতে দাও আমাকে,' গর্তের কিনারায় বসে ঝুঁকে পড়ল রানা। গর্তের মেঝেতে হাতড়াচ্ছে। সমতল কিছু একটা ঠেকল ওর হাতে। আঙুলে খরখরে একটা স্পর্শ। হাতটা তুলতেই দেখল আঙুলগুলো খয়েরী হয়ে গেছে। 'মরচে।' চাপা গলায় বলল ও। 'তার মানে এটাই! সাবধানে কোদাল চালাও। খুব সাবধানে।'

ঘাড় ফিরিয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল রানা। ভাবছে, সৌভাগ্যই বলতে হবে যে খুনায়েভা তার ছেলেকে নিয়ে মার্কেটিং করতে বেরিয়েছে। প্রচুর ক্ষতি করে তবু যাই হোক এইটুকু উপকার করেছে। বিকেলের দিকে এক গাদা ধোয়া কাপড় রোদে শুকাতে দিতে এসে সেই যে রয়ে গেল, বিদায় নেবার নামটি পর্যন্ত নেয়নি পাঁচটা পর্যন্ত। দেশের ভবিষ্যৎ, চীনাদের গোয়ার্তুমি, সল্ট চুক্তির ভবিষ্যৎ—দুনিয়ার সব ব্যাপারে মহিলার কি সাংঘাতিক মাথাব্যথা। মূল্যবান কয়েকটা ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে শুধু শুধু।

'ট্রাঙ্কটায় খুব ভালভাবে যদি মরচে ধরে থাকে,' বলল রানা। 'উপরের ঢাকনিটা কেটে ফেলা কঠিন হবে না। মোটামুটি একটা গর্ত করতে পারলেও চলে, হাত গলিয়ে কাগজপত্র যা আছে বের করে নেয়া যাবে।'

'কিন্তু কাটব কি দিয়ে?' বলল জুনেস্কি। পকেট থেকে ছোট্ট একটা ছুরি বের করল সে। 'এটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখা যাক।'

বেশ চওড়া পাতওয়ালা ছুরি। জুনেস্কির কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করল রানা। 'বোধহয় এটা দিয়েই হবে। সরো, দেখতে দাও আমাকে।'

একটু ইতস্তত করে গর্ত থেকে উঠে পড়ল জুনেস্কি। তার জায়গায় হাতে ছুরিটা নিয়ে নামল রানা। ট্রাঙ্কের উপর থেকে মাটি সরাতে শুরু করল ও, যতক্ষণ এক বর্গ ফুটের মত মরচে ধরা ধাতব গা না বেরোল। তারপর ছুরির তীক্ষ্ণ মুখ জোরে গাঁথল উন্মুক্ত জায়গার ঠিক মাঝখানে। ক্ষয়ে গিয়ে রসুনের খোসার মত পাতলা হয়ে আছে

ইস্পাতের পাত, খস্ করে ঢুকে গেল ছুরিটা।

এরপর গর্তটাকে বড় করতে তেমন বেগ পেতে হলো না। হাত ঢোকাবার মত গর্ত করে সাবধানে ডান হাতটাকে সেঁধিয়ে দিল রানা, ট্রাঙ্কের ভিতর এদিক ওদিক হাতড়াতে শুরু করেছে। শক্তমত কিছুতে আঙুল ঠেকল। জিনিসটা চারকোনা, অনুভব করল ও। হার্ড কাভারের বই হবে। কিন্তু সেটাকে ধরে উপরে তুলে বের করে আনতে গিয়ে দেখল ওর অবস্থা হয়েছে সেই বানরের মত যে বোতলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে ধরে আছে বাদামটাকে। গর্তের তুলনায় বইটা বড়, সুতরাং সেটাকে ছেড়ে দিয়ে ফাঁকটাকে আরও বড় করার কাজে লেগে গেল সে। শেষ পর্যন্ত বের করল বইটা। হার্ড কাভারই বটে, তবে বই নয়, খাতা। পাতা উল্টে দেখল ম্যাথামেটিক্যাল সিম্বলে ঠাসা, আর কিছু নেই। 'দুত্তোরী ছাই!' মাটির উপর একধারে ফেলে রাখল সেটাকে, তারপর আবার ট্রাঙ্কের গর্তে হাত ঢুকাল।

আলাউদ্দীনের যাদুর কলস থেকে এরপর বেরোল লম্বা গোল পাকানো কাগজের একটা বান্ডিল। ছোঁয়া পেয়েই রাবার ব্যান্ডটা ছিঁড়ে গেল, কিন্তু কাগজগুলো তেমনি রইল। ভাঁজ খুলে সিধে করতে অসুবিধের সম্মুখীন হলো রানা। ফিনিশ ভাষায় খুদে অক্ষরে হিজিবিজি করে কি সব লেখা রয়েছে প্রথম পাতাটায়। দুই এবং তিন নম্বর পাতাতেও তাই। চতুর্থ পাতায় দুর্বোধ্য অঙ্ক কষা হয়েছে।

'যা খুঁজছি তা পেলাম কিনা বুঝব কিভাবে?' জানতে চাইল জুনেস্কি।

'বুঝব,' বলল কিন্তু ব্যাখ্যা করল না রানা। আবার হাত গলিয়ে ট্রাঙ্ক থেকে একটা খাতা বের করল ও। বুকের ভিতর কাতলা মাছের মত ঝাপটা দিল হৃৎপিণ্ডটা। চামড়া দিয়ে বাঁধানো একটা খাতা—। চামড়ার গায়ে একটা কাগজ সাঁটা, তাতে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে 'এক্স-রে।' লেখাটা অস্পষ্ট, কিন্তু পড়া যায়।

ফিস ফিস করে বলল জুনেস্কি, 'সব মাটি চাপা দিন। কুইক! কে যেন আসছে!'

তাকাল না রানা। জুনেস্কির কণ্ঠস্বরেই বিপদ টের পেয়ে গেছে ও। চারপাশ থেকে মাটি তুলে দ্রুত ঢেকে ফেলছে কাগজপত্র সহ ট্রাঙ্কের উন্মুক্ত ঢাকনি। অনুভব করছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে জুনেস্কি। পাঁচ সেকেন্ড পর সে-ও উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘুরল।

বাড়ির উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসছে একজন লোক। তার হাবভাবে উৎকট সন্দেহ ফুটে আছে। 'কে তোমরা? আমার বাগানে কি করা হচ্ছে শুনি?' রাগী লোক, কণ্ঠস্বরেই টের পাওয়া যায়।

দু'পা সামনে বাড়াল রানা। 'গ্রাজডানিনু খুনায়েভ?'

'হ্যাঁ। তুমি? কার হুকুমে…'

ট্রাফিক পুলিসের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল রানা। তাই দেখে থমকে গেল খুনায়েভ। মৃদু হেসে তার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল রানা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও করমর্দন করল লোকটা। কথা বলতে যাচ্ছিল আবার, কিন্তু কোন সুযোগ দিল না রানা। নিজের পরিচয় এবং উদ্দেশ্যের কথাটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ও। সবশেষে বলল, 'তোমার স্ত্রী ব্যাপারটা জানেন। বাগানের বা লনের তেমন কোন ক্ষতি করিনি আমরা।'

'গর্ত করেছ?' চোখ পাকাল খুনায়েভ। 'কোথায়?'

'মাত্র দুটো,' বলল রানা। 'একটা ওই যে, লনে। ওটা মাটি দিয়ে ভরে দিয়েছি এরই মধ্যে। আরেক জায়গায় খুঁড়ছি, এখনও শেষ করিনি।' কথা শেষ করে লনের দিকে তাকাল রানা, যাতে সেদিকেই মনোযোগী হয় খুনায়েভ।

মনের আশা পূরণ হলো রানার, কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে গোটা ব্যাপারটা সাংঘাতিক বিপদের দিকে মোড় নিল।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে লনের দিকে তাকাল খুনায়েভ। দ্রুত এগোল সে। মাটি ফেলে গর্তটাকে ঢেকে দেয়া হলেও জায়গাটা উঁচু হয়ে আছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল খুনায়েভ। আলগা ঘাসের উপর গায়ের জোরে পা ঠুকছে। 'কোদালের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠুকে সমান করে দাওনি কেন!' বলেই বোমাটার উপর লাফাতে শুরু করল সে।

চোখ মুখ বিকৃত করে রানার দিকে তাকাল জুনেস্কি। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আশঙ্কায় ভয়ে নীল হয়ে গেছে তার চেহারা।

কোন উপায় না দেখে এক পা সামনে এগিয়ে বলল রানা, 'খুনায়েভ, এদিকে একটু আসবে?'

নেচে নেচে মাটি সমান করছে খুনায়েভ, মুখ তুলে বলল, 'যাও, যাও! আমার বাগানের ওপর যার দরদ নেই, তার সাথে আবার আলাপ কিসের? বাড়িটাও ভাঙবে তোমরা, জানি। কাল সকালেই আবার তোমার ওই পোড়া মুখ দেখতে হবে, তাই না?'

ভুরু কুঁচকে বলল রানা, 'তার মানে?'

'ন্যাকামি করো, না,' প্রায় ভেঙচে দিল রানাকে খুনায়েভ। 'বুলডোজার নিয়ে কাল আসছ না তোমরা?'

'এ ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি, কমরেড,' বলল রানা। 'ওটা আমার ডিপার্টমেন্ট নয়। স্রেফ পানির পাইপ নিয়ে যত মাথাব্যথা আমার।'

মাটি সমান হয়েছে কিনা দেখে নিয়ে মুখ তুলল খুনায়েভ। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে। ফোঁস করে একটা হাঁপ ছাড়ল জুনেস্কি, শুনতে পেল রানা।

'বাড়িটার ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে,' রানার সামনে এসে দাঁড়াল খুনায়েভ। 'ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবতে কান্না পায় আমার। মেজাজ খারাপ করেছি বলে মনে কিছু কোরো না।' রানার কাঁধে হাত রাখল সে। 'কাজটা কি ভাল করছে ওরা, তুমিই বলো তো, কমরেড?'

'প্রগতির স্বার্থে অনেক সময় আত্মত্যাগ করতেই হয়।'

'হায়রে আত্মত্যাগ!' এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে খুনায়েভ। 'ফিনদের তৈরি কিনা, বাড়িটা বড় সুন্দর। হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে, এসব ব্যাপারে ওদের জুড়ি নেই।'

'সোভিয়েত কারিগররা নিকৃষ্ট, বলতে চাইছ?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'না-না, তা বলব কেন!' ফ্লাওয়ার বেডের কাছে পড়ে থাকা ডিটেকটরের উপর চোখ পড়ল তার। 'আরে, ওটা আবার কি?' রানার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে এগিয়ে গেল সে। ঝুঁকে পড়ে তুলে নিল যন্ত্রটা।

দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়। আসল কাজটাই বাকি এখনও। অস্থিরতা বোধ করছে রানা। যত দেরি হবে, লোকজনের চোখে পড়ে যাবার ততই ভয়। আর ভিড় বাড়লেই ভুয়া পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার আশঙ্কা। সংক্ষেপে উত্তর দিল ও, 'ওটা মেটাল ডিটেকটর।'

'যুদ্ধের সময় আমি যে মাইন ডিটেকটরটা ব্যবহার করতাম, ঠিক সেইরকম দেখতে,' যন্ত্রটা নেড়েচড়ে দেখছে খুনায়েভ। 'স্ট্যালিনগ্রাডে ছিলাম তখন আমি, কমরেড। মাত্র পনেরো বছর বয়স তখন আমার।' কথা বলতে বলতে পাশের বাড়ির অর্থাৎ নিকোলাই ফিলাতভের বাড়ির নিচু বেড়ার দিকে এগোল সে। 'বরিস ইভানোভিচ, বাড়ি আছ নাকি হে?'

'ফর গডস সেক!' ফিসফিস করে বলল জুনেস্কি। 'কি করব এখন আমরা?'

একটা মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে এল পাশের বাড়ির বাগান থেকে। 'আপনার বন্ধু ডিউটিতে যাচ্ছে।'

'গুড আফটারনুন, ইরিনা অ্যালেমান্ড্রোভনা ' হাঁক ছাড়ছে খুনায়েভ। 'এখানে একটু আসতে বলুন ওকে। দেখবার মত একটা জিনিস রয়েছে আমার হাতে।'

'কিছু একটা করুন!' ব্যাকুল আবেদনের সুরে চাপা কণ্ঠে বলল জুনেস্কি। 'কোদালের একটা কোপ মেরে শালাকে…।'

'পাগল!' নিচু গলায় তিরস্কার করল রানা।

'থিসিস থাক, চলুন খালি হাতেই আপাতত কেটে পড়ি…'

'ডিটেকটরটা?' দাঁতের ফাঁক দিয়ে শব্দ বেরিয়ে আসছে রানার। 'ওটা রেখে গেলে সন্দেহ করবে ওরা। পুলিসে খবর দেবে। জানাজানি হয়ে যাবে সব।'

বেড়ার কাছ থেকে ফিরে এল খুনায়েভ। কানে এয়ারফোন দুটো এঁটে নিয়েছে এর মধ্যে। 'কাজও তো করে মাইন ডিটেকটরের মত। অত বড় আর ভারী নয়, তা ঠিক। যাই বলো, কমরেড, বিজ্ঞানীরা আজকাল ইলেকট্রোনিকসের কি খেলাই না দেখাচ্ছে!'

'ঠিক বলেছ,' বলল রানা। 'কমরেড, আমাদের হাতে সময় কিন্তু খুব কম। তোমাদের বন্ধুকে…'

'আরে, বসো!' খুনায়েভ একগাল হাসল। 'এত ব্যস্ততা কিসের? একদিন নাহয় একটু দেরি করেই বাড়ি ফিরলে।' ফ্লাওয়ার বেডের গর্তটার দিকে তাকাল সে। 'কি যেন বললে তখন? পানির পাইপ। পেয়েছ নাকি?'

'আশা করছি পাব।' মনে মনে লোকটার চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করছে রানা। লনের দিকে তাকাল ও। 'ওখানে একটা পাইপ জাংশন পেয়েছি।'

ডিটেকটরের সুইচ অন করে সেদিকে এগিয়ে গেল খুনায়েভ। আবার সে উঁচু মাটির উপর দাঁড়াল। 'বাহ্, কির কির করে বাজছে বেল। স্ট্রংরীডিং, কমরেড! চোখ বুজেও বলতে পারব কোথায় আছে জাংশনটা।' জায়গাটাকে ছাড়িয়ে খানিক দূর এগিয়ে গেল সে, 'দেখো, পারি কিনা।' বলে চোখ বুজল সে। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে শুরু করল। 'এসেছি?'

'হ্যাঁ,' নীরস গলায় বলল রানা।

চোখ খুলল খুনায়েভ। ওদের দু'জনকে ছাড়িয়ে চলে গেল তার দৃষ্টি। 'এই যে, বরিস ইভানোভিচ!' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল সে, 'দেখে বলো তো, এটা কি জিনিস?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক।

দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিসের পোশাক পরা বরিস ইভানোভিচ।

পালা করে জেগে রাতটা তো কোন রকমে কাটল, কিন্তু সকাল সাড়ে দশটায় ঘুম থেকে উঠে গুস্তাভ তাতাভস্কি যখন শুনল যে এখনও ডক্টর ফিলাতভের কামরা ভিতর থেকে বন্ধ, মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল তার। এমন হবার কথা নয়, এমন হতে পারে না! শাওয়ার সেরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসল সে, কিন্তু রুচি নেই বলে ওমলেট আর কফি ছাড়া কিছুই ছুঁলো না। কিছু একটা গণ্ডগোল চলছে, জানালার কাছে ইজিচেয়ারে বসে ভাবছে সে। ডক্টর ফিলাতভ উপস্থিত, কার্ল পপকিন উপস্থিত—অথচ তারা কি এক অজ্ঞাত কারণে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। কেন? সীমান্ত পেরিয়ে রাশিয়ায় যাচ্ছে না। কেন? রহস্যটা কি? বন্ধ কামরায় জুনেস্কিকে নিয়ে ডক্টর ফিলাতভ করছে কি?

মাথা ঠাণ্ডা করো, বাপধন, মাথা ঠাণ্ডা করো!—নিজেকে সুস্থির হতে পরামর্শ দিচ্ছে গুস্তাভ তাতা। একটা করে প্রশ্ন করো আমাকে, যথাসাধ্য চেষ্টা করো সঠিক উত্তরটা বের করে নিতে। এক নম্বর প্রশ্ন: ডক্টর ফিলাতভ এখন কোথায়? সহজ উত্তর, জানা কথা, ঠিক মাথার ওপরের কামরাতে রয়েছে সে···ওই তো, পায়ের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। বেশ। দু'নম্বর প্রশ্ন: বন্ধ কামরায় কি করছে সে? উত্তরটা জানা নেই, কিন্তু পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে একটা সম্ভাব্য, যুক্তিসঙ্গত জবাব খুঁজে বের করা অসম্ভব নয়।

এমন হতে পারে, সীমান্ত টপকাবার জন্যে নির্দিষ্ট সময় স্থির করে দিয়েছে পপকিন। সেই নির্দিষ্ট সময় এখনও আসেনি। কিংবা, হয়তো নির্দিষ্ট সময় এসে পেরিয়ে গেছে, কিন্তু সীমান্ত টপকাবার ব্যবস্থাটা তেমন নিরাপদ বলে মনে হয়নি, তাই পা বাড়ায়নি সেদিকে, অপেক্ষা করছে নতুন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত। বাহ্, এই তো চমৎকার উত্তর পেয়ে গেছি! এবার যদি প্রশ্ন করো, ডক্টর ফিলাতভ মুখ লুকিয়ে আছে কেন? এর উত্তর পানির মত সহজ এখন। প্রতিপক্ষরা কে কোথায় আছে তার ঠিক নেই ভেবে সাবধানতা অবলম্বনের জন্যে বাইরে বেরোচ্ছে না সে। সীমান্ত পেরোবার সময় পিছনে কেউ লাগুক তা চাইছে না। নিজের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলো বটে গুস্তাভ তাতা, কিন্তু সেই খুঁতখুঁতে ভাবটা মনের এক কোণে হাত-পা খিঁচছে, তাকে কোনমতেই বাগে আনতে পারছে না সে। এই করতে করতে সারাটা দিন কেটে গেল।

পরদিন দুপুরে সহকারী খবর নিয়ে এল, কার্ল পপকিনের মধ্যে কোনরকম অস্থিরতা বা উত্তেজনার চিহ্নমাত্র দেখতে পাচ্ছে না সে। নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে হোটেলের বার-এ, রেস্তোরাঁয়, শপিং কর্নারে ঘন ঘন যাচ্ছে সে, দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে, কেনাকাটা করছে, আর আয়েশ করে ঢেকুর তুলছে। দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের ছায়া পর্যন্ত নেই তার হাবভাবে।

খবর শুনে আবার মাথায় রক্ত চড়ে গেল গুস্তাভ তাতার। রহস্যের সমাধান তাহলে তো হয়নি! ডক্টর ফিলাতভ এখনও সীমান্ত পেরোয়নি, অথচ সে ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তা নেই কার্ল পপকিনের—এ কেমন কথা? উঁহুঁ, নিশ্চয়ই কোথাও সাংঘাতিক কোন গণ্ডগোল চলছে।

তাছাড়া, পুরানো সেই খুঁত খুঁতে ভাবটাও জ্বালাতন করছে। কি যেন লক্ষ্য করার আছে, কিন্তু ধরতে পারছে না। চোখের সামনেই ঘটে যাচ্ছে কি একটা মস্ত ত্রুটি, অথচ দেখতে পাচ্ছে না সে।

আজও রাত-বারোটা পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে নাকানি-চোবানি খেল গুস্তাভ তাতা। নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে শুধু বাকি রাখল সে। উপরতলার কামরায় খুটখাট আওয়াজ, চলাফেরার শব্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু এসব এখনও তাকে আশ্বস্ত করতে পারছে না, বরং মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে, অপ্রত্যাশিতভাবে মাথাব্যথার আরও একটা কারণ দেখা দিয়েছে। ট্যুরিস্টদের আসার সময় নয় এটা, অথচ হোটেলে প্রচুর নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে। কোন কোন চেহারা আবার চেনা চেনা লাগছে, মনে হচ্ছে ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরাল হয়ে উঠছে। কি যেন ঘনিয়ে আসছে চারদিক থেকে, দ্রুত।

অস্থিরভাবে পায়চারি করছে গুস্তাভ। সেই পুরানো খুঁত খুঁতে ভাবটা ধারাল ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মারছে তার মগজে। কি যেন একটা ত্রুটি আছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না সে। টেবিলের পাশ ঘেঁষে পায়চারি করার সময় চোখ পড়ল এঁটো বাসনকোসনের উপর। সাথে সাথে ছ্যাঁত করে উঠল বুক। 'তুর্গেভ!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল গুস্তাভ।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল গরিলা চেয়ার ছেড়ে! 'স্যার।'

'খাবার, খাবার! খাবার খাচ্ছে না!'

'জ্বী।' কিছুই বুঝতে পারছে না তুর্গেভ।

উত্তেজনায় কাঁপছে গুস্তাভ। 'খাবার। তোমারই রিপোর্ট, কাল থেকে ডক্টর ফিলাতভ আর জুনেস্কি একবারও দরজা খোলেনি। তবে কি না খেয়ে আছে ওরা? না। খাবার এদের কামরাতেই আছে। কেন? খাবার নিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকার কি কারণ?' একটু বিরতি নিয়ে নিজেই উত্তরটা দিল সে। 'এর একটাই উত্তর: বাইরে মুখ দেখাতে চাইছে না ওরা। কেন? এরও উত্তর সহজ: মুখের চেহারায় কোন ঘাপলা আছে! তুর্গেভ!'

'জ্বী, স্যার!'

'চারটের সময় সূর্য ডুববে, তখন ঘন ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাবে চারদিক। কয়েক মিনিটের মধ্যে কাজটা সারতে হবে আমাদের। পাইপ বেয়ে উঠে যাবে তুমি, তোমার পিছনে আমিও থাকব…'

আবার পায়চারি শুরু করল গুস্তাভ। ইতোমধ্যে না জানি কি সর্বনাশ হয়ে গেছে! ডক্টর ফিলাতভ কামরাতেই আছে মনে করে এই যে সময়টা নষ্ট করলাম, কি বলা যায় একে! সত্যি যদি না থাকে…এই পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব? অস্থির ভাবে পায়চারি শুরু করল সে।

বারো

ডিটেকটরটা খুনায়েভকে ফিরিয়ে দিয়ে রানার আপাদমস্তকে দৃষ্টি বুলাল বরিস ইভানোভিচ। 'কি নাম তোমার, কমরেড?'

নাম বলল রানা।

'স্থানীয় পানি বিভাগের লোক তুমি?' কথাটা সে বিশ্বাস করে না বোঝাবার জন্যে গম্ভীর ভাবে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছে। 'সব বিভাগের সব লোককে চিনি আমি। তোমাকে তো কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না!'

তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে রানার মাথার মধ্যে। হাড়-বদমাশ লোকের খপ্পরে পড়ে গেছে ওরা। বেফাঁস কিছু বলে বসলে থিসিসটা তো হাত ছাড়া হবেই, বাকি জীবন সাইবেরিয়ায় কাটাতে হবে বন্দী অবস্থায়। মাথা নামিয়ে নিল রানা। পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে।

বরিস ইভানোভিচের সন্দেহ তড়াক করে তুঙ্গে উঠে গেল। এগিয়ে এল সে। রানার সামনে দাঁড়াল দু'কোমরে হাত রেখে। 'ব্যাপার কি, কমরেড? পরিচয় গোপন করছ নাকি? কোথাও থেকে পালিয়ে...?'

'আপনাকে আমি চিনি,' মাথা না তুলেই বলল রানা। 'কিন্তু আপনি আমাকে চেনেন না, বরিস ইভানোভিচ।'

'সে-কথাই তো জিজ্ঞেস করছি,' পুলিসী মেজাজ চড়ছে। 'কেন চিনি না তোমাকে আমি?'

'মুখ লুকিয়ে থাকি আমি, তাই চেনেন না,' একটু ঘুরে দাঁড়াল রানা, যেন আরও আড়াল করতে চায় মুখটাকে। 'ছেলেটা আমার বংশের কলঙ্ক। রাস্তা-ঘাটে পড়ে থাকে মদ খেয়ে, মারপিট করে, জুয়া খেলে... লোকে আমার দিকে আঙুল তুলে বলে, ওই যে, গুণ্ডাটার বাপ যাচ্ছে। লজ্জায়, ঘৃণায় মরে যেতে ইচ্ছে করে আমার...'

'লুদভিল?' বিস্মিত বরিস ইভানোভিচ বলল, 'কমরেড, তুমি বখাটে লুদভিলের বাবা?'

'এই দেখেন, আপনিও ওকে বখাটে বলে আমাকে অপমান করছেন...'

মুখের চেহারা বদলে গেছে বরিস ইভানোভিচের। রানার কাঁধে সান্ত্বনার একটা হাত রাখল সে। 'না, কমরেড, তুমি ভুল বুঝছ। তোমাকে আমি অপমান করতে চাইনি। বিশ্বাস করো, তোমার দুঃখটা আমি বুঝি। ঠিক আছে, হাতে সময় নিয়ে থানায় একদিন এসো, ছোকরাকে কিভাবে সিধে করা যায় তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। চিন্তা কোরো না, কমরেড, তুমি যদি আইনের সাথে সহযোগিতা করো...'

লুদভিলের বাবাকে মিনিটখানেক ধরে উপদেশ খয়রাত করল বরিস

ইভানোভিচ। তারপর বলল, 'যাক, কমরেড, তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশিই হলাম। কোন সমস্যা হলেই চলে আসবে আমার কাছে। ভাল কথা, আমার রান্নাঘরের পানির কলটা ঠিকমত কাজ করছে না। পানি তেমন পাই না। কোন পরামর্শ দিতে পারো, যাতে…'

'দেখতে হবে,' বলল রানা।

'তোমরা গল্প করো,' বলল খুনায়েভ। 'কাপড় চোপড় ছেড়ে বিশ্রাম নিইগে আমি।' ডিটেকটরটা রেখে বাড়ির ভিতর চলে গেল সে।

'তোমাকে এ তল্লাটে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে,' জুনেস্কির নির্বিকার মুখের দিকে তাকাল বরিস ইভানোভিচ।

উপর নিচে মাথা দুলিয়ে জোর করে একগাল হাসল জুনেস্কি। 'জ্বী।'

'তোমরা অফিসের কাজে এসেছ, ব্যক্তিগত কাজ করতে বলা আমার উচিত নয়,' বরিস ইভানোভিচ একটু ইতস্তত করে বলল, 'তবু অনুরোধ না করেও পারছি না…আমার কলটা একটু দেখে দিতে হবে।'

'দেখতে পারি, কিন্তু কাজ করা যাবে না আজ। যন্ত্রপাতি সাথে নিয়ে কাল না হয়…'

'বেশ তো কাল না হয় সেরে দিয়ো। আজ দেখিয়ে দিই কোন্ কলটা—যখন খুশি এসে কাজটা করে দিয়ো কাল এক সময়।'

'যাও,' বলল রানা জুনেস্কিকে। 'যন্ত্রের প্রয়োজন না থাকলে এক্ষুণি সেরে দিয়ে আসবে। একটু জিরিয়ে নিই আমি, তুমি ফিরে এলে অফিসের দিকে রওনা হব।' ঘাসের উপর বসল রানা, তারপর শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে।

ঢোক গিলছে জুনেস্কি।

'পাঁচ মিনিটেরও কাজ নয়,' আশ্বাস দিয়ে বলল বরিস ইভানোভিচ। 'যন্ত্রপাতি যদি থাকত তাহলে আমি নিজেই…কই, এসো!'

অগত্যা পুলিস ইউনিফর্মের পিছু পিছু পাশের বাড়ির দিকে এগোল জুনেস্কি।

দশ মিনিট পর ত্রস্ত পায়ে ফিরে এসে জুনেস্কি দেখল সেই একই জায়গায় চোখ বুজে শুয়ে আছে রানা। ধড়ে প্রাণ ফিরে এল তার। একা একাই ট্রাঙ্ক থেকে থিসিসটা উদ্ধার করার চেষ্টা করবে কিনা ভেবে সাংঘাতিক দুশ্চিন্তায় ছিল সে অবশ্য, তার এই দুশ্চিন্তার সঙ্গত কোন কারণ নেই,…তবু বলা তো যায় না, ডাক্তা রা অমন বড় বড় কথা বলেই থাকে, হঠাৎ যদি স্মৃতিশক্তি ফিরে পেয়ে যায়!

পায়ের আওয়াজে চোখ মেলল রানা। কাছে চলে এসেছে জুনেস্কি। 'বরিস?'

রানার কথা শেষ হলো না, দ্রুত বলল জুনেস্কি, 'আমাকে কলটা দেখিয়ে দিয়েই ডিউটিতে চলে গেছে সে! উঠুন। এই ফাঁকে কাজ সেরে কেটে পড়তে হবে।'

উঠে বসল রানা। ইতোমধ্যে ঘুড়ে দাঁড়িয়েছে জুনেস্কি। লাফ দিয়ে ফ্লাওয়ার বেডের মাঝখানে চলে গেল, তারপর ঝুপ করে নেমে পড়ল গর্তের ভিতর। হাঁটু গেড়ে বসে ব্যস্তভাবে দু'হাতে মাটি সরাচ্ছে।

গর্তের কিনারায় এসে দাঁড়াল রানা, জুনেস্কির কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে।

চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতাটা পেল জুনেস্কি। গুঁড়ো মাটি ঝেড়ে সাঁটা কাগজের উপর লেখাটা পড়তে চেষ্টা করছে। 'এটাই।' ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে ওভারঅলের নিচে, কোমরে গুঁজে ফেলল খাতাটা। 'চলুন, কেটে পড়া যাক।'

তিরস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'গর্তটা মাটি দিয়ে আবার ভরে না দিলে খুনায়েভ খেপে গিয়ে টেলিফোন করবে না পানি বিভাগে? সে যখন শুনবে পানি বিভাগ কোন লোককে পাঠায়নি, তার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে ভাবতে পারো? পুলিসে খবর দেবে সে, পুলিস খবর দেবে সীমান্ত রক্ষীদেরকে। কাল সকালে বাস যখন সীমান্তে পৌছবে, দেখতে পাবে, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা তাই চাও?'

উত্তর না দিয়ে ছোঁ মেরে কোদালটা তুলে নিল জুনেস্কি। থিসিসটা মুঠোয় পেে প্রাণশক্তি কয়েকশো গুণ বেড়ে গেছে তার। গর্তটাকে মাটি দিয়ে ভরাট করতে দে মিনিটও লাগল না। কোদালটা কাঁধে তুলে বলল, 'চলুন।'

'আরে, দৌড়ুতে চাইছ নাকি?' ধমকের সুরে বলল রানা। 'এমন উত্তেজিত হে থাকলে প্রফেসরের বাড়ি পর্যন্ত পৌছুতে হবে না, তার আগেই কারও চোখে পে যেতে হবে। সারাদিন খেটেছি, এখন আমরা ভীষণ ক্লান্ত, তাই ধীরে ধীরে হাঁটছি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছিয়ে পড়ল জুনেস্কি। পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। রাস্তায় উে এসে চাপা গলায় বলল, 'রাশিয়ায় রাতটা কাটাতে হবে, ভাবতেই মাথা ঘুরে আমার। কোন উপায়ে এখনই যদি বর্ডার টপকানো যেত...'

'চেষ্টা করে দেখতে পারো,' বলল রানা। 'তবে আমি তোমার সাথে যাচ্ছি না। থিসিসটাও দেব না তোমাকে।'

'মানে!' রাস্তার উপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল জুনেস্কি।

'এখন বর্ডার টপকাবার চেষ্টা করা মানে অবজারভেশন টাওয়ার থেকে গুলি খেয়ে পটল তোলা,' বলল রানা। 'তোমার লাশ ওরা সার্চ করবেই, এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি। তুমি মরো তাতে আমার তেমন আপত্তি নেই, কিন্তু থিসিসটা হারাবার ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। কার্ল পপকিনের হাতে ওটা তুলে না দেয়া পর্যন্ত শান্তি নেই আমার।'

'একটা সম্ভাবনার কথা আলোচনা করতে চাইছিলাম,' শান্ত ভাবে বলল জুনেস্কি। 'আমি কি আর সত্যি সত্যি এখনই বর্ডার টপকাতে যাচ্ছি?'

'তাহলে ওটা তোমার কাছে থাকতে পারে।'

বেশ লোকজন দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। শ্রমিকরা ছোটখাট মিল থেকে কাজ শেষ করে বেরোচ্ছে, রাতের শিফটে কাজ করার জন্যে ঢুকছেও দলে দলে। সবাই ব্যস্ত, এদিক ওদিক তাকাবার অবসর নেই।

কোথাও দাঁড়াল না ওরা। মিল এলাকা ছাড়িয়ে কিছুদূর আসতেই ফাঁকা রাস্তায় পড়ল।

প্রফেসর স্যানিকিনিনের বাড়িতে ঢোকার সময় মনে করিয়ে দিল রানা, 'তুমি

বোবা, কথাটা যেন আবার ভুলে যেয়ো না।'

উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না জুনেস্কি।

নক্ করতে হলো না, ওরা বারান্দায় উঠতেই দরজা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল ব্যালেরিনা। প্রথমে রানা, ওর পিছু পিছু জুনেস্কি ঢুকল কামরায়। 'কে, রীনা?' ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলেন প্রফেসর স্যানিকিনিন। রানা লক্ষ করল, স্যারের চোখে চশমাটা নেই।

প্রফেসর স্যানিকিনিন অধীরভাবে হুইল চেয়ারে বসে আছেন। সোজা এগিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। জীর্ণ, চামড়া ঝুলে পড়া হাতটা ধরল তাঁর, ঝুঁকে পড়ে চুমু খেল ও। 'স্যার, আপনার বন্ধু নিকোলাই ফিলাতভের আশা পূর্ণ হয়েছে, থিসিসটা পেয়েছি আমি।'

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রফেসরের মুখ। কি এক আবেগে কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলেন না তিনি। এক পা পিছিয়ে গিয়ে সোফায় বসল রানা। ওর কাছ থেকে ইঙ্গিত পায়নি এখনও, তাই দাঁড়িয়ে আছে জুনেস্কি।

'কই দেখি!' বাক্ শক্তি ফিরে পেয়ে প্রথমেই থিসিসটা দেখতে চাইলেন প্রফেসর স্যানিকিনিন। তারপর বললেন, 'দেখব কি ছাই···চশমা ছাড়া তো কিছুই দেখি না। ওটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল আজ!'

জুনেস্কির দিকে ফিরল রানা। বলল, 'স্যারের হাতে দাও।'

একটু ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল জুনেস্কি। ওভারঅলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতাটা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—চিনতে পারছি।' উত্তেজনায় কাঁপছেন প্রফেসর। জুনেস্কি তাঁর বাড়ানো হাতে খাতাটা তুলে দিতে সেটার কিনারা স্পর্শ করে সাইজ অনুভব করলেন। খাতাটার গায়ে সস্নেহে হাত বুলাচ্ছেন, বহু কাল আগে হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পেয়েছেন যেন। চোখের কোণে পানি চিকচিক করছে তাঁর। বিড় বিড় করে কি বলছেন, জড়িয়ে যাচ্ছে কথা, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

ভুরু কুঁচকে দেখছে জুনেস্কি। এসব ভাল লাগছে না তার।

'বসো,' জুনেস্কির দিকে ফিরে বলল রানা। তারপর প্রফেসরের দিকে তাকাল। 'স্যার, থিসিসটার নিরাপত্তার ব্যাপারে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

মুখ তুলে তাকালেন প্রফেসর রানার দিকে।

'জিনিসটা অমূল্য একটা সম্পদ,' বলল রানা। 'বাবার শেষ ইচ্ছা ছিল, যতদূর শুনেছি, তাঁর এই থিসিস যেন ইহুদি জাতির কাজে লাগে। তাই নয় কি?'

পাকা ভুরু কুঁচকে প্রফেসর বললেন, 'বলে যাও।'

রানা, এবং জুনেস্কি লক্ষ করল, প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন প্রফেসর।

'তাই আমার বাবার আবিষ্কার হলেও, এর প্রকৃত মালিক আমি নই,' বলল রানা। 'এটা ইসরায়েল সরকারের প্রাপ্য।'

রানার কথা শেষ হয়নি এখনও বুঝতে পেরে চুপ করে অপেক্ষা করছেন বৃদ্ধ।

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সীমান্ত পেরিয়ে প্রথম সুযোগেই আমার দেশের উচ্চপদস্থ একজন সরকারী অফিসারের হাতে থিসিসটা তুলে দেব। মাঝখানের এই সময়ে এটা

যার কাছেই থাক, তাতে কিছু এসে যায় না, যদি খাতাটাকে গালা দিয়ে সীল করে তাতে আমাদের তিনজনের আঙুলের ছাপ রাখি। আপনি কি বলেন, স্যার?'

'ভেরি গুড! উত্তম প্রস্তাব।' বৃদ্ধ প্রফেসর সম্মতি দিয়ে মাথা নাড়লেন। 'রীনা, যাও তো মা, খানিকটা গালা, কিছু কাগজ আর একটা মোমবাতি নিয়ে এসো…'

সোফায় হেলান দিয়ে বসল রানা।

জুনেস্কি ওর পাশের সোফায় বসে আছে। খুশি দেখাচ্ছে তাকে। তবে, একেবারে দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারেনি এখনও। সীল করার প্রস্তাবটা ভালই। কিন্তু খাতাটা কি রানা নিজের কাছে রাখতে চাইবে?

গালা, কাগজ আর মোম নিয়ে ফিরে এল রীনা। রানা জুনেস্কিকে ইঙ্গিত করতেই উঠে দাঁড়াল সে। প্রফেসরের কাছ থেকে চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতাটা আর রীনার কাছ থেকে গালা, কাগজ ও মোম নিয়ে ফিরে এল আবার সোফায়। নিচু টেবিলটা টেনে কাছে আনল সে। মোম জ্বালল। কাগজে মুড়ে প্যাকেট তৈরি করল একটা।

সীল করতে বেশ সময় লাগল। গালা একটু ঠাণ্ডা হতেই একে একে তিনজনই তার উপর বুড়ো আঙুলের ছাপ রাখল। সব শেষে রানার পালা। বুড়ো আঙুল চেপে ছাপ দিল ও। সীল করা প্যাকেটটা টেবিল থেকে তুলে জুনেস্কির দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। 'এখন আর কোন চিন্তা নেই। নাও, এটা তোমার কাছেই রাখো।'

খুব আগ্রহের সাথে প্যাকেটটা নিয়ে কোমরে গুঁজে রাখল জুনেস্কি।

'একটা কথা,' একটু গম্ভীর হয়ে বললেন প্রফেসর স্যানিকিনিন। 'কথাটা হয়তো তোমার পছন্দ নাও হতে পারে, আন্তন। আমার বন্ধু, তোমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, তিনিও হয়তো কথাটা শুনে আমার ওপর বেজার হতেন। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে, বিবেক দিয়ে যা ভাল বুঝেছি, চিরকাল তাই করে এসেছি আমি, সুতরাং তুমি অসন্তুষ্ট হলেও কথাটা আমাকে বলতে হবে।'

'কেন অসন্তুষ্ট হব!' বলল রানা। 'আপনি বলুন, স্যার!'

'একটু আগে তোমার বাবার শেষ ইচ্ছা সম্পর্কে তুমি যা বললে সে ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তবে তুমি যখন কথাটা শুনেছ, সত্যি হতেও পারে। সে যাই হোক, আমার বক্তব্য হলো…তোমার বাবার আবিষ্কার, এক্স-রে প্রতিফলন এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার, একথা তুমি তো জানোই। কিন্তু, প্রশ্ন হলো, এই আবিষ্কারটাকে কি কাজে লাগানো হবে?'

চুপ করে আছে রানা।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধের দিকে জুনেস্কি। ভাবছে শালা বুড়োর মতলবটা কি!

'এক্স-রে-র এই প্রতিফলনটাকে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি মারণরশ্মি,' প্রফেসর বলে চলেছেন। 'যার হাতেই পড়ুক না কেন, এটা সে ব্যবহার করবে নিজের স্বার্থে, অর্থাৎ শত্রুদেশগুলোকে ধ্বংস করার কাজে। সুস্থ একজন মানবতাবাদী হিসাবে আমি তা চাই না।'

'স্যার, আপনার কোন প্রস্তাব আছে?'

'আছে,' বৃদ্ধ বললেন। 'কিন্তু সে প্রস্তাবের কথা বলা না বলা সমান। তুমি একজন দেশপ্রেমিক ইসরায়েলী, সুতরাং আমার প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করবে না, জানি।'

'দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে যদি…'

'গোটা পৃথিবীটাই তো একজন বিবেকসম্পন্ন লোকের দেশ, আন্তন।'

'তা ঠিক,' বলল রানা। 'দার্শনিক অর্থে কথাটা খাঁটি বটে। কিন্তু…যাই হোক, আপনার প্রস্তাবটা শুনতে আমার আপত্তি নেই।'

বৃদ্ধের উপর চটেমটে লাল হয়ে উঠেছে জুনেস্কি। তীব্র গলায় প্রতিবাদ করে কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সে কথা বলতে পারে না, বোবা।

'একদিন না একদিন বৃহৎ সব রাষ্ট্রই এক্স-রে-র প্রতিফলন আবিষ্কার করবে,' বৃদ্ধ বললেন। 'কিন্তু তার আগে এই মারণরশ্মি একা যদি কেউ পায়, রাতারাতি বিশ্ব-সভ্যতা ইতিহাসের সবচেয়ে সঙ্কটময় যুগে প্রবেশ করবে। এর কাছে সমস্ত মারণাস্ত্র তুচ্ছ, অসহায়। আণবিক বোমার গুদামগুলো, যে কোন দূরত্বেই থাকুক, শুধু অবস্থান জানা থাকলেই চলবে, এর সাহায্যে চোখের পলকে সব ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব।'

'অর্থাৎ…'

'অর্থাৎ, পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। মাত্র একটা রাষ্ট্র যার হাতে পড়বে এই থিসিস, সেই বিকট আতঙ্কের মত মহাশক্তি নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। সেই মহাশক্তির মাপ, ওজন ইত্যাদি আমার কল্পনার বাইরে। শুধু জানি, এমন প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করার মানসিক প্রস্তুতি বর্তমানে কারও নেই, তাই এই শক্তির অপব্যবহারই শুধু হবে। অর্থাৎ বিশ্ব-সভ্যতা বোধহয় ধ্বংসই হয়ে যাবে।' একটু বিরতি নিলেন অসুস্থ প্রফেসর। একটু একটু হাঁপাচ্ছেন তিনি। 'আন্তন, বাবা, এখনও কি তুমি বুঝতে পারোনি আমার প্রস্তাবটা কি?'

মুচকি একটু হাসল রানা। 'পেরেছি, স্যার। কিন্তু…'

'কোন প্রতিশ্রুতি আমাকে দিতে হবে না, আমি তা চাইও না,' বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললেন। 'তুমি যা ভাল মনে করবে, তাই করবে। বিবেকের কাছে যাতে অপরাধী না হই, তাই কথাগুলো বললাম। কিছু মনে কোরো না। রীনা, মা ওদেরকে কামরা দুটো দেখিয়ে দাও।' বৃদ্ধ রানার দিকে ফিরলেন। 'ভোরবেলা উঠেই বাস ধরতে হবে, তাই না? সুতরাং আর নয়, হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া করো, তারপর ঘুমাবার চেষ্টা করো। আর হয়তো দেখা হচ্ছে না তোমার সাথে। অসুস্থ শরীর, ঘুম থেকে উঠতে বেলা হয়ে যায়। শেষ কথাটা তাই জানিয়ে রাখি। ওপারে নিরাপদে পৌঁছুলে কিনা সম্ভব হলে হেইকী হুভিনেনের মাধ্যমে একটা খবর দিয়ে আমাকে জানিয়ো। কেমন?'

'অবশ্যই জানাব, স্যার।'

'রীনা,' অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ওদেরকে নিয়ে যাও।' তাঁর আচরণে পরিষ্কার হয়ে উঠল, রানার প্রতি বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি। রানার হাবভাব দেখেই বুঝে নিয়েছেন, তাঁর প্রস্তাবটা পরিষ্কার বুঝলেও সেটা গ্রহণ করার ক্ষমতা রানার নেই, থিসিসটা সে ইসরায়েলের হাতেই তুলে দেবে।

তেরো

এনসো, রাশিয়া।

প্রফেসর স্যানিকিনিনের বাড়ি। রাত চারটে বেজে পাঁচ মিনিট।

দশ মিনিট আগে ডুবে গেছে সূর্য, এখন ঘন কালো ছায়ায় ঢাকা চারদিক। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় একা বসে আছে জুনেস্কি। সীল করা খাতাটা বালিশের তলায়, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা কোলের উপর। মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে রানা, ওর সন্দেহ, এই রাশিয়াতেও নাকি প্রতিপক্ষদের কেউ থিসিসটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে। সে ভয় পেয়েছে বুঝতে পেরে রানা অবশ্য হালকা সুরে বলেছে, 'আক্রমণ হবেই এমন কোন কথা নেই। তবে সাবধান থাকা ভাল। কোন ঝুঁকি নিতে চাই না আমি। রাত জেগে পাহারা দিতে হবে। কিন্তু প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ঢলে পড়ে যাবার অবস্থা হয়েছে আমার, এই শেষ রাতটা তুমিই জাগো, ভাই।' বলে নিজের কামরায় গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ও। দিব্যি ঘুমাচ্ছে।

মনে মনে খুশিই হয়েছে জুনেস্কি। রানা ভয় না দেখালেও ঘুম আসত না তার। থিসিসটার প্রভাব টের পাচ্ছে সে, যার কাছে থাকবে, ঘুম হারাম হয়ে যাবে তার। বন্ধ ঘরের ভিতর একা সে, তবু বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে মাঝে মাঝেই খাতাটার অস্তিত্ব অনুভব না করলে স্বস্তি বোধ করছে না।

হঠাৎ কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল জুনেস্কির। খসখস আওয়াজ! সত্যিই কি প্রতিপক্ষ...ওই আবার!

পিস্তল হাতে নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামল জুনেস্কি। অন্ধকারে চারকোনা একটা অস্পষ্ট কাঠামো দেখা যাচ্ছে। জানালা ওটা। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে জানালার একপাশে দাঁড়াল সে। রাস্তার আলো পড়ছে বারান্দায়। উঁকি দিয়ে লোকটাকে দেখতে পেল জুনেস্কি। বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। রানার কামরার জানালা না ওটা? হ্যাঁ...ওটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। অস্পষ্ট আলো, চেনা যাচ্ছে না। গায়ে কোট। হঠাৎ ওর দিকে ফিরতে শুরু করল লোকটা।

'কে?'

ঝট্ করে তাকাল লোকটা। পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল উল্টোদিকে। ইতোমধ্যে জানালা দিয়ে পিস্তল ধরা হাতটা বের করে দিয়েছে জুনেস্কি।

গুলি করার আগের মুহূর্তে আবিষ্কার করল জুনেস্কি, এর আগে লোকটাকে সে দেখেছে ফিনল্যান্ডে। প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে সে, কোটের একটা হাত আগু পিছু করছে দ্রুত, কিন্তু অপর হাতটা স্থির, ঝুলছে শরীরের পাশে। কোটের হাতাটা ফাঁপা, হাত নেই ভিতরে।

দুপ্ করে শব্দ করে বেরিয়ে গেল বুলেট। গুলিটা লাগল কিনা বুঝতে পারল না জুনেস্কি। বারান্দা থেকে লাফ দিল, নাকি গুলি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঠিক বোঝা গেল না।

যাই হোক, লোকটাকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তার, ভাবল জুনেস্কি। ডক্টর ফিলাতভের কাছে থিসিসটা আছে মনে করে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখা হচ্ছিল ভিতরে ঢোকার পথ করা যায় কিনা। শিক্ষা হয়ে গেছে বাছাধনের, মরতে না চাইলে আর ফিরে আসবে না।

রিস্টওয়াচ দেখল জুনেস্কি। রানাকে ঘুম থেকে জাগাবার সময় হয়েছে। সাড়ে চারটের দিকে বাস ধরতে হবে ওদেরকে।

ইমাত্রা, ফিনল্যান্ড।

ভি-আই-পি-ইনস। রাত চারটে দশ মিনিট।

সূর্য ডোবার একটু পরই ঘন ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। গুস্তাভ তাতার কামরা। বাগানের দিকের জানালাটা খোলা। নিঃশব্দে একটা মাথা বেরিয়ে এল জানালাটা দিয়ে। এক হাত দূরে পানির পাইপটা দেখল গুস্তাভ তাতা, সোজা উঠে গেছে উপর দিকে, ডক্টর ফিলাতভের জানালার পাশ ঘেঁষে। মাথা নামিয়ে তীক্ষ্ণচোখে বাগানটাও দেখল সে। বেঘোরে ঘুমাচ্ছে সবাই টুঁ শব্দ নেই কোথাও।

পিছিয়ে এল গুস্তাভ। কান দুটো সজাগ। তাকিয়ে আছে সিলিঙের দিকে। সেই রাত বারোটা থেকে উপরের কামরার কোন শব্দ পায়নি সে। ঘুমিয়ে পড়েছে ডক্টর ফিলাতভ আর জুনেস্কি— দুজনেই। সহকারী তুর্গেভের দিকে তাকাল সে। 'যাও। জানালার শার্সি খুলেই সিগন্যাল দেবে আমাকে।'

এগিয়ে গিয়ে শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দে লাফ দিয়ে শার্সি খোলা জানালার উপর উঠে বসল তুর্গেভ। অসুরের শক্তি লোকটার গায়ে, এবং হুকুম পেলে দাবানলের ভিতর দৃঢ় পায়ে ঢুকে যেতে পারে, ভয় কাকে বলে জানে না। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সাথে জানালা থেকে লাফ দিয়ে পানির পাইপটা ধরল সে, এক সেকেন্ড বিরতি না নিয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে।

জানালা দিয়ে গুস্তাভ মুখ বের করে উপরে তাকাবার আগেই তুর্গেভ পৌঁছে গেছে দোতলায়। এক হাত দিয়ে জানালাটা ধরে আছে সে, অপর হাতে স্ক্রু খুলছে। ঠিক দু'মিনিট পর হাতছানি দিয়ে বস্‌কে সিগন্যাল দিল। কাঁচের শার্সি খুলে ফেলেছে সে। পরমুহূর্তে তাকে দেখতে পেল গুস্তাভ তাতা। জানালা থেকে নিঃশব্দে নেমে পড়েছে ডক্টর ফিলাতভের কামরায়।

হাতির মত মস্ত শরীর নিয়ে পাইপ বেয়ে উপরে ওঠা সহজ নয়। কিন্তু গুস্তাভ তাতার জন্যে কঠিনও নয়। তুর্গেভের চেয়ে পাঁচ সেকেন্ড বেশি সময় নিল সে দোতলার জানালার কাছে পৌঁছতে।

জানালা থেকে কামরায় নামার আগে গুস্তাভ তাতা দেখল এরই মধ্যে অর্ধেক কাজ সেরে ফেলেছে তুর্গেভ। আলো জ্বেলেছে সে। জুনেস্কির মুখে তুলো গুঁজে দিয়েছে। তার হাত-পা বাঁধার কাজও শেষ। মেঝেতে চার-পাঁচটা খালি মদের বোতল দেখে মুচকি হাসল সে। মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমাচ্ছে ডক্টর ফিলাতভ আর জুনেস্কি। জুনেস্কির দিকে ভাল করে তাকাতেই ছাঁৎ করে উঠল তার বুক। কোথায় জুনেস্কি? এ তো অন্য লোক। চরকির মত আধ পাক ঘুরে অপর বিছানার দিকে তাকাল সে। কোথায় ডক্টর ফিলাতভ? এ-ও তো অন্য লোক।

বিদ্যুৎচমকের মত, নিমেষে সব বুঝে ফেলল গুস্তাভ তাতা। ডক্টর ফিলাতভ অনেক আগেই সীমান্ত পেরিয়ে রাশিয়ায় চলে গেছে জুনেস্কিকে নিয়ে। নিজেদের জায়গায় এদেরকে রেখে গেছে, বিশেষ করে তাকেই ধোঁকায় ফেলার জন্যে। মাথাটা ঘুরে গেল তার। এভাবে বোকা বানাল তাকে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স!

দাঁতে দাঁত চেপে রাগ সামলাবার চেষ্টা করছে গুস্তাভ তাতা। 'ওই শালাকেও বাঁধো,' হিস হিস করে বলল সে। ঘুমন্ত লোকটাকে দেখিয়ে তুর্গেভকে নির্দেশ দিল। 'মুখে তুলো গুঁজতেও ভুলো না। তারপর রাম প্যাঁদানি দাও, ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও হাত পায়ের গাঁট। ডক্টর ফিলাতভ কখন এখান থেকে গেছে, কোথায় গেছে, কখন কোথায় ফেরার কথা,—এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত থেমো না।'

জানালার দিকে ঘুরে দাঁড়াল গুস্তাভ তাতা। ধীরে-সুস্থে চুরুট ধরাল একটা। আধ মিনিট পর দুরমুজ করার আওয়াজ ঢুকল তার কানে। মুচকি হাসল সে। এ কাজে অত্যন্ত পাকা লোক তুর্গেভ। তার দুই হাতের কিনারা যেন দুটো ছোরা, সেগুলো দিয়ে মাংস কিমা করছে সে। আওয়াজ পাচ্ছে গুস্তাভ। খুবই হালকা আওয়াজ, কামরার বাইরে যাচ্ছে না। দ্রুত হচ্ছে আওয়াজটা। এখন প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। সেই জায়গায় অস্পষ্ট দুটো গোঙানির শব্দ।

দু'মিনিট নিঃশব্দে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে ঘুরল গুস্তাভ তাতা। দুই জোড়া চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। একজনের অবস্থা শোচনীয়, জ্ঞান হারাতে বেশি দেরি নাই। এগিয়ে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে। তুর্গেভের তুলনা হয় না। কোথাও মারের একটু দাগ ফোটেনি। নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল সে।

একজনের মুখের ভিতর থেকে তুলো বের করে নিল তুর্গেভ। হাউমাউ করে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল লোকটা, ধাঁই করে একটা ঘুসি মারল তার চিবুকে গুস্তাভ তাতা। 'একটু শব্দ হলেই খুন করে ফেলব। যা জিজ্ঞেস করছি উত্তর দে। ডক্টর ফিলাতভ...'

গড় গড় করে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বেরিয়ে এল লোকটার মুখ থেকে। দ্বিতীয় লোকটার দুই কান থেকে তুর্গেভের গুঁজে দেয়া তুলো বের করে নিয়ে তাকেও জেরা করল গুস্তাভ তাতা। প্রাণের ভয়ে এ-ও কিছু লুকাল না। দু'জনের বক্তব্য হুবহু এক।

সাঁই করে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল একটা স্পোর্টস কার। তুর্গেভ চালাচ্ছে গাড়ি। পাশে গুস্তাভ। ক্যাসি ভারতানেনের বাড়ির দিকে ছুটছে গাড়িটা।

মাথার ভিতর আগুন জ্বলছে গুস্তাভ তাতার। হাতে সময় নেই, থিসিসটা বুঝি আর পাওয়া হলো না। শ্রমিকদের নিয়ে সীমান্তের ওপার থেকে রওনা হয়ে গেছে বাস। চারটে বেজে চল্লিশ এখন, সীমান্ত পেরোচ্ছে ওরা এই মুহূর্তে। ইস্, যদি সীমান্তেই আটকানো যেত ওদেরকে। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। শেষ সুযোগ একটা আছে এখনও। ডক্টর ফিলাতভ ক্যাসি ভারতানেনের বাড়িতে উঠবে পোশাক পাল্টাবার জন্যে। তখনই যা করার করতে হবে তাকে। পপকিনের কথা মনে পড়তে মুচকি হাসল সে। পপকিনের গাড়ি গ্যারেজেই আছে, দেখতে ভুল হয়নি তার। তার মানে ঘুমাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে অপেক্ষা করবে ডক্টর ফিলাতভের আশায়। ততক্ষণে, ভাবছে গুস্তাভ তাতা, রাশিয়ার মাটিতে পৌঁছে যাব আমি থিসিস নিয়ে।

পাইপ বেয়ে ডক্টর ফিলাতভের কামরায় যখন উঠছিল গুস্তাভ তাতা, এর তিন মিনিট পরই সহকারীদের নিয়ে রওনা হয়ে গেছে পপকিন ক্যাসি ভারতানেনের বাড়ির উদ্দেশে। হোটেলের পিছন দিয়ে বেরিয়েছে ওরা, হেঁটে এতক্ষণে পৌঁছে গেছে বাড়িটার খিড়কি দরজায়।

গুস্তাভ তাতার তা জানার কথা নয়।

এনসো, রাশিয়া।

দিগন্তরেখার উপর দিয়ে উঁকি মারছে আধখানা সূর্য।

ভোর চারটে পঁয়ত্রিশ। মিল এলাকা থেকে আধ মাইল দূরে রাস্তার একটা বাঁকের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে রানা আর জুনেস্কি। বাসের জন্যে এখানেই অপেক্ষা করার কথা ওদের।

পাইপে আগুন ধরাতে যাচ্ছে রানা, খুশিতে তড়পে উঠল জুনেস্কি। 'আসছে, বাস আসছে, শালা ড্রাইভার কি রকম আস্তে আস্তে চালাচ্ছে…!'

ধীরে সুস্থে পাইপটা ধরাল রানা। মুখ তুলে তাকাল।

ধীরে ধীরে ওদের সামনে এসে থামল বাসটা। জানালার পাশে বসা আরোহীদের মধ্যে একজন হেইকী হুভিনেন, তার সাথে রানার চোখাচোখি হতেই নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল সে। বাসে উঠে পড়ল রানা। পিছু পিছু উঠল জুনেস্কি। ড্রাইভার ছেড়ে দিল বাস। পাশাপাশি দুটো সীট খালি দেখে বসে পড়ল ওরা, কেউ তাকিয়ে নেই ওদের দিকে! কি ঘটে গেল কেউই যেন তা দেখেনি।

পাঁচ মিনিট পর সীমান্তে থামল বাস। এবার একজন নয়, দু'জন সীমান্তরক্ষী চড়ল বাসে। এদের মধ্যে সেই কসাক সৈনিকটা নেই দেখে স্বস্তি বোধ করল রানা। নিঃশব্দে শ্রমিকদের মাথা গুনে নেমে গেল সীমান্তরক্ষীরা। ড্রাইভার ছেড়ে দিল বাস।

পনেরো গজ দূরে আবার যখন থামল বাস, বুক ভরে বাতাস নিল জুনেস্কি। কি তাজা! সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে বাতাসটা।

ইমাত্রা, ফিনল্যান্ড।

ভোর পৌনে পাঁচটা। চৌরাস্তায় থামল বাস। কিছু শ্রমিক নামল। তাদের সাথে হেইকী হুভিনেন, রানা এবং জুনেস্কিও। বাস আবার ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকল ওরা তিনজন। অন্যান্য শ্রমিকরা যে যার বাড়ির পথে দ্রুত রওনা হয়ে গেছে।

'ক্যাসির কাছ থেকে আমার পাওনাটা কাল সকালে নিয়ে আসব আমি,' বাজারের থলিটা হাতে ঝুলছে হেইকী হুভিনেনের। সেটা দোলাচ্ছে সে। 'পথ চিনে যেতে পারবেন তো? আমাকে আবার বাজার করে বাড়ি ফিরতে হবে কিনা, আপনাদের পৌঁছে—'

'কোন দরকার নেই,' বলল রানা। 'এই তো সিকি মাইল পথ, অসুবিধে হবে না।'

'তাহলে বিদায়।'

'হেইকী,' বলল রানা। 'বেশ ভাল কাজ দেখিয়েছ তুমি। আমি সন্তুষ্ট।

ধন্যবাদ।'

একটু হেসে নিজের পথ ধরল হেইকী।

'পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি চলো,' বলল রানা। 'মি. পপকিন অপেক্ষা করছেন।'

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথে নামল একটু পর। দু'পাশে গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়। ধনুকের মত বেঁকে গেছে পথটা। শ'খানেক গজ দূরে ক্যাসি ভারতানেনের বাড়ির কার্নিস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ভোরের পাখিরা কিচির-মিচির করছে গাছের ডালে, তাদের মিলিত শোরগোলকে ছাপিয়ে উঠছে নাম-না জানা একটা পাখির তীক্ষ্ণ স্বর। কান পেতে শুনল রানা ডাকটা। কর্কশ বন মোরগের আওয়াজ যেন—কুক্কুরের কুক্ কুক্, কুক্কুরের কুক্। 'কি বলছে পাখিটা?'

রানাকে ছেড়ে এগিয়ে গেছে জুনেস্কি। তর সইছে না তার। পিছনে ফিরে তাকাল না, থামলও না, তবে উত্তরটা দিল। যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়: 'আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে সোনা পায়।'

'বাঘে আজ দু'জনকেই খাবে!' তিন হাত সামনে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা গেল গুস্তাভ তাতা এবং তুর্গেভকে। পাশের ঝোপটা এখনও দুলছে। দু'জনের হাতেই সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তল।

বোধহয় একসেকেন্ড আগেই ব্যাপারটা টের পেয়েছিল জুনেস্কি। শোল্ডার হোলস্টার থেকে বিদ্যুৎবেগে পিস্তল বের করেই গুলি করল সে।

আগুনের ফুলকি দেখা গেল তুর্গেভের পিস্তলেও। দু'জনের কারও লক্ষ্য ব্যর্থ হবে না বুঝতে পেরেই সামনে লাফ দিয়েছে রানা। তখনও হাসি লেগে রয়েছে গুস্তাভ তাতার মুখে। কব্জির উপর আকাশ থেকে বজ্রপাত হলো যেন। রানার আক্রমণাত্মক ভঙ্গি দেখে পিস্তলটাকে শক্ত করে ধরে ফেলেছে সে। কব্জিতে আঘাত লাগতেই দুপ্ করে শব্দ করে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট রানার পাঁজর ঘেঁষে।

পিস্তল ছাড়েনি গুস্তাভ তাতা। বিস্ময়ের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না। ডক্টর ফিলাতভ তার পিস্তল ধরা হাতটা ধরে ফেলেছে, এবং বিদ্যুৎচালিত হাতুড়ির মত অপর হাতটা দিয়ে তার প্রকাণ্ড মুখে একের পর এক ঘুসি মেরে যাচ্ছে। একি অবিশ্বাস্য কাণ্ড। ব্যথার চেয়ে বিস্ময়ের ধাক্কাটা হজম করতে কঠিন লাগছে তার। ডক্টর ফিলাতভ মারে! নিরীহ একজন বিজ্ঞানী মারে কেন!

'তবে রে,' হুঙ্কার ছেড়ে পাল্টা আক্রমণ চালাতে গেল গুস্তাভ তাতা। মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যে টের পেয়ে গেল, কপালে খারাবি আছে, আন-আর্মড কমব্যাটে তার চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ পারদর্শী ডক্টর ফিলাতভ। কব্জিটা এমন কায়দায় চেপে ধরেছে যে ব্যথায় পিস্তলটা আর ধরে রাখতে পারছে না সে। নাকের ফুটো দুটো বুজে গেছে রক্তে, মুখ দিয়ে স্বাদ টানছে। উপর্যুপরি আঘাত খেয়ে তুবড়ে গেছে বা দিকের চোয়াল। এবার দুই হাতে গুস্তাভের পিস্তল ধরা হাতটাকে ধরে বাঁকা করে ফেলছে রানা। মোচড় খেয়ে ঘুরে গেল গুস্তাভের হাত। ব্যথা পাচ্ছে, তবু ছাড়ছে না পিস্তল। দুপ্ করে দ্বিতীয় গুলি হলো। আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল গুস্তাভ তাতার কণ্ঠ থেকে। শরীরের সমস্ত পেশী নরম কাদার মত হয়ে গেল মুহূর্তে। তাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল রানা। গুস্তাভের তলপেটের বেশ অনেকটা নিচে লেগেছে বুলেট, কিন্তু ঠিক

কোথায় তা পরিষ্কার বুঝতে পারল না রানা প্রথমে। মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি করছে গুস্তাভ আহত জায়গাটাকে দু'হাতে চেপে ধরে। রানা দেখল, রক্তে ভিজে উঠছে প্যান্টের বোতাম লাগানোর জায়গাটা। কোথায় গুলি লেগেছে বুঝতে পেরে কুঁচকে উঠল ওর গাল দুটো। গুলি লেগে কাটা পড়েছে গুস্তাভের যৌনাঙ্গ। খানিক ছটফট করেই জ্ঞান হারাল সে।

পায়ের কাছ থেকে পিস্তলটা খুলে নিল রানা। ঘুরে দাঁড়াল। তুর্গেভ আর জুনেস্কি পরস্পরের মাথায় মাথা ঠেকিয়ে দু'দিকে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, মজার কোন সার্কাসের খেলা দেখাতে যাচ্ছে যেন, এক্ষুণি লাফিয়ে উঠে চমকে দেবে। পা দিয়ে ঠেলে চিৎ করল রানা জুনেস্কির লাশটাকে। তারপর উবু হয়ে বসে পোশাকের নিচ থেকে সীল করা প্যাকেটটা বের করে উঠে দাঁড়াল।

দুটো লাশ এবং অজ্ঞান গুস্তাভকে টেনে ঝোপঝাড়ের আড়ালে নিয়ে গেল রানা। তারপর এগোল ক্যাসি ভারতানেনের বাড়ির দিকে।

চোদ্দ

বাগানের ভেতর ছোট্ট বাড়িটা। কারও সাথে দেখা হলো না রানার। উঠান পেরিয়ে বারান্দায় উঠল ও। শেষ প্রান্তে হল রূমের দরজার সামনে দাঁড়াল। নক্ না করে হাত দিয়ে ঠেলে উন্মুক্ত করল কবাট দুটো।

চারকোনা বড়সড় কামরা। একটা জানালার দিকে পিছন ফিরে চেয়ারে বসে আছে কার্ল পপকিন। তার পাশের চেয়ারে আরেক লোক। পরিপাটি করে ব্যাক ব্রাশ করা চুল, পরনে দামী ট্রপিক্যাল স্যুট, সামনের টেবিলে দুটো হাত লম্বা করে দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে। বাঁ হাতের তিনটে আঙুলে মূল্যবান পাথর বসানো আঙটি। ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে ধরা চুরুট থেকে ধোঁয়া উঠছে এঁকেবেঁকে। ছোটখাট চেহারা লোকটার, তবে আশ্চর্য তীক্ষ্ণ তার চোখের দৃষ্টি। ক্লিনশেভ। চেহারায় দুর্ভেদ্য ব্যক্তিত্বের ছাপ। ওদের দুই পাশে মর্মর মূর্তির মত নিঃসাড় দাঁড়িয়ে আছে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের দুইজন গার্ড। কোমরে ঝুলানো হোলস্টারের কাছে হাত।

রানাকে কামরায় ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কার্ল পপকিন। 'জুনেস্কি কোথায়?' চট্ করে রানার হাতে ধরা সীল করা প্যাকেটটা দেখে নিল সে, 'থিসিস?'

টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। গম্ভীর ভাবে পাল্টা প্রশ্ন করল ও, 'গুস্তাভ জানল কিভাবে? অ্যামবুশ পেতে বসে ছিল সে এই বাড়ি থেকে গজ বিশেক দূরে। জুনেস্কিকে বাঁচাতে পারলাম না। অবশ্য তুর্গেভকে সাথে নিয়ে গেছে সে।'

উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল পপকিন, 'আর গুস্তাভ? সে কি পালিয়েছে...?'

'না। আহত করেছি তাকে।'

'ব্যাপারটা জানাজানি হলে...'

'কোন চিন্তা নেই। কাকপক্ষীও টের পায়নি,' বলল রানা। 'লাশ দুটো লুকিয়ে রেখে এসেছি। গুস্তাভকেও। জ্ঞান ফিরতে ঘণ্টাখানেক লাগবে ওর।'

স্বস্তি বোধ করল পপকিন। এই শেষ মুহূর্তে কোন উটকো ঝমেলায় জড়াতে চায় না সে। হাতে একটা মাত্র কাজ বাকি, সেরেই কেটে পড়তে হবে।

'থিসিস?' রানার হাতের প্যাকেটটার দিকে চোখ রেখে হাত পাতল পপকিন।

'এই যে,' বলল রানা। পপকিনের বাড়ানো হাতে সীল করা প্যাকেটটা তুলে দিল। 'উফ্।' স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। 'ঘাড় থেকে দুনিয়ার বোঝা নেমে গেল। আমি এখন মুক্ত। এবার তাড়াতাড়ি আমাকে লন্ডনে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। এই বুড়োর চেহারা আমার আর সহ্য হচ্ছে না।'

পপকিনের কানে রানার একটা কথাও ঢুকছে না। সীল করা প্যাকেটটা উল্টেপাল্টে দেখছে সে। 'গালা দিয়ে সীল করেছ। তিনটে আঙুলের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। কার কার?'

'প্রফেসর স্যানিকিনিন, জুনেস্কি আর আমার,' বলল রানা। পকেট থেকে পাউচ আর টোবাকো পাইপ বের করে টেবিলে রাখল ও। একটা চেয়ার টেনে বসল।

'খুলে দেখোনি ভিতরে কি আছে?'

'কাভারেই লেখা আছে এক্স-রে-র প্রতিফলন,' পাইপে টোবাকো ভরছে রানা, বলল, 'তাই খুলে দেখার প্রয়োজন হয়নি।'

'ভেরি গুড,' গম্ভীর মুখে বলল পপকিন, কিন্তু তীব্র এক আনন্দের স্রোতে সারা শরীর-মন আপ্লুত হয়ে যাচ্ছে তার, কণ্ঠস্বরেই সেটা প্রকাশ পেয়ে গেল। চেয়ারে বসে টান দিয়ে টেবিলের দেরাজটা খুলে প্যাকেটটা রাখল সে, পাশ থেকে তুলে নিল সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলটা। 'রানা?'

পাইপে আগুন ধরাতে যাচ্ছিল রানা। পপকিনের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, সাথে সাথে মুখ তুলে তাকাল ও।

'অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি,' রানার কপালের মাঝখানে পিস্তল তাক করে ধরেছে পপকিন। নিঃশব্দে হাসছে সে। ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। 'তোমাকে এবার বিদায় দিতে হচ্ছে।'

পাথর হয়ে গেছে রানা। এক হাতে টোবাকো পাইপ, অপর হাতে গ্যাস লাইটার, দুটোই মুখের কাছে স্থির হয়ে আছে।

'হাতে সময় নেই,' দ্রুত কথা বলছে পপকিন। 'তাই সব কিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মৃত্যুর আগে তোমার প্রকৃত পরিচয়টা জেনে যাও। তুমি মাসুদ রানাই। কিন্তু ইহুদি নও। তুমি একজন বাংলাদেশী মুসলমান। ইসরায়েলের পরম শত্রু, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন প্রতিভাবান এজেন্ট। আর একটু জানা দরকার তোমার। একথা ভেব না যে তুমি নিরপরাধ, স্রেফ খুন করার জন্যেই তোমাকে খুন করছি আমরা। ইসরায়েলের দুশমন তুমি। অতীতে আমাদের অনেক ক্ষতি করেছ। সুযোগ পেলে আরও অনেক ক্ষতি করতে।' পাশে বসা সুবেশ লোকটার দিকে তাকাল সে। ফিক ফিক করে হাসছে লোকটা। পপকিন বলল, 'ইনি আমার বস্, তেল আবিবে তোমাকে পেয়ে ওঁর মাথাতেই বুদ্ধিটা আসে। তোমাকে এই মরণফাঁদে ফেলে কাজ করিয়ে নেয়ার সমস্ত কৃতিত্ব ওঁর।' রিস্টওয়াচ দেখল

পপকিন। 'গুড বাই, এখন তবে বিদায়…'

পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল চেপে বসছে পপকিনের। তাই দেখে মুচকি হাসল রানা। 'কিন্তু আমারও যে কিছু কথা আছে! আমি মরে গেলে সে-সব কার মুখে শুনবেন?'

'সময় নেই,' দ্রুত বলল পপকিন। 'এক্ষুণি আমাদেরকে নিতে আসবে…'

'সময় না থাকলে তাড়াহুড়ো তো করাই উচিত,' বলল রানা। 'তবু বলছি, গুলি করার আগে সীল করা প্যাকেটটা একবার পরীক্ষা করে নিলে হত না?'

তিন সেকেন্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল পপকিন, কথা বলতে পারল না। তারপর জানতে চাইল, 'মানে?'

পপকিনের কথার জবাব দিল না রানা। এখন সে তার দিকে তাকিয়েও নেই, নিশ্চিত মনে পাইপে আগুন ধরাচ্ছে।

ছোঁ মেরে খোলা ড্রয়ার থেকে প্যাকেটটা তুলে নিল পপকিন। এক হাত দিয়েই কাগজ ছিঁড়ে চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতাটা উন্মুক্ত করল। দ্রুত খাতার পাতা উল্টাচ্ছে। প্রায় সাথে সাথে আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলার ভিতর থেকে, 'এ কি! সব সাদা কাগজ! থিসিস কোথায়?'

'ওটা বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে,' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল রানা।

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল কার্ল পপকিনের মুখের চেহারা। হাতে ধরা পিস্তলটা স্থির রাখতে পারছে না সে। 'তুমি…তুমি স্মৃতি ফিরে পেয়েছ?' অবিশ্বাসে বিকৃত শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

'সে কি আজকের কথা? ক…বে!' বলল রানা। 'অসলোয় থাকতেই।'

'কিন্তু!…কিভাবে? তার মানে তুমি হিপনোটাইজড হওনি?'

'হয়েছিলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু মোহজাল কেটে বেরিয়ে এসেছি।'

'অসম্ভব…!'

সত্যিই অসম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন সিক্রেট সার্ভিসের নামী-দামী এজেন্টদেরকে পোস্ট-অ্যান্টি হিপনোটিক সাজেশন দেয়া হয়ে থাকে, তার ফলে তাদেরকে সম্মোহিত করা যায় না। কিন্তু গবেষণার মাধ্যমে হিপনোটিজমকে আশ্চর্য এক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন মেজর জেনারেল রাহাত খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জিলানী, যাঁর সাহায্যে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন এজেন্টকে পোস্ট-অ্যান্টি হিপনোটিক সাজেশন দেয়া হলেও ইচ্ছা করলে যে কেউ আবার তাদেরকে সম্মোহিত করতে পারবে। পারবে বটে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে মূল্যবান কোন তথ্য আদায় করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আবার সম্মোহিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। এই সাজেশনটা দেয়া হয়ে থাকে এক একজনকে একেকটা আলাদা পদ্যের মাধ্যমে। যেমন রানাকে বাংলা ভাষার অতি মিষ্টি অতি পরিচিত একটা পদ্যের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে: পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল…ইত্যাদি। এই বিশেষ পদ্ধতির আরেকটা সুবিধে হলো, দ্বিতীয়বার সম্মোহিত হয়ে শত্রুপক্ষের শেখানো সব কিছুই এজেন্টদের মনে থাকে, ফলে শত্রুপক্ষকে বোকা বানাতে কোন অসুবিধে হয় না। রানার যেমন হয়নি।

'দেখতেই তো পাচ্ছ, অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।'

'কিন্তু কিভাবে?'

মুচকি হেসে বলল রানা, 'তা বলব কেন?'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে পপকিনের বসের। ঘন ঘন ঢোক গিলছে সে।

বিপদ টের পেয়ে ঘুরে উঠল পপকিনের মাথা। হাতের কাঁপুনি বেড়ে গেল আরও।

'যেভাবে কাঁপছে তোমার হাত, গুলি বেরিয়ে যেতে পারে,' বলল রানা, 'আমার গায়ে তো লাগবেই না, সাথে সাথেই মারা পড়বে তোমরা সব ক'জন।'

চমকে উঠল ওরা। কিন্তু ঠিক কি বলতে চাইল রানা বোঝেনি।

মৃদু হাসল রানা। 'নিজেদের চারপাশে তাকিয়ে দেখো।'

ঝট্ করে ফিরল পপকিন এবং তার বস্। কামরার চারদিকের চারটে জানালা দিয়ে কমপক্ষে ত্রিশটা রাইফেলের নল ভিতরে ঢুকে পড়েছে। রাইফেলধারীদের এক এক জনের এক এক রকম চেহারা। কেউ আমেরিকান, কেউ ফ্রেঞ্চ, কেউ জার্মান। চীনা, ব্রিটিশ, বাঙালী মুখও দেখা যাচ্ছে। পাথুরে কাঠিন্য ফুটে আছে সব ক'টা চেহারায়। এতগুলো লোক কখন নিঃশব্দে কামরাটাকে ঘিরে ফেলেছে, টেরই পায়নি কেউ।

পিস্তলটা পড়ে গেল পপকিনের হাত থেকে। অদম্য কাঁপুনি থামাতে পারছে না কিছুতেই। তার বস্ অত্যন্ত সাবধানে মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে তাকাল রানার দিকে।

'কেমন বুঝছ?' টিটকারির সুরে বলল রানা। 'জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের ধুরন্ধর চীফ, ডোগা ওরহ্যাম?'

চোয়াল দুটো উঁচু হয়ে উঠল ডোগা ওরহ্যামের। নীরস গলায় এই প্রথম কথা বলল সে, 'যোগাযোগ করলে কিভাবে?'

সাথে সাথে প্রতিধ্বনি তুলল পপকিন, 'কিভাবে? প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে আমাদের এজেন্ট ছিল তোমার সাথে।'

'যা করার তাদের সামনেই করেছি,' বলল রানা। 'একটা লাইব্রেরীতে গিয়ে মুন রেকার নাইনথ এডিশন চেয়েছি, অর্থাৎ এম, আর নাইন, আমার কোড নাম্বার। সেই সাথে আরেকটা বই খোঁজ করেছি, Salmaguni or SaLmagundy, অর্থাৎ বিপদ সঙ্কেত SOS. জ্যাক জাস্টিস ওরফে গুস্তাভকে ফাঁকি দেবার জন্যে অসলোর এক হোটেলে খবরের কাগজে কিছু হিজিবিজি লিখে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। ওতে ছিল মেসেজ। এরপর থেকে গোপনে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে আসছি আমরা। তোমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে অনেক আগেই কেটে পড়তে পারতাম আমি, কিন্তু যাইনি এক্স-রের থিসিসটা উদ্ধার করব বলে।'

হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে কামরায় ঢুকল হাত-কাটা সোহেল, বিশাল ছাতি রাশেদ, এবং পরমা সুন্দরী সোহানা। বাকি সবাই টপাটপ জানালা দিয়ে লাফিয়ে নামল কামরার ভিতরে।

'ডক্টর ফিলাতভকে সিঁড়ি থেকে তাহলে ফেলে দিয়েছিলে তোমরাই?' বিস্ফারিত চোখে রানার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল ডোগা ওরহ্যাম।

'নিশ্চয়ই!' বলল রানা। 'তা নাহলে থিসিস আনতে আমি যাব কিভাবে? তবে

মৃত্যুটা দুর্ঘটনা। সিঁড়িতে কর্ড বেঁধে রাখা হয়েছিল, চেয়েছিলাম হাসপাতালে বিশ্রাম নিক কিছুদিন।'

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে ডোগা ওরহ্যাম। 'কিন্তু ডাইভারশানে যদি মারা পড়তে?'

'কই, মরলাম তো না,' হাসছে রানা। 'তবে, স্বীকার করছি, চেষ্টার কোন ত্রুটি করোনি তোমরা।'

'তুমি···তুমি তাও জানতে? বাট হাউ?'

'হাউ-মাউ কোরো না,' বলল রানা। পকেট থেকে ছোট্ট মিনি সাইজ টেপ রেকর্ডার বের করল একটা। টিক্ করে শব্দ হলো বোতাম টেপার। অমনি চিকন একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সবাই। যান্ত্রিক বলেই বিকৃত শোনাচ্ছে, কিন্তু পপকিনের গলা চেনা যাচ্ছে পরিষ্কার।

'···রানাকে শুধু খুন করলেই চলবে না, সেই সাথে শত্রুদের ক'টা দলকে কৌশলে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে হবে, ফিলাতভ খুন হয়েছে তাদেরই কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের হাতে···'

রানার আশপাশে দাঁড়ানো প্রত্যেকের চেহারা থেকে খসে পড়ল গাম্ভীর্যের মুখোশ। সবাই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠতে পপকিনের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল। বোতাম টিপে সেটটা অফ করল রানা। ডোগা ওরহ্যামের দিকে তাকাল, সেই প্রশ্নটা করল আবার, 'কেমন বুঝছ?'

এবার প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সবাই।

হাসি থামতে ম্লান মুখে জিজ্ঞেস করল ডোগা ওরহ্যাম, 'থিসিস সরালে কিভাবে তুমি?'

'পানির কল দেখতে পাশের বাড়িতে যেতে হয়েছিল জুনেস্কিকে, সেই সুযোগে।'

এমন সময় মাথার উপর আওয়াজ পাওয়া গেল হেলিকপ্টারের। কাছেই কোথাও নামছে।

'সোহেল···,' কথা শেষ হলো না রানার, কামরা থেকে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের বিশজন এজেন্ট ছুটে বেরিয়ে গেল সোহেলের পিছু পিছু।

দশ মিনিট পর ফিরে এল সোহেল। 'ভাড়া করা হেলিকপ্টার। পাইলট ছাড়া কেউ নেই। সার্চ করা হচ্ছে।'

'চমৎকার,' বলল রানা। 'ওতে করেই ফিরব আমি হেলসিঙ্কিতে।'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল চৈনিক গুপ্তচর, 'ডক্টর ফিল···সরি, মি. রানা, আপনি আমাদের সবাইকে এখানে ডেকে এনেছেন। কেন, তা আমরা এখনও জানি না।'

'এক্ষুণি জানতে পারবেন,' বলল রানা। 'তার আগে ছোট্ট একটা ভাষণ দিতে চাই আমি।'

অমনি পনেরো-বিশ জোড়া হাত প্রচণ্ড শব্দে তালি মারতে শুরু করল।

নেতাসুলভ গাম্ভীর্য ফুটে উঠল রানার চেহারায়। দু'হাত তুলে সবাইকে থামতে ইঙ্গিত করল ও। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল কামরার পরিবেশ।

'উপস্থিত স্পাইয়েরা আমার!' ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানী বক্তৃতার ভঙ্গিতে শুরু

করল রানা, 'আপনারা এত ঝড়ঝাপটা আর কষ্ট স্বীকার করে আমার ডাকে আজ এখানে এসেছেন বলে প্রথমেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।' একটু বিরতি নিল রানা। তারপর আবার যখন কথা শুরু করল তখন ওর কণ্ঠস্বরে হালকা সুর নেই। শব্দ নির্বাচনে সময় নিচ্ছে, অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ধীর ভঙ্গিতে বলছে, 'নিকোলাই ফিলাতভের এক্স-রে থিসিস সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই আপনাদেরকে। এক কথায় এটাকে আমরা মারণরশ্মির ফর্মুলা বলতে পারি। পৃথিবীর সব বৃহৎ শক্তি এটা আবিষ্কারের জন্যে চালাচ্ছে গবেষণা, যে-দেশ প্রথম আবিষ্কার করবে, সে-দেশ হবে গোটা দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় কোন একটি রাষ্ট্র যদি আর সব রাষ্ট্রকে পিছনে ফেলে অগাধ, সীমাহীন মারণ তথা ধ্বংসকারী ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক হয়ে ওঠে, অবশিষ্ট পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য।' আবার একটু বিরতি নিল ও। তারপর গম্ভীরভাবে বলল, 'ভাল-মন্দ মেশানো এই দুনিয়াটাকে আমরা সবাই ভালবাসি। আমরা কেউই চিরকাল থাকব না, কিন্তু পরবর্তী বংশধরদের জন্যে দুনিয়াটাকে যথাসম্ভব নিষ্কণ্টক অবস্থায় রেখে যেতে চাই। সেজন্যেই কোন একটি মাত্র রাষ্ট্রকে ক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে যেতে দিতে আমাদের আপত্তি।'

এবার ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সি. আই. এ-র একজন এজেন্ট। বলল, 'আপত্তি আপনি করতে পারেন, কিন্তু আপনার আপত্তি শুনছে কে? আমরা যদি শুনিও রাশিয়া শুনবে না, চীন মানবে না। কেউ না কেউ এটা আবিষ্কার করে ফেলবেই।'

'এ সমস্যার সমাধান আমি করেছি,' বলল রানা। পকেট থেকে একমুঠো মাইক্রোফিল্মের কারট্রিজ বের করল ও। 'ক্যামেরা সরবরাহ করেছিল ব্রিগেডিয়ার সোহেল আহমেদ। প্রফেসর স্যানিকিনিনের বাসায় রাত জেগে মূল থিসিসের কয়েকটা মাইক্রোফিল্ম কপি তৈরি করেছি আমি। আপনারা সবাই একটা করে কপি আমার কাছ থেকে পাবেন। আমার ধারণা, শুধু এভাবেই আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব। আমি আশা করি আমার দেশের সরকার আমার এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবেন।'

প্রথমে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল সবাই। তারপর রানার কথার যৌক্তিকতা বুঝতে পেরে হাসি ফুটে উঠল সবার মুখে। শুধু মুখ চুন করে বসে আছে পপকিন আর ডোগা ওরহ্যাম।

ভিড় থেকে নির্বাচিত হলো কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক। তারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে রাশেদ, একজন আমেরিকান, একজন নাক বোঁচা চীনাকেও দেখা গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কামরার ভিতর সুশৃঙ্খল একটা লাইনে দাঁড়াল সবাই। কি ঘটছে বুঝতে পারার আগেই পপকিন এবং ডোগা ওরহ্যাম অনুভব করল স্বেচ্ছাসেবকদের কয়েক জোড়া হাত তাদেরকে চেয়ার থেকে শূন্যে তুলে কামরার মাঝখানে, মেঝেতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বডিগার্ড দু'জন ওদের দু'পাশে বসে আছে। রাশেদের কড়া ধমক খেয়ে তারা ভঙ্গি বদল করে বসল। পরস্পরের মুখোমুখি বসে একজন আরেকজনের কান ধরে আছে এখন।

অত্যন্ত সমীহ আর শ্রদ্ধার সাথে রানার পাশে এসে দাঁড়াল ফ্রেঞ্চ অ্যাকশন

সার্ভিসের একজন এজেন্ট। 'মেজর রানা,' সবিনয়ে বলল সে। 'প্রাইজ ডিসট্রিবিউশনের এই অনুষ্ঠানে আপনি আমাদের সভাপতি। আসুন, সভাপতির আসন গ্রহণ করে আমাদেরকে ধন্য করুন।'

গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়াল রানা। টেবিল ঘুরে এগিয়ে গেল ও। একটু আগে ডোগা ওরহ্যাম যে চেয়ারটায় বসে ছিল সেটায় বসল ও। কারট্রিজগুলো রাখল টেবিলে।

ইতোমধ্যে একটা তালিকা তৈবি করে ফেলেছে সোহেল। সেটা বিবেচনার জন্যে টেবিলে রানার সামনে পেশ করা হলো। একটা কলম তুলে নিয়ে তালিকাটা একটু সংশোধন করল রানা। তারপর সেটা ফিরিয়ে দিল সোহেলকে।

রানা উঠে দাঁড়াতেই চুপ করে গেল সবাই।

রানার পাশ থেকে সোহেল আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে ঘোষণা করল, 'আপনারা সবাই ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছেন।' তারপরই হাঁক ছাড়ল সে, 'মি. রেড চায়না।'

চৈনিক গুপ্তচর লাইন থেকে বেরিয়ে এল। সোজা হেঁটে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল সে। টেবিল থেকে একটা মাইক্রোফিল্ম তুলে নিয়ে রানার হাতে দিল সোহেল। রানা সেটা মি. চায়নার বুক পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

প্রচণ্ড করতালিতে মুখর হয়ে উঠল চারদিক।

সসম্ভ্রমে বাউ করল চীনা এজেন্ট, তারপর মুখে একগাল হাসি নিয়ে ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

গম্ভীর গলায় পরবর্তী পুরস্কার বিজেতার নাম ঘোষণা করল সোহেল, 'মি. আমেরিকা!'

ছয় ফিট লম্বা সি. আই. এ-র অফিসার এগিয়ে এসে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে পা ঠুকে স্যালুট করল রানাকে। প্রাইজ নিল শার্টের বুক পকেটে, তারপর হ্যান্ডশেক করে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে আরেকবার স্যালুট ঠুকল।

সবশেষে প্রাইজ গ্রহণ করল ব্রিটিশ-সুইডিশ দলের নেতা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সেকেন্ড ম্যান জ্যাক লেমন।

'সবাইকে দেয়া হয়েছে,' বলল রানা, 'শুধু একজনকে ছাড়া। সোভিয়েত রাশিয়ার কোন প্রতিনিধি এখানে নেই।' একটু থামল রানা, তারপর মুচকি হেসে বলল, 'তবে, সরাসরি তারা আমার কাছ থেকে না পেলেও, আমার বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে কেউ একজন আছে যার কাছ থেকে একটা কপি পেয়ে যাবে সে, কোন অসুবিধে হবে না। আরেকটা কথা। তাড়াহুড়ো করে তুলেছি ছবিগুলো, দু'একটা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কাছে লিখিত আবেদন জানালেই একটা কপি পেয়ে যাবেন আপনারা। অতিরিক্ত কারট্রিজটা নিজের পকেটে রেখে দিল ও। আমাদের আজকের এই বিশেষ অধিবেশনের এইখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।'

তুমুল করতালি তখনও থামেনি, হাসিমুখে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা।

নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ডোগা ওরহ্যাম বলল, 'আমাদের...?'

'তোমাদেরকে এখানে বেঁধে রেখে যাওয়া হবে। ভারতানেনদেরকে বেড়াতে

পাঠিয়ে দিয়ে ভালই করেছ, দুপুরের দিকে ফিরে এসে তোমাদের মুক্ত করবে ওরা। পাশের কামরায় তোমাদের আরও দু'জন গার্ড আছে, তাদের কথা ভুলে যেয়ো না আবার।' ডোগা ওরহ্যামের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'মুক্ত হয়ে যে-কোন চুলোয় চলে যেয়ো, আমার আপত্তি নেই। থিসিসের একটা কপি হয়তো তোমরাই পেতে, কিন্তু যে নীচতার আশ্রয় নিয়েছিলে তার শাস্তি হিসেবে তোমাদেরকে বঞ্চিত করা হলো। এমনিতেও অনেক শাস্তি কপালে ঝুলছে তোমার। দেশে গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে। আমি উপদেশ দেব, দেশের মাটিতে পা ফেলার আগে পিঠে ছালা বেঁধে নিয়ো।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল সবাই।

অপরাধীর মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে কার্ল পপকিন। ডোগা ওরহ্যামের আঁধার মুখেও ফুটে উঠেছে পরাজয়ের গ্লানি।

'আমার বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র করে বি. সি. আই.-এর বিরাগভাজন হয়েছ,' কঠিন গলায় বলল রানা। 'ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেয়া হবে, তৈরি থেকো। তখন তোমাদের যে অকল্পনীয় ক্ষতি হবে, তার জন্যে দায়ী করা হবে তোমাকেই। এছাড়া, তোমার প্রতি আমার একটা ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে,' বলল রানা। 'কেননা, তোমার জন্যেই আজ আমার এই কদাকার চেহারা,' কথা শেষ করেই প্রচণ্ড শক্তিতে ডোগা ওরহ্যামের গালে একটা চড় মারল রানা।

ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল ডোগা ওরহ্যাম। 'আহা, শুয়ে পড়ছেন কেন!' বলতে বলতে লোহার মত শক্ত দুটো হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেলে সিধে করে দাঁড় করিয়ে দিল বিশাল-ছাতি রাশেদ। ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়িয়ে নামছে ডোগা ওরহ্যামের। থোঃ করে থুতু ফেলল সে। চারটে দাঁত ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

নিজের মাথার টাকটা দেখাল রানা। 'মাথায় যদি চুল না গজায়, আরেক চড়ে মুখের আরেক পাশের সব ক'টা দাঁত ফেলে দেব আমি তোমার।'

রাগে, অপমানে, ব্যথায় থরথর করে কাঁপছে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের চীফ।

একটু পিছিয়ে এসে সকলের দিকে একবার করে তাকাল রানা। একে একে এগিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সবাই।

কামরা প্রায় খালি হয়ে গেছে। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের বন্দীরা ছাড়া বাকি চব্বিশজন সবাই বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লোক।

সোহেলের সাথে কথা বলতে বলতে কামরা থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। 'তোদের ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে?' জানতে চাইল ও।

'আমাদের কথা ভাবতে হবে না তোকে,' কোটের পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল সোহেল। 'লন্ডনের একজন বিখ্যাত প্লাস্টিক সার্জেনের ঠিকানা এটা। সব ব্যবস্থা করা আছে, ওখানে গেলেই চিকিৎসা শুরু হবে তোর। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, চেহারা চুল সব ফিরে পাবি তুই পনেরো দিনের মধ্যে। চান্স পেয়েছিস, হেলিকপ্টার নিয়ে হেলসিঙ্কি হয়ে চলে যা তাড়াতাড়ি।' পকেটে হাত ভরে পাউচ আর টোবাকো পাইপ বের করল সোহেল।

চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠল রানার। 'এ কিরে! আমার পাউচ, আমার পাইপ,

তোর কাছে কেন?'

মুচকি হাসল সোহেল, পাইপটা চোখের সামনে তুলে দেখছে। বলল, 'ভারি সুন্দর জিনিস, বুঝলি। দেখেই পছন্দ হয়ে গেল। খুব দামী, তাই না রে?'

পাইপে টোবাকো ভরে দাঁতের ফাঁকে চেপে ম্যাচ খুঁজছে সোহেল, নিজের পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে দিল রানা। তারপর পকেট থেকে এক প্যাকেট বেনসন অ্যান্ড হেজেস আর একটা দামী গ্যাস লাইটার বের করল সে।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে সোহেলের চোখ জোড়া। 'আরে! আমার সিগারেট...'

সিগারেট ধরিয়ে সোহেলের মুখের দিকে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ল রানা, 'প্যাকেটে দুটো সিগারেট কম ছিল, কিন্তু পুষিয়ে গেছে সাথে গ্যাস লাইটারটা পেয়ে। ভারি সুন্দর জিনিস, বুঝলি। দেখেই পছন্দ হয়ে গেল। খুব দামী, তাই না রে?'

'শালা চোট্টা! ভেবেছিলাম অ্যাদ্দিনে নিশ্চয়ই অভ্যাস বদলেছে...' কামরার দিকে ইঙ্গিত করল সোহেল, চোখ টিপল, 'কিরে, কথা বলবি না?'

উত্তর দিল না রানা। ঘুরে দাঁড়াল।

'এই শোন্।' পিছু ডাকল সোহেল। 'শুনে যা...'

থামল না রানা। ধাপ ক'টা টপকে বারান্দা থেকে নেমে সোজা হেলিকপ্টারের দিকে এগোচ্ছে ও। হঠাৎ কানে এল রাশেদের চাপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, 'ও ভাবী! যায় গা তো! যান...কথা কইবেন না?' চলার গতি শ্লথ হয়ে আসছিল, আবার বাড়িয়ে দিল রানা।

হেলিকপ্টারের কাছে পৌঁছে গেছে সে, হঠাৎ পায়ের শব্দ পেল পিছনে। ধীরে ধীরে ঘুরল রানা। সামনেই সোহানাকে দেখে মুহূর্তে কঠোর হয়ে উঠল মুখের চেহারা। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিতে পারল ও। একটু হাসল।

'তোমার সাথে কথা আছে আমার,' মৃদু গলায় বলল সোহানা।

অদ্ভুত সুন্দর সোহানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। বুকের ভিতর প্রচণ্ড একটা ভাবাবেগ মোচড় দিয়ে ধরল, 'কিন্তু চেহারায় তা প্রকাশ পেতে দিল না। বলল, 'কেমন আছেন, মিসেস সোহানা চৌধুরী? স্বামী ভাল তো? শুনেছি আমার নিখোঁজ সংবাদ শুনে আপনি নাকি বি. সি. আই হেডকোয়ার্টারটাকে চোখের পানিতে প্রায় ডুবিয়ে ফেলেছিলেন আরেকটু হলে। তারপর আরও শুনেছি, সাথে কোন্ দেওরকে নিয়ে আমাকে পাগলের মত খোঁজাখুঁজি করছেন তেল আবিবে। খুবই কষ্ট করেছেন, বোঝা যাচ্ছে। সেজন্যে আপনাকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত...'

মুখটা লাল হয়ে উঠেছে সোহানার। রানাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমার কথা তুমি শুনবে, নাকি...!'

'শুনব না মানে?' বলল রানা, 'অবশ্যই শুনব। সব শুনব। বলুন, মিসেস চৌধুরী, আপনার স্বামীটি দেখতে কেমন? ভদ্রলোক কি করেন? আপনার ব্যক্তিগত কথা শোনারও আগ্রহ রয়েছে আমার। যেমন, জনাব রাশেদকে নিয়েই তো বেশ খেলা

জমে উঠেছিল, তিনি স্বামী না হয়ে হঠাৎ দেওর হয়ে গেলেন কিভাবে? দেখছি, আপনাদের পক্ষে সবই সম্ভব! বলুন, বলুন, আপনার সব কথা শুনব আমি—ঘেন্না লাগলেও তা প্রকাশ করব না।'

কালো হয়ে গেল সোহানার অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল সে। ছুটে চলে যাচ্ছে।

মুখের বাঁকা হাসি মুছে গেল রানার ঠোঁট থেকে। লক্ষ করল কাঁপছে ও থির থির করে। দাঁতে দাঁত চেপে কি যেন সহ্য করল ও, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

তিন মিনিট পর আকাশে উঠল 'কপ্টার।

* * *